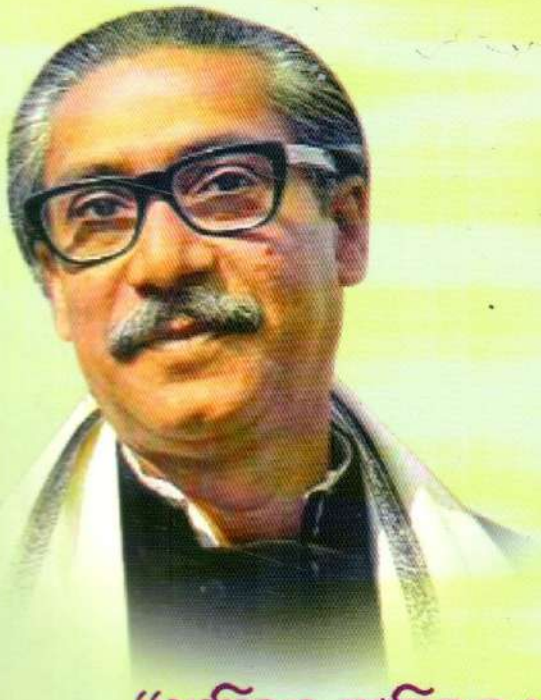

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মহান মে দিবস ২০১৭

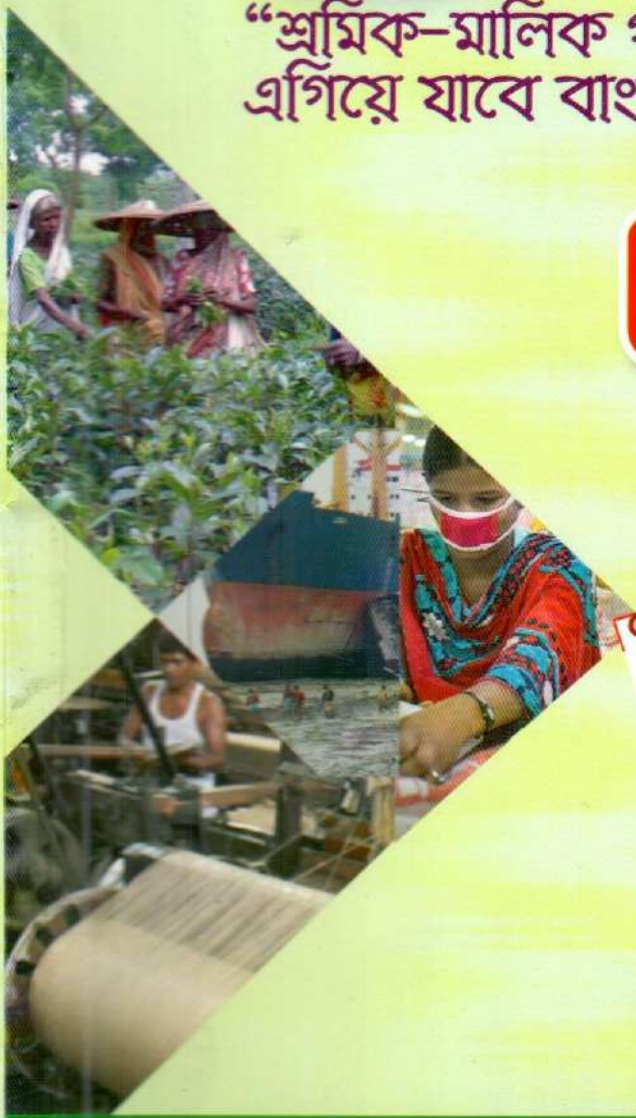

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

Souvenir-2017

'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ বৈশাখ ১৪২৪
০১ মে ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান 'মে দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবময় দিন। কর্মঘন্টা নির্ধারণসহ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। এ জন্য উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করণসহ সুস্থ শিল্পসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইন সংশোধন, যুগোপযোগী শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। এছাড়া তাদের অধিকার ও জীবন মান উন্নয়ন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকল পক্ষের ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান মে দিবসের সাথে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সকলে এগিয়ে আসবেন, মহান মে দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

মেহনতি মানুষের জয় হোক-মহান মে দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ বৈশাখ ১৪২৪
০১ মে ২০১৭

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তাঁদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ১৮৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেক দিকে শোষিত-আমি শোষিতের পক্ষে"। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা পোষাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্পখাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছি। শ্রমঘন গার্মেন্টস শিল্পখাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫ হাজার ৩ শত টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' যুগোপযোগী ও আধুনিক করে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি।

আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছি। প্রায় ৫৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬২টি চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আমরা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। এ তহবিলে ১২২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ১০৯টি শ্রমিক পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক নিরাপত্তা সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছি।

আমাদের এসকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুফল শ্রমজীবী সমাজ পেতে শুরু করেছে। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সক্ষম হব।

আমি মে দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দিন। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমজীবী মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য যে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচনা করেছিল, আমরা তার ১৩১ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। ঐতিহাসিক এদিনে আমি দেশের সকল মেহনতি মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি।

মে দিবস শোষণ, নির্যাতন আর নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সকল শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে, তাদের অধিকার সম্পর্কে করে সচেতন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক শ্রমবান্ধব সরকার মহান-মে দিবসের চেতনাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কল্যাণমুখী করতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। শ্রমিক সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে দেশের সার্বিক অগ্রগতি সাধন বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। এজন্য গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক পরিবেশে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে উন্নত প্রযুক্তি-তবেই মেহনতি মানুষের শ্রমের মাধ্যমে নতুন পৃথিবীও উন্নত দেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তা বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে নতুনের বিজয় কেতন উড়াবার। যে মেহনতি মানুষ তাদের শ্রমের বিনিময়ে নতুন পৃথিবী ও উন্নত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে সেই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধন এবং শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। একটি দক্ষ, সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণিই দেশে সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে এবং শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন দ্রুততর করতে পারে।

অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাতীয় জীবনে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা আরো বিস্তৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার-মহান মে দিবসে এ হোক আমাদের প্রত্যয়।

(মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি)

সভাপতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বাণী

আজ ১ মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সরকারিভাবে মে দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ও গর্বিত । বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং তাদেরকে জানাচ্ছি মহান মে দিবসের সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

ভিশন-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নে শ্রমিকের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে বাংলাদেশ অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে যাচ্ছে। জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনায় শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীতে বাংলাদেশের শিল্পখাত এখন আন্তর্জাতিক মানের ।

আই.এল.ও কনভেশন-৮৭ অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমকিদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এখন প্রশংসার দাবী রাখে। পোষাক শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এখন বাধাহিনভাবে সহজেই ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে দেশে এখন স্থিতিশীল শিল্প সম্পর্ক বিরাজমান।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের বিরামহীন কর্মপ্রয়াসের ফলে আজ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক উন্নত। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ফলে এবং সরকারি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প যা দেশের উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিল্পের উন্নয়ন এবং শ্রমমান টেকসই করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার স্বপ্ন দ্রুতই বাস্তবায়ন হবে, এটাই হোক এবারের মহান মে দিবসের অঙ্গীকার।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়হোক এদেশের মেহনতি মানুষের
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি)

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান 'মে দিবস' আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব একটি দিন। মহান এ দিনে বিশ্বের শ্রমজীবী সকল ভাই বোনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিগত বছরগুলোর মত এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান "মে দিবস" উদ্‌যাপন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ০১ মে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং কল্যাণে তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রেখে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমৃদ্ধ অর্থনীতি যে কোন রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি এবং মূলস্তম্ভ শক্তিশালী উৎপাদন ব্যবস্থা। উদ্যোক্তা ও উৎপাদকের সুস্থ ও আন্তরিক সম্পর্ক উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও সাফল্য আনয়ন করে। দক্ষ আধুনিক শ্রম প্রশাসনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে সহজে সেবাদানের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর দুটি দপ্তরকেই দক্ষতা, সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত দিক হতে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৩৮টি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক/কর্মচারীদের জন্য যুগোপযোগি ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি এবং অংশগ্রহণ কমিটি গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া সময় সময় শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষীয় প্রতিনিধি সমন্বয়ে আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিকের মাঝে সুস্থ শ্রম সম্পর্ক রক্ষা ও তাঁর নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে আমরা উৎপাদনের কাঙ্খিত গতিশীলতা ও সাফল্য অর্জন করব এবং শক্তিশালী অর্থনীতির মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্ব দরবারে ঈর্ষনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিব-এ হোক "মহান মে দিবস ২০১৭" এ আমাদের অঙ্গীকার।

(মিকাইল শিপার)

মহাপরিদর্শক

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার অবিস্মরণীয় মহান মে দিবসে আমি সকল শ্রমজীবী মানুষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যারা দৈনিক আটঘন্টা কর্মঘন্টার দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল সংগ্রামে যেসব শ্রমজীবী মানুষ আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং আজও ভূমিকা রেখে চলেছেন- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশের শিল্পসেক্টরে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তারিখে অধিদপ্তরে রুপান্তরের পর থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে।

এ অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সেইফটি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, মাতৃত্বকল্যাণ, অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিতকরার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান প্রভৃতি পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়াও, শ্রমিকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজুর কার্যক্রম সম্পাদনসহ কারখানা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের জন্য কারখানার মেশিন লে-আউট প্লান অনুমোদন, কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার সহজে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মূলমন্ত্র তথা 'জনগণের সরকার' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে অত্র অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে, এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের (www.dife.gov.bd) মাধ্যমে অনলাইনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তি, নবায়ন ও সংশোধনের আবেদন গ্রহণ এবং শ্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, পরিদর্শন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সেবা নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমি মহান মে দিবস-২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া)

শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ মহান মে দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। মহান মে দিবসে আমাদের প্রিয় শ্রমিক ভাই-বোনদের যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে আজ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্থান করে নিয়েছে ও জানান দিচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সোনার মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শ্রম সেক্টরে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদ্‌যাপন করছে। শ্রমক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার নিমিত্ত এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"।

বর্তমান সরকার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি ও অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, কর্মস্থলে সহযোগিতা ও নিরাপত্তায় শ্রম পরিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম।

পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশে এক নিরব বিপ্লব ঘটেছে। বিশ্বের শীর্ষ দশে স্থান পাওয়া ২৫টি পরিবেশবান্ধব শিল্পস্থাপনার মধ্যে বাংলাদেশের ৭টি। এর সবকটিই তৈরি পোশাক কারখানা। আমরা এ বিশ্বায়নের যুগে এমন গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি শ্রমিক-মালিকের নিবিড় সম্পর্ক ও মানসম্মত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে। আমাদের এ সাফল্যকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে পর্যায়ক্রমে আরও দক্ষভাবে গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক নেতৃত্ব এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমি মহান 'মে দিবস ২০১৭'এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

On behalf of the International Labour Organization please allow me to wish all citizens of Bangladesh a happy May Day 2017.

Over the past year Bangladesh has made good progress in many areas relating to the world of work. We must recognize the commitment and efforts of the Government of Bangladesh to meeting the goals set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development and especially Goal 8 to achieve Decent Work and Economic Growth.

The Bangladesh economy is growing at some seven percent annually and should continue along this path in order to eliminate poverty. However, it is vital that growth is inclusive and benefits all Bangladeshis. It is also important that any growth is job rich, drives employment and lifts people out of poverty. Any jobs created need to provide safe working conditions and respect for labour rights as well as protection in the event of injury, accident, sickness or unemployment.

In this regard I must also mention the work being undertaken relating to Sustainable Development Goals 4 and 16, focusing on Skills and Employability and Good Governance respectively. These too are key areas that will help realize our shared goals of achieving Decent Work for all.

ILO shall continue to play its role in strengthening national institutions and will also work closely with employers and workers organizations for the year to come.

We will continue our work to improve workplace safety in the RMG sector while also facilitating dialogue between employers and workers to improve workplace rights and industrial relations. Efforts to bridge the gap between skills supply and demand will remain a priority as will our work to establish a national Employment Injury Insurance Scheme that will benefit workers and employers alike.

In addition, we will continue to collaborate with the government to create a stronger foundation for the overall management of labour migration in recognition of the huge contribution migrant workers make to the development of the nation.

By working together in a spirit of collaboration, enterprise and good will I am confide that we can create a bright future for Bangladesh and all its workers.
With best regard.

Srinivas B. Reddy

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

মহান মে দিবস উপলক্ষে আমি দেশের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের কর্মময় জীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক।

মে দিবস একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটে শ্রমিকদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়। শ্রমিকদের দাবী ছিল আট ঘন্টা কর্মকাল। এ ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস্ এর অংশ হিসেবে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয় এবং সংস্থার প্রথম কর্মসূচি দৈনিক আট ঘন্টা শ্রম হিসেবে চিহ্নিত হয়। আট ঘন্টা কর্ম ঘন্টা স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সমাবেশে মে মাসের পহেলা তারিখে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলাদেশর সংবিধানের মূল নীতির ভিত্তিতে জনসাধারণ এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধান কল্পে সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন করা বাংলাদেশের শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য। এ নীতি অনুসরণ করলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পরস্পর আস্থা, আশ্বাস ও সৌহার্দ্য স্থাপন এবং উভয় পক্ষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা বেগবান হোক-এ প্রত্যাশা রইল।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(সালাহ্উদ্দীন কাসেম খান)

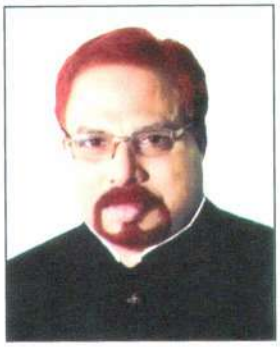

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

শ্রমিকদের উপর শিল্প মালিকদের অমানুষিক নির্যাতন বন্ধ ও দিনে ১৬-১২ ঘণ্টা কাজের বিপরীতে "আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘণ্টা বিনোদন/ঐচ্ছিক" এ দাবীতে শিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ও বেদানাদায়ক শ্রমিক আন্দোলনের ১৩১ বছর পূর্তি ১ মে ২০১৭ সাল। ১৮৮৬ সালের ১ মে Michigan Avenue থেকে শ্রমিকরা যে সকল দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল আমরা তাদের উত্তরসূরী হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের সোনালী যুগে অবস্থান করছি। পাকিস্তানী সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকল ভেঙ্গে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি যে বিজয় অর্জন করেছিল, তার মাধ্যমেই বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একটি দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি। বাংলার আপামর শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়োজন অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন। তিনি International Labour Organization (ILO) এর তৎকালিন সকল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি চেয়েছিলেন উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে। তাই তিনি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের যে কোন যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে সর্বদাই সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবমূখী সর্বাধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগের পতাকাতলে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ ঐক্যবদ্ধ। বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলা তথা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সুখী, সমৃদ্ধশালী, শোষণমুক্ত এবং সাম্প্রদায়িক উগ্রজঙ্গিবাদ মুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

(আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ)

সম্পাদকীয়

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১ মে সংগ্রাম ও চেতনায় উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত হওয়ার দিন। বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালিত হয় শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দীপ্ত শপথ গ্রহণের জন্য। বাংলাদেশে এ দিনটি পালিত হচ্ছে সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদার সাথে। মে দিবস শিক্ষা দেয় ঐক্য, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার। এসব আদর্শ যে কোন দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মে দিবসের এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেই মহান মে দিবস উদযাপন স্বার্থক হবে।

মহান মে দিবসের পটভূমি, তাৎপর্য এর মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের যে অর্জন তাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশে এ দিবসটি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। মে দিবসের অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মহান মে দিবসের তাৎপর্য ও গৃহীত কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সদয় নির্দেশনা এবং উপদেশ দিয়েছেন যার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এবারের মহান মে দিবস উদ্‌যাপনে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, গ্রামীণ ফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, বাংলালিংক, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ, থারমেক্স গ্রুপ লিঃ, বাটা সু কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ, বসুন্ধরা গ্রুপ, কোটস বাংলাদেশ লিঃ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিঃ, আকিজ গ্রুপ, রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেল, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ, দি ওয়েস্টিন হোটেল ঢাকা, বি.আর.বি ক্যাবলস লিঃ, ওয়াল্টন বাংলাদেশ লিঃ, লিনডে বাংলাদেশ লিঃ, নীট কনসার্ন লিঃ, মেট্রো গ্রুপ, দাদা (ঢাকা) লিঃ, সিন সিন লিঃ, অবন্তি গ্রুপ, ফকির এ্যাপারেলস, ফকির ফ্যাশন, মেটাডোর বল পেন ইন্ডাঃ লিঃ, প্রাণ গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, ফকির নিটিং লিঃ, মাইক্রোফাইবার লিঃ এবং ডিবিএল গ্রুপ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্মরণিকা প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘাটতির বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। নানা ব্যস্ততার ভেতরও যাঁরা লেখা দিয়ে স্মরণিকা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, স্মরণিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ বি এম সিরাজুল হক
আহ্বায়ক
স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০১৬ এর অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতিরে সাথে মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

Dhaka Summit on Skills, Employability and Decent Work 2016 সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ILO মহাপরিচালক Mr Guy Ryder কে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলে দিচ্ছেন।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীর উদ্বোধন করছেন মাননীয় নৌপরিবহণ মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম,পি ও মননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম,পি।

মহান মে দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীতে মাননীয় নৌপরিবহণ মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম,পি ও মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম,পি।

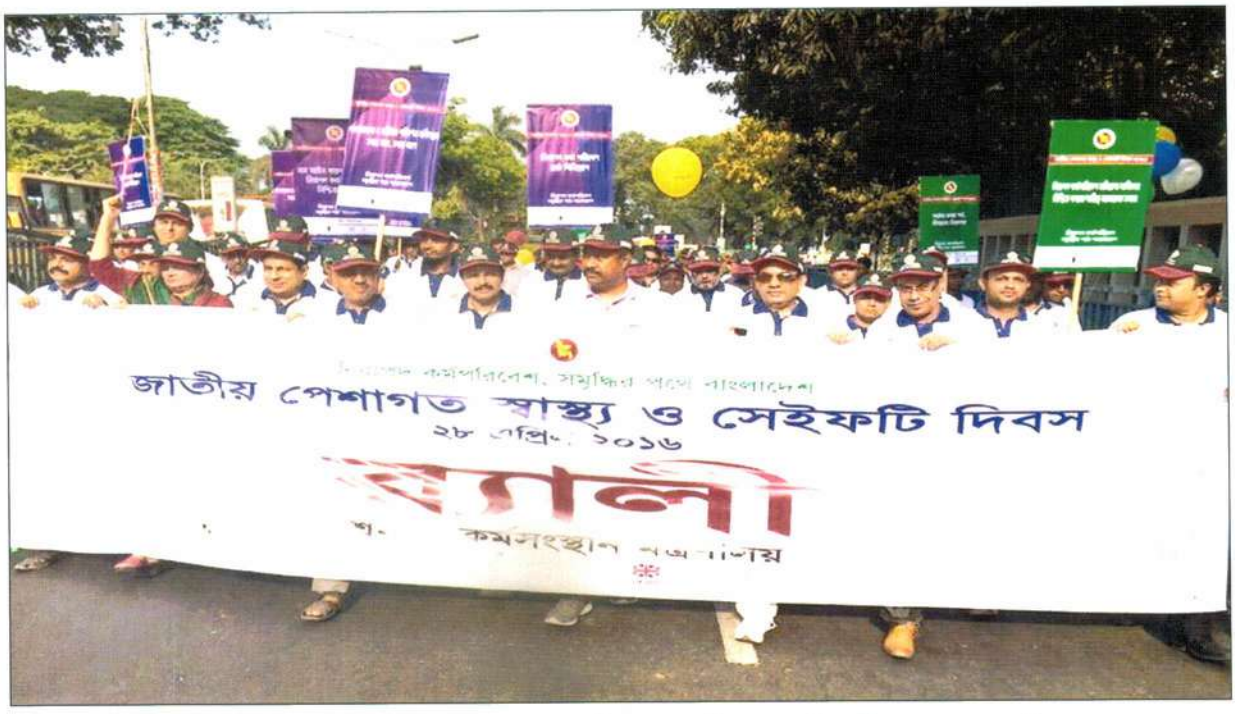

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০১৬ এ র‍্যালীতে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আইএলও'র যৌথ প্রেস কনফারেন্সে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি, পাশে উপবিষ্ট শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার ও আইএলও এর মহাপরিচালক Mr Guy Ryder.

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর সাথে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিকের অধিকার এর অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনারত আইএলও'র মহাপরিচালক Mr Guy Ryder.

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC) এর ১০৫তম অধিবেশনে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে উপবিষ্ট শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

আইএলও'র গভর্নিং বডি'২০১৬ এর সভার এক পর্যায়ে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী, শ্রম সচিব, আইএলও এর ডাইরেক্টর জেনারেল ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ ।

টাম্পাকো ফয়েলস লিঃ কারখানায় সংগঠিত দূর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের উত্তরাধিকার এবং আহত শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক বিতরণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ।

"উত্তরাঞ্চল দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা" অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম,পি ও শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

Color Max bd Ltd. এ অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম, পি ও শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

Social Dialogue and Industrial Relation Project (SDIR) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম,পি ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপারের নেতৃত্বে Bangladesh Tripartite Study tour to ROK on Implementation of National Employment Injury Project Scheme এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া সফর।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) র জন্য আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলাপরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে বাটা সু কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে আলাপরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি ও শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি ও শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাথে আলাপরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি ও শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

OECD Peer review team এর সাথে Aid effectivness নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বক্তব্যরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে উপবিষ্ট শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার ও যুগ্ম সচিব (শ্রম) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ পরিদর্শনে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে উপবিষ্ট শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

বেক্সিমকো ফার্মা সিউটিক্যালস লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

কর্ণফুলি ফাটিলাইজার কোম্পানী লিঃ (কাফকো) এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম,পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

রবি আজিয়াটা লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

যমুনা ওয়েল লিঃ প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

গ্রামীন ফোন এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

গ্লাক্সো স্মিথ কাইন বাংলাদেশ লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

হাইডেল বার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং পাশে শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

জাবের এন্ড জুবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ এর কারখানা পরিদর্শনরত অবস্থায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপচারিতায় শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১	মে দিবসের সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত হোন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করুন	ঃ শাজাহান খান, এম.পি	০১-০৫
২	শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও করণীয়	ঃ শিরীন আখতার, এম.পি	০৬-০৮
৩	পরিবর্তীত বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রম, শ্রমিক ও শিল্পের উন্নয়নে বিকেএমইএ'র পরিকল্পনা	ঃ এ,কে,এম সেলিম ওসমান, এম.পি	০৯-১৪
৪	বাংলাদেশ পোশাক শিল্প ও ভবিষ্যৎ	ঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	১৫-১৬
৫	প্রযুক্তির বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান	ঃ সালাহ্উদ্দীন কাসেম খান	১৭-১৮
৬	শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ	ঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১৯-২১
৭	Historical Development of Labour Laws	ঃ Md. Shamsuzzaman Bhuiyan	২২-২৭
৮	শ্রমিক আন্দোলনের সোনালী যুগ ও মহান মে দিবস	ঃ আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ	২৮-৩০
৯	পহেলা মে ঃ বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন শেখ হাসিনা	ঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা)	৩১-৩২
১০	মে দিবস ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি	ঃ ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	৩৩-৩৪
১১	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শ্রমিক	ঃ মোঃ শাহজাহান মিয়া	৩৫-৩৭
১২	শ্রমিক মুক্তির মহান মে দিবস	ঃ ফজলুল হক মন্টু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)	৩৮-৩৯
১৩	শ্রমবান্ধব রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা	ঃ আবদুল মতিন মাষ্টার	৪০-৪৫
১৪	মে দিবসের চেতনায় শিল্পোন্নয়ন, অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধি	ঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী	৪৬-৪৮
১৫	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করে গড়ে উঠুক বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতি	ঃ মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া	৪৯-৫০
১৬	মে দিবসের চেতনা ও অধিকার আদায়ে মেহনতি মানুষের ভূমিকা	ঃ শামসুন্নাহার ভূইয়া	৫১-৫৩
১৭	"আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এবং মহান মে দিবস"	ঃ এ্যাডঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান	৫৪-৫৫

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১৮	শ্রমিকের বঙ্গবন্ধু-শ্রমিক বান্ধব শেখ হাসিনা	ঃ জেড এম কামরুল আনাম	৫৬-৫৭
১৯	মে দিবস এবং বাংলাদেশ	ঃ মোঃ সামসুল আলম (বকুল) হাওলাদার	৫৮-৫৯
২০	শিকল ছেঁড়ার ডাক.....	ঃ নইমুল আহসান জুয়েল	৬০-৬১
২১	নিরাপদ কর্মক্ষেত্র : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ	ঃ এ. আর. চৌধুরী রিপন	৬২-৬৩
২২	পুঁজি ও শ্রম উৎপাদনের মধ্যবিন্দু	ঃ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ	৬৪-৬৫
২৩	মে দিবসে আমাদের শপথ	ঃ এম এ রশীদ	৬৬-৬৬
২৪	ইতিহাসের আলোকে মহান মে দিবস	ঃ খান আখতার হোসেন	৬৭-৬৯
২৫	শ্রম বিরোধ (Labour Dispute)	ঃ এস, এম, এনামুল হক	৭০-৭৬
২৬	নারী শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন	ঃ মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল	৭৭-৭৮
২৭	শ্রম আইনে শ্রমিকের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী	ঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন	৭৯-৭৯
২৮	ট্রেড ইউনিয়ন, গণতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক	ঃ মোঃ গিয়াস উদ্দিন	৮০-৮২
২৯	শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রমজীবী সংগঠনসমূহ	ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম	৮৩-৮৬
৩০	সোশ্যাল ডায়লগ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত	ঃ মিতসু শাওলিন	৮৭-৮৯
৩১	মে দিবস ও বাংলাদেশ	ঃ রাজেকুজ্জামান রতন	৯০-৯২
৩২	মে' দিবসের উৎস	ঃ কামরূল আহসান	৯৩-৯৫
৩৩	সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাস্রোত	ঃ কেদার নাথ ভট্টাচার্য	৯৬-৯৮
৩৪	কাস্তে হাতুড় লাল-পতাকা	ঃ লিমা সুলতানা লিপু	৯৯-৯৯

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
৩৫	অভিবাসী শ্রমিক ঃ স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয়	ঃ মোঃ ওমর ফারুক	১০০-১০১
৩৬	অটিস্টিক শিশু ঃ মনোজগতের এক অন্তর্মুখী মহাসন্ত কিংবা ক্ষ্যাপা বাউল	ঃ ডাঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ রিয়াজী	১০২-১০৩
৩৭	বাংলাদেশের চা-শিল্প ও চা-শ্রমিকের কল্যাণে আওয়ামীলীগ সরকার	ঃ মোঃ শফিকুর রহমান	১০৪-১০৬
৩৮	আমাদের গান	ঃ মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ফিরোজ	১০৭-১০৭
৩৯	মহান মে দিবস ঃ শ্রমিকের অধিকার	ঃ আহসান হাবীব মোল্লা	১০৮-১০৯
৪০	মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অনুপ্রেরনা-	ঃ আনোয়ার হোসেন খোকন	১১০-১১০
৪১	বাঙালির মুক্তির সনদ	ঃ উম্মে আছমা শিখা	১১১-১১২
৪২	অংশগ্রহণকারী কমিটি এবং শ্রম পরিদপ্তর	ঃ মহববত হোসাইন	১১৩-১১৪
৪৩	অতঃপর আবারও সন্ধ্যা	ঃ নাফিজা খানম	১১৫-১১৬
৪৪	সরকারের ভূমিকা-শ্রমিকদের অধিকার	ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	১১৭-১১৮
৪৫	মহান মে দিবসের ডাক	ঃ নুরুল ইসলাম	১১৯-১২০
৪৬	মে দিবসের চেতনায় জীবন গড়ি, জঙ্গবাদ নির্মূল করি	ঃ সুলতান আহম্মদ	১২১-১২২
৪৭	মহান মে দিবস ও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্তি	ঃ আবুল কালাম আজাদ	১২৩-১২৪
৪৮	মে দিবস ও গৃহকর্মীর স্বার্থ সুরক্ষায় আমাদের করণীয়	ঃ লিপি দাস	১২৫-১২৬
৪৯	মহান মে দিবস শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা	ঃ মোরশেদা হাই	১২৭-১২৮
৫০	Toward Disability Inclusion in the Factories and Establishments	ঃ Md. Anwar Ullah	১২৯-১৩৭
৫১	Alternative Dispute Resolution: A Need for Labour Matters	ঃ Uttam Kumar Das	১৩৮-১৪১

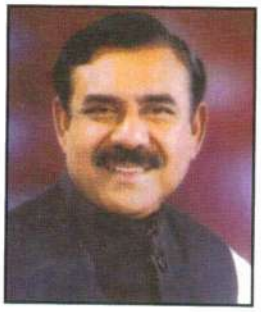

মে দিবসের সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত হোন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করুন

শাজাহান খান এম.পি
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মহান মে দিবস একটি সংগ্রামের দিন। শ্রমিকের আবেগঘন দু:খ বেদনার দিন। তাদের অধিকার আদায়ের দিন। তাদের প্রাপ্তির দিন। তাদের অহংকারের দিন। মে দিবসে শ্রমিকদের অবদান, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতি, অমরগাঁথা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। মহান মে দিবসের সংগ্রামের ইতিহাস-শ্রমিকের শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের ইতিহাস।

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের অনুষ্ঠিত সমাবেশে মালিকদের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলিতে অসংখ্য শ্রমিক নিহত হয়। সৃষ্টি হয় এক রক্তঝরা ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত হয় দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকদের জন্য ৮ ঘন্টা কাজের সময়। বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের বহু সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু ১ মে শ্রমিকের রক্তদানের ইতিহাস আজও মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রানিত করে। সংগ্রামের ইতিহাসের ধারায় যেখানে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, সন্ত্রাস এবং যেখানে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করে, সেখানেই মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রাম ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের দলসমূহের সমন্বিত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একজন শ্রমিক বান্ধব মানুষ। তিনি ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি সাত বছরের মধ্যে দু'দফা বৃদ্ধি করে ১৬৬২ টাকা হতে ৫৩০০ টাকায় উন্নীত করেছেন। ১৯৮৪ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ৫৭০ টাকা। এর ১০ বছর পর ১৯৯৪ সালে এই মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৩০ টাকা এবং ১২ বছর পর ২০০৬ সালে ৯৩০ টাকা হতে ১৬৬২ টাকা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে মাত্র চার বছর পরে ২০১০ সালে মজুরি ১৬৬২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০০ টাকায় উন্নীত করেন। এর তিন বছর পর ২০১৩ সালে ৩০০০ টাকা হতে ন্যূনতম ৫,৩০০ টাকায় উন্নীত করেন এবং প্রতি বছর শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ হারে ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি সড়ক পরিবহন শ্রমিকসহ ৪৬ টি সেক্টরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের সমস্যা দূর করার জন্য নাম মাত্র সুদে মালিকদের ব্যাংক ঋণ দিয়ে ডরমেটরি করার সুযোগ দিয়েছেন। সকল রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) নারী শ্রমিকদের জন্য সরকারিভাবে ডরমেটরি নির্মাণ করছেন। ইপিজেড এর কারখানায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতির বিধান রেখে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন হয়েছে। এতে ইপিজেড শ্রম আইন অনুযায়ি শ্রমিকদের অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মূল বেতনের সমপরিমাণ বছরে দু'টি উৎসব বোনাস, পূর্ণ বেতনে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা, দুর্ঘটনার কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত দুই লাখ টাকা এবং স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারনে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রম কল্যাণ তহবিল গঠন করে দু:স্থ, অসহায়, মৃত শ্রমিকদের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসেন এবং তাঁর সরকার শ্রম ও শিল্প বান্ধব সরকার। তিনি দেশকে ভালবাসেন, জনগণকে ভালবাসেন এবং আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে কাজ করে চলেছেন। তাঁর সরকারের বিগত ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এখাতে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সেক্টরে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি কাজ করে যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কম-সুবিধাভোগী নারী। তৈরি পোশাক খাতের সহায়ক খাতসমূহ যেমন ব্যাংক, বীমা, আইটি, পরিবহন, ট্যুরিজমসহ অনেক খাত গড়ে উঠেছে। এখাত দেশকে ক্রমান্বয়ে সাহায্য-নির্ভরতা থেকে বাণিজ্য-নির্ভরতার দেশে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের অব্যাহত বাণিজ্যিক কূটনৈতিক সাফল্যের কারণে ইতোমধ্যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের কমপ্লায়েন্স অর্জন করেছে।

ইপিজেডের শ্রমিকদের অধিকার-সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬' মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে বেপজা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ইপিজেড হাসপাতাল এবং অবশিষ্ট ৬টি ইপিজেডে মেডিকেল সেন্টার করেছে। ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণে বেপজা ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী ও কুমিল্লা ইপিজেডে বেপজা পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া উত্তরা ইপিজেড-এ স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ইপিজেডসমূহে পর্যায়ক্রমে চাহিদার ভিত্তিতে স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৫ শতাংশ, সেখানে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০১৫-১৬) প্রবৃদ্ধি পৌঁছে গেছে ৭ এর ঘরে (৭.১১ শতাংশ)। এটি আমাদের জন্য সত্যিই সু-সংবাদ। বাংলাদেশ এখন ৭-৮ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হয়েছিল ২২.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে গত অর্থবছরে হয়েছে ৪২.৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, এ আট বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে ৯১ শতাংশে। রপ্তানি ১১৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৪.৩ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স ৫৪ শতাংশে বেড়ে হয়েছে ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চারগুনের বেশি বেড়ে এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিমাণ রির্জাভ দিয়ে দেশের ৯ (নয়) মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ ডলার।

এরই মধ্যে বাংলাদেশ 'নিম্ন আয়ের দেশের' গ্লানি ঘুচিয়ে 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের' মর্যাদা লাভ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং পরবর্তী সময়ে ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হবার যে স্বপ্ন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেখছেন তাও অবাস্তব নয়। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩,১০০ মেগাওয়াট থেকে ১৫,৩৫১ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন ৪ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭২ বছর। দারিদ্রের হার ২৩.৬ ভাগ এবং অতিদারিদ্রের হার ১২.১ ভাগে নেমে এসেছে। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে।

অপরদিকে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এলে পবিত্র রমজান মাসে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বকেয়া পাওনা পরিশোধ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ১৭ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালে নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বকেয়া পাওনা আদায় ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে পবিত্র রমজান মাসে ২ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে।

সরকারে থাকা অবস্থায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত যেমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে শ্রমিক হত্যা করেছে, তেমনি ক্ষমতার বাইরে এসে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯২ জন ড্রাইভার ও হেলপার, ১৭ জন পুলিশ, ৩ জন বিজিবি জোয়ান, ৩ জন গ্রাম পুলিশ, ২ জন মুক্তিযোদ্ধা, ২ জন ব্যাংক কর্মচারী, বীমা কর্মচারী, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, ৯ জন বালু ট্রাকের শ্রমিক, হকার, ফল ব্যাবসায়ী, রাজনৈতিক দলের নেতা-

কর্মী, জনপ্রতিনিধি, নারী-শিশুসহ অসংখ্য যাত্রীদের বোমা, পেট্রোল বোমা মেরে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করেছে। পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে প্রায় ৪০০ শ্রমজীবী মানুষ। অনেক শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

পেট্রোল বোমা, গান পাউডার দিয়ে প্রায় এক হাজার গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, প্রায় তিন হাজার যানবাহন ভাংচুর করা হয়েছে। রেললাইনের ফিসপ্লেট তুলে রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। পেট্রোল বোমায় নতুন নতুন রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষ্টীমার ও লঞ্চে আগুন দিয়েছে। ৬০ হাজার গাছ কেটে পরিবেশ বিনষ্ট করেছে। পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, মসজিদের জায়নামাজ আগুনে পুড়িয়েছে। গরীব হকারদের মালামাল লুট করেছে, পুড়িয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িঘর ভাংচুর করেছে। নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৫২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়েছে। ভাংচুর করেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসবাবপত্র ভেঙ্গেছে, পুড়িয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার হত্যা করেছে। ভোটারদের পায়ের রগ কেটেছে। জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছে, শহীদ মিনার ভেঙ্গেছে, অসংখ্য বাড়িঘর ও পত্রিকা অফিসে আগুন দিয়েছে।

এসব ধ্বংসাত্মক, সন্ত্রাসি ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করা, দেশের মানুষের শান্তি বিনষ্ট করা, সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত করা। যুদ্ধাপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করা এবং বাংলাদেশকে অকার্যকর জঙ্গী, সন্ত্রাসি ও ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিনত করা।

বিএনপি-জামাতের তান্ডবে নিহত ও আহত ড্রাইভার, হেলপার, যাত্রী হিসেবে শিশু, নারী এবং ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ির মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ পর্যন্ত ৬১ কোটি টাকার বেশী আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। আরো অনেকের অনুদানের বিষয়টি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অথচ বিএনপি নেতা খালেদা জিয়া অনুদান দেয়া তো দূরের কথা মানবিক কারণে দু:খ ও অনুশোচনা প্রকাশ করেনি। এ জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের এহেন কর্মকান্ড বন্ধের আহবান জানাননি। বরং তিনি সন্ত্রাসিদের অর্থ অনুদান দিয়ে সন্ত্রাসিদের উৎসাহিত করেছেন।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলসহ প্রায় ৫ হাজার মাঝারি, ছোট, বড় কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী বেকার হয়েছে ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অসংখ্য শহীদ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজীবন শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাদের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তিনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পাকিস্তানী ও তাদের দোসরদের পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে চালু করে শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সমবায় সমিতি গঠন করে ঢাকার তেজগাঁওতে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের মালিকানায় ১০০টি ট্রাক দিয়ে তাদের আয় বর্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও বঙ্গবন্ধুর মত একজন শিল্প ও শ্রমিক দরদী মানুষ। ১৯৯৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১১টি টেক্সটাইল মিলের মালিকানা শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকার খালেদা জিয়ার সরকার কর্তৃক বন্ধ হওয়া কলকারখানাগুলো একে একে চালু করছেন। ইতোমধ্যে ৫টি পাটকল চালু করেছেন। এতে বহু শ্রমিক কর্মচারীর চাকুরীর সংস্থান হয়েছে। এরই মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ এক হাজার ২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে কলকারখানাগুলোর নেওয়া ঋণ বাবদ আরো তিন হাজার কোটি টাকা সরকার মওকুফ করেছে। বন্ধ আদমজী জুট মিলের জমিতে শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করে কয়েক হাজার লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন।

বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময়, শ্রম আইন ২০০৬ সংসদে পাশ হয়েছে। সে আইনে শ্রমিক স্বার্থ সম্পূর্ণরুপে প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত আইনের উপর আমি ৫৬টি সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন সরকার সংসদে আমাকে এক মিনিটের জন্যও কথা বলতে দেয়নি। এমনকি তৎকালিন বিরোধী দলের নেতা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকেও কথা বলতে না দেয়ায় আমরা উক্ত আইনের বিরোধিতা করে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিলাম। ৪ দলীয় জোট সরকার একতরফাভাবে সে আইন সংসদে পাশ করেছিল।

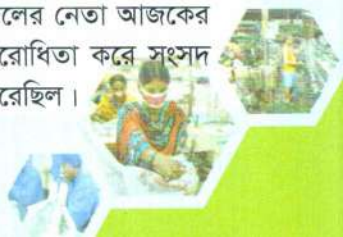

বাংলাদেশের সকল শ্রমিক সংগঠন তা প্রত্যাখান করেছিলো। পরবর্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থে শেখ হাসিনার শাসনামলে গত মেয়াদে ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। শ্রমিক দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বছর করেছেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের যত অর্জন সব ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানিদের মদদে বিএনপি-জামাত জঙ্গি ও সন্ত্রাসি তৎপরতা চালাচ্ছে। আর পাকিস্তান চালাচ্ছে কুটনৈতিক অপতৎপরতা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। সেজন্য আজ প্রয়োজন পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার শ্রমিক, কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এ লক্ষ্য নিয়ে ১৯৫ জন চিহ্নিত ও পরবর্তীতে তদন্তে যারা চিহ্নিত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধি সেনাদের বিচার, পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা ৩৫ হাজার কোটি টাকা ফেরত আনা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা, ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পাদিত 'দিল্লী চুক্তি' অনুযায়ী ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের কৃতকর্মের জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য ২০১৫ সালে ২০ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক-কর্মচারী-পেশাজীবী-মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ২০১৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর গঠন করা হয় "আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন"। এ সংগঠন ২১ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়নে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন বেগবান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা সকলের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধারা দেশবাসির প্রতি আহবান জানায়। এই সংগঠন স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠিরা যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদদের নিয়ে কটাক্ষ করতে না পারে সেজন্য পাশ্চাত্যের হলোকাষ্ট ডিনায়েল ল' বা জেনোসাইড ডিনায়েল ল' এর আদলে একটি আইন প্রণয়ন করার দাবী জানায়।

যুদ্ধাপরাধিদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আবারো গভীর ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করার প্রত্যয় নিয়ে "আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ২১ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে। বিএনপি-জামাত ও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এ সংগঠন আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু করার ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে।

২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে গৃহিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন সংগঠন।

'আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নরঘাতক পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করার লক্ষ্যে জনমত গঠন করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তব রূপদানসহ ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সকল শ্রেনী-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নিরলস কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের পরিবেশিত সংবাদের মাধ্যমে অবগত হয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সকল শ্রেনী-পেশার অগণিত মানুষ আজ ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছে ও সম্পৃক্ত হচ্ছে, যার প্রত্যক্ষ সুফল হিসেবে আজ স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরে বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম ধাপ বিজয় অর্জন হলো। ২০১৭ সালে ২৫ মার্চ বাংলাদেশের জনগণ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করলো। কিন্তু বিএনপি বা ২০ দলীয় জোট গণহত্যা দিবস পালন করলো না কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো ২০০২ সালে বিশ্বের ১১৪টি দেশ এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যে, ২০০২ সালের আগে কোন গণহত্যার বিচার হবেনা। খালেদা জিয়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল বলেই তারা গণহত্যা দিবস পালন

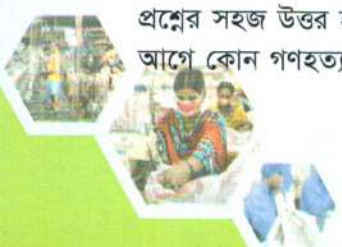

করতে পারেনা।

মে' দিবসের চেতনা হলো-শ্রমজীবী মানুষের অর্জন সুসংহত রাখা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেই সাথে সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আজ বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত ও ঘোষিত রায় কার্যকর করা, জঙ্গি, সন্ত্রাস ও ধর্মান্ধতাকে মোকাবেলা করা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাকে শানিত করে পাকিস্তান এবং তাদের দোসর বিএনপি-জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতির্ণ হতে হবে। শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ আজ এগিয়ে চলেছে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
দুনিয়ার মজদুর এক হও,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও করণীয়

শিরীন আখতার, এম.পি
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজে যখন অসহায় ও অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন মানুষের পুরো জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। অর্থনীতিতে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাকারী প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তখন সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরোধ, মর্যাদা বৃদ্ধির শোভন মজুরি, কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম এবং বিনোদন, মাতৃত্বকল্যাণ সহায়তা, শিশুদের নিরাপত্তা, সন্তানদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বার্ধক্য, অক্ষমতা ও অসুস্থকালীন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অবশ্য করণীয়। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও সমাজনীতি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের লাভ এবং তাকে রক্ষা করবার বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালু থাকে। যখন গণতন্ত্রের কথা বলি, সামাজিক সুযোগ পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয় তখন সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র মানবিক সমাজের ভিত্তি, যেখানে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত, কর্মহীন, অক্ষম, অসুস্থ্য এবং বাধ্যর্ক্যজনিত অবস্থার কারণে বিষয়গুলিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। এসকল চাহিদা মোতাবেক বহু আগেই সার্বজনীন মানবাধিকার নীতিমালায় গৃহীত হয়েছে কতগুলি বিষয়। যা থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিশেষ কিছু ধারা প্রবর্তন হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় শ্রমিকের অন্যান্য অধিকারের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা অধিকারকে শ্রমিকের মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ধারা-২২ এ বলা আছে, সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে, প্রত্যেকেরই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ত্ববান। ধারা-২৩ ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে সুরক্ষার অধিকার রয়েছে। খ. প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার রয়েছে। ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। ধারা -২৪ প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তিসংগত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অর্ন্তভুক্ত।

ধারা -২৫ ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপরাগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাহিরে জন্ম হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

আইএলও কনভেনশন ও সামাজিক নিরাপত্তা

আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক কনভেনশন গ্রহণ করেছে। সেগুলো হলো-

১. কনভেনশন নং ১০২: সামাজিক নিরাপত্তা (ন্যূনতম মানদণ্ড) কনভেনশন ১৯৫২

২. কনভেনশন নং ১১৮: আচরনের সমতা (সামাজিক নিরাপত্তা) কনভেনশন ১৯৬২ এবং

৩. সামাজিক নিরাপত্তা আইনের সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন ১৯৮২।

কনভেনশন নং ১০২: সামাজিক নিরাপত্তা (ন্যূনতম মানদণ্ড) কনভেনশন ১৯৫২

এ কনভেনশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম পক্ষে নিম্নোক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে: ১। চিকিৎসা সেবা ২। অসুস্থ্যতাকালীন সুবিধা ৩। বেকারত্বজনিত সুবিধা ৪। বার্ধক্যজনিত সুবিধা ৫। চাকুরীকালিন আঘাতজনিত সুবিধা ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ৬। পারিবারিক সুবিধা ৭। মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৮। অক্ষমতাজনিত সুবিধা ৯। পোষ্যদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা ১০। জীবনধারণ উপযোগি ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা।

কনভেনশন নং ১১৮: আচরনের সমতা (সামাজিক নিরাপত্তা) কনভেনশন ১৯৬২

এই কনভেনশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম পক্ষে নিম্নোক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে: ১। চিকিৎসা সেবা ২। অসুস্থ্যতাকালীন সুবিধা ৩। মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৪। অক্ষমতাজনিত সুবিধা ৫। বার্ধক্য সুবিধা ৬। পোষ্যদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা ৭। কর্মস্থলে আঘাতজনিত সুবিধা ও দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ৮। বেকারত্ব সুবিধা ৯। পারিবারিক সুবিধা। বাংলাদেশ সরকার ১০২ নং কনভেনশন এখনও অনুসমর্থন করেনি। কনভেনশন ১১৮ নং অনুসমর্থন করলেও সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কোন আইন এখনও হয়নি। এছাড়াও আইএলও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ধরণের বীমা চালুর সুপারিশ করেছে। বীমা সামাজিক নিরাপত্তা শক্তিশালী করার উল্লেখযোগ্য এক উপায় হলেও আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের এ সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সামাজিক নিরাপত্তা

অনুচ্ছেদ - ১৫ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়। ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিধান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শ্রম আইন ২০০৬ এমন এক সময়ে পাশ হয়েছে যখন সামাজিক নিরাপত্তার ধারনা বিশ্বজুরে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ আইনে শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্রের প্রায় সকল ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট অধ্যায় আকারে বর্ননা করা হলেও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কোন আলাদা অধ্যায় সংযোজিত হয়নি।

এ আইনে শ্রমিকের চাকুরি অবসানে ক্ষতিপুরণের আওতা বেড়েছে, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা বা প্রসুতি কল্যাণ সুবিধা, মৃত্যুজনিত সুবিধা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান রাখা হয়েছে, বীমাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, বেড়েছে দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ ও বেসরকারী খাতে শ্রমিকগনের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনের জন্য বলা হয়েছে। একই সঙ্গে, সমন্বিত এই শ্রম আইনে সরকারি উদ্যোগে শ্রমজীবীদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একাট জাতীয় কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকের যে সব সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার উল্লেখিত হয়েছে তা হ'ল: গ্রাচুইটি, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, মৃত্যুজনিত সুবিধা, চাকুরিচ্যুতিজনিত ক্ষতিপুরণ, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা বা প্রসুতি কল্যাণ সুবিধা, দুর্ঘটনাজনিত জখমের জন্য ক্ষতিপুরণ, ভবিষ্য তহবিল এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান।

আন্তর্জাতিক বা জাতীয় সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আইন, নীতি, বিধান, উল্লেখ থাকলেও এর বাস্তায়নের বিষয়টি হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম বিষয়টি হচ্ছে শ্রমিকদের কাছে বিষয়গুলিকে তুলে ধরা। তাদের অধিকার এবং সুযোগ সম্পর্কে আইনে যা বলা আছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা। কেবল ধারণা দেয়াই যথেষ্ট নয় এ ধারণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃত কাজটি করার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও তার ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে অল্প কিছু সংখ্যক শ্রমিক সংগঠিত ও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সেখানে অধিকাংশ শ্রমিকই অসংগঠিত এবং ট্রেড ইউনিয়নের বাইরে অবস্থান করে। এ রকম একটি অবস্থায় যে সকল আইন রয়েছে তা কাগজে-কলমে পড়ে থাকে সিংহভাগ। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক উদ্যোগ। একদিকে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তৈরি করা অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি অধিকতর প্রচার প্রচারণায় যাওয়া এবং তা আদায় করার জন্য তাদের সক্ষম করে তুলতে হবে। এ সক্ষমতা গড়তে শ্রমিক নারী, যুবক ও সামাজিক সংগঠনসমূহের ঐক্য জরুরি এবং রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি যত বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যাবে এবং তা আদায় করবার জন্য শ্রমিকদের সক্ষম করে তোলা যাবে তখনই সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে শ্রমজীবী মানুষের কাছে। মহান মে দিবসে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্যতম বিষয়বস্তুর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা একটি অন্যতম হাতিয়ার। তাকে যথাসময়ে কাজে লাগানোর সক্ষমতা অর্জনই আজকে অধিকতর কর্তব্য।

**"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"**

পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রম, শ্রমিক ও শিল্পের উন্নয়নে বিকেএমইএ-র পরিকল্পনা

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এম.পি
সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড
এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)

ব্লুমবার্গ ও ওয়ার্ল্ড ফিন্যান্স নিউজ একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে আগামী ১৫ বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্ষতি হবে ২ ট্রিলিয়ন (২ লাখ কোটি) ডলার। অত্যাধিক গরমে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণে এ ক্ষতি হবে বলে তারা জানিয়েছে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে এশিয়ার দেশগুলো এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো তীব্র তাপদাহের কারণে বিশ্বের অন্তত ৪৩টি দেশের অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার সংকটে রয়েছে। এর ফলে দেশগুলোর জিডিপি আশংকাজনক হারে হ্রাস পাবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ চীনের জিডিপি ১ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার জিডিপি ৬ শতাংশ হ্রাস পাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ ভারত ও চীনে জিডিপি হ্রাসের পরিমাণ হবে ৪৫ হাজার কোটি ডলার। তবে শ্রমঘন শিল্প-কারখানায় কাজের পালা ও কর্মঘন্টা পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ক্ষতি হ্রাস করা যেতে পারে।

তাই আগামী দিনগুলোতে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কিভাবে কম বিদ্যুৎ ও শক্তি ব্যয়ে কর্মস্থলে তাপমাত্রা কমানো যায়, সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার সময় এসেছে। বিকেএমইএ একটি আধুনিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সংগঠন হিসেবে নীট শিল্প উদ্যোক্তাদের পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তণের প্রেক্ষাপটে শিল্প চেইনে ভবিষ্যতে কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তার প্রতিকারের বিষয় নিয়ে উন্নয়ন গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ব্লুমবার্গ ও ওয়ার্ল্ড ফিন্যান্স নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নিয়ে বিকেএমইএ ইতোমধ্যেই নীট শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ অবহিত রাখার কাজ শুরু করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরো আশংকা করা হয়েছে, "তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মতো কম মজুরি ও স্বল্প দক্ষতার কারখানায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ হ্রাস পাবে"। এটি বাংলাদেশের মতো অনেকটা একক পণ্য নির্ভর একটি বিকাশমান অর্থনীতির জন্য কোনভাবেই সুখবর নয়। তাই নগর ও শিল্প উন্নয়নের ধরন সম্পর্কে আরো গভীরভাবে ভাবনা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, "জনস্বাস্থ্য ও টেকসই উন্নয়ন" নাকি "অর্থনৈতিক অগ্রগতি"---আগামী দিনগুলোয় কোন বিবেচনাটি প্রাধান্য পাবে, তা এখনো স্পষ্ট না হওয়ায় উন্নয়নের ফিজিক্যাল ও প্র্যাগমেটিক কাঠামোটি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারনা পাওয়া যাচ্ছে না। এটি শিল্প উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। এ বিষয়েও আগামীতে সরকার, নীতিনির্ধারক ফোরাম, উদ্যোক্তা শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণির সমন্বিত চিন্তা ভাবনা জরুরী।

তবে কাঠামোগত এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় যতই ঘটুকনা কেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নেরর জন্য শিল্পকে থামিয়ে রাখার উপায় নেই। বাংলাদেশের নীট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই এ শিল্পকে বিশ্বের বাজারে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্র্যান্ডিং এর বিকল্প নেই। কারন ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি কার্যকর ব্র্যান্ডিং কৌশল একদিকে ওই পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদাকে পৃভাবিত করে, অন্যদিকে উক্ত বাজার ব্যবস্থায় পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। সৃজনশীলতা, বিশেষত্ব, পণ্যের গুনগত মানের ধারাবাহিক অক্ষুন্নতা, বিশেষ শ্রেণীর ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা এবং সর্বোপরি নিজস্ব লোগো বা প্রতীক ইত্যাদি সবকিছু মিলেই ব্র্যান্ডিং; যা ওই নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্যান্য সমধর্মী পণ্য থেকে এ পণ্যকে পৃথক ভাবে উপস্থাপন করে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্র্যান্ড একটি অঙ্গীকার। বাংলাদেশের নীট শিল্পখাতের আন্তর্জাতিক বলয়ে একটি ব্রান্ড ইমেজ প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। শুধু ব্র্যান্ডিং ইমেজ তৈরী করা গেলে বাংলাদেশের নীট শিল্পের রপ্তানী পরিসংখ্যান সন্দেহাতীতভাবেই আরো স্ফীত হবে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে রক্ত আর ঘামে ভেজা ঐক্যবদ্ধ পরিশ্রমের ফসল। যে গ্রীক সভ্যতার নান্দনিকতা ও সৌকর্য নিয়ে আমরা গর্ব করি, সে সভ্যতার পিছনেও রয়েছে হাজারো শ্রমিকের রক্তাক্ত পরিশ্রম। প্রাচীন রোমান সভ্যতার সময়েও দলিত শ্রেণির মানুষেরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অমানুষিক নির্যাতন ও নিষ্পেশনের শিকার হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, এই দলিত শ্রেণির ক্রোধ আর দ্রোহের কারনেই রোমান সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিলো। শ্রমিকদের বিকাশের ইতিহাস বঞ্চনার হলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মূলত তাদের কারনেই ইতিহাস ও রাজনীতির পালাবদল ঘটেছে। এমনকি ইউরোপের শিল্পবিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিলো শ্রমিকদের কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের কারনে। আবার শিল্প বিকাশের পথেও শ্রমিকদের ভুমিকা রয়েছে অপরিসীম। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বিস্তৃতি এবং চীন সভ্যতার গোড়াপত্তনের মাধ্যমে যে কৃষি বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব হয়েছিলো, তারও মূলে রয়েছে শ্রমিকরা। বর্তমানে নীটশিল্প বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানী খাত এবং রপ্তানীর পরিসংখ্যান বিচারে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। বিকেএমইএ'র অবিরত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জাপানসহ পৃথিবীর ৪৯টি দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধাসহ "ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি" সুবিধা প্রাপ্তি, নতুন বাজার সম্প্রসারণ, বাংলাদেশে পশ্চাদপদ শিল্পের অতিব সংহত অবস্থান এবং অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে চীনের ক্যাপিট্যাল-ইনটেনসিভ শিল্পে বিনিয়োগের কারনে পোশাক শিল্পের উপর মনোযোগ কমে যাওয়া এবং সর্বোপরি পোশাক শিল্পে বিশ্বে আমাদের অবস্থানের কারনে বাংলাদেশের নীট শিল্পের যে অমিত সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য শিল্পমালিকদের ব্যবস্থাপনা কৌশলের পাশাপাশি শ্রমিকদের শ্রম ও প্রচেষ্টার রয়েছে বিশাল ভূমিকা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নীট সেক্টরের আজকের এ অবস্থানের পেছনে শ্রমিকরাই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। মহান মে দিবসে শ্রমিকদের এ অবদানের প্রতি বিকেএমইএ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

বিকেএমইএ একটি সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংগঠন হিসেবে ধারাবাহিকভাবেই বাংলাদেশের নীট সেক্টরের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং নীট সেক্টরের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য নেয়া বিকেএমইএ কার্যক্রমগুলো পুরো শিল্পখাতের উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ সেক্টরের কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীটওয়্যার খাত থেকে ১৩.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের পণ্য রপ্তানী হয়েছে; যা মোট পোশাক রপ্তানী খাতের ৪৯.১৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের মোট রপ্তানী পরিসংখ্যানের ৩৯%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিডিপিতে নীট সেক্টরে অবদান ছিলো ৬.০৪%। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট রপ্তানী টার্গেট ১৪.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে জুলাই'১৬ --জানুয়ারি'১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৮.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর নীট পণ্য রপ্তানী হয়েছে; যার প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.০৩% বেশী। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে নীট সেক্টরের প্রভূত অবদান রয়েছে এবং এ সেক্টর থেকে মূল্য সংযোজনের হারও ৭০ শতাংশেরও বেশী।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। তাই রাজনৈতিক কার্যক্রমে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক পলিসি ইস্যুগুলো আলোচিত হলে, তা ব্যবসায়িদের জন্য সুযোগ তৈরী করে। এটা ইতিবাচক এজন্য যে, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বিশ্ব রাজনীতির ওপর বৈষম্য বিষয়ক আলোচনা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত প্রভাব ফেলছে। বৈষম্য বলতে গেলে এখন একটি বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিনত হয়েছে। এ কারনে জাতীয় অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার নির্বাচনে পর্যায়ক্রমে এমন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, যা সমাজ ও অর্থনীতিতে আরো সমতা বা ন্যায়পরায়নতা তৈরী করবে। তাছাড়া অর্থনীতির সুবিধাগুলো সকলের মাঝে বিতরনের গুরুত্ব স্বীকার করা নতুন কিছু নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অসমতা ও চরম বৈষম্য সবসময় দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রো-গ্রোথ পলিসিগুলো রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল এবং এগুলো শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চ্যুতি, সামাজিক অস্থিরতা, এমনকি সংঘাত দ্বারা ব্যাহত হয়, এমনটাই দেখা গেছে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে।

ফ্রেঞ্চ অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটির আন্তর্জাতিকভাবে বেস্টসেলার বই 'ক্যাপিটাল-ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি' নাটকীয়ভাবে সম্পদ বৈষম্য নিয়ে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং কী কী নিয়ামক এ বৈষম্য তৈরী করে চলছে, তার একটি সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরেছে। উক্ত বিষয়টির অবতারনা এই জন্য যে, নীট শিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনমান পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তারা।

কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যায়, সময়ে অসময়ে একধরনের সুবিধাবাদী গোষ্ঠী শিল্প চেইনের উৎপাদন এবং উপার্জনের সঠিক এবং যথার্থ গাণিতিক বিশ্লেষণ বিবেচনায় না নিয়ে বৈষম্য আরোপের একটা বিষয় শিল্প মালিকদের উপর চাপিয়ে দেয়। এটি দৃষ্টিকটু এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং সংস্কৃতিতে বৈষম্যের বিষয়টি তাই সুষ্ঠু গাণিতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উঠে আসা উচিত বলে আমরা মনে করি।

তাছাড়া কোন শিল্প বিকাশের প্রক্রিয়াই সরলরৈখিক নয়। পুঁজি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন, শ্রমিক সংগ্রহ, উৎপাদন কার্যক্রম শেষে রপ্তানী প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার এ চেইনে যে শ্রম ও আর্থিক বিন্যাস জড়িত, তাই মূলত শিল্প চেইন এবং এখান থেকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরী হয়। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে উক্ত শিল্প চেইনের প্রভাব সহজেই প্রতিভাত হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরী। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং গতি বিবেচনায় নিলে অবকাঠামোর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের একটি গভীর সমুদ্রবন্দরের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমাদের অর্থনীতি এখন বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। আশা করা যাচ্ছে, এ বছর আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করবে। বাংলাদেশ একুশ শতকের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর একটি, যা মূলত 'নেক্সট ১১' নামে পরিচিত (সূত্রঃ গোল্ডম্যান স্যাকস)।

তৈরী পোশাকখাতে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রপ্তানীখাতের প্রবৃদ্ধির হার অনেককেই অবাক করেছে এবং ২০২১ সাল নাগাদ রপ্তানী আয় প্রতি বছর ৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু এত সম্ভাবনার দেশে এখনো পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিকমানের সামুদ্রিক অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিকমানের সমুদ্রবন্দর তৈরী করা নিয়ে কোন দীর্ঘ পরিকল্পনা আমরা লক্ষ্য করিনি। অথচ চট্টগ্রাম ও মংলায় বিদ্যমান দুটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রতি বছর বাংলাদেশ ৬০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করছে। কিন্তু দুটি সমুদ্রবন্দরই বড় মাদার ভেসেল প্রবেশের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নয়। উল্টো পণ্য খালাসের জন্য ছোট ছোট লাইটারেজ জাহাজ ব্যবহার করা হয়, যা শুধু আমদানী-রপ্তানীর ব্যয় বৃদ্ধি করে। এছাড়া পণ্য খালাসের আগে বহির্নোঙরে অপেক্ষার জন্য প্রতিদিন অতিরিক্ত ১৫ হাজার ডলার করে গুনতে হয় (আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুযায়ী), যা বন্দর দু'টিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে পায়রা সমুদ্র বন্দর, পানগাঁও সমুদ্র বন্দর এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমান যেভাবে বাড়ছে, তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে এখনই গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

এর পাশাপাশি আমাদের রপ্তানী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহ, যেমন-ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম. তাদের বস্ত্র শিল্পের বিকাশের জন্য বেশ কিছু ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এর প্রেক্ষাপটে বিশ্ব প্রতিযোগিতার বাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে বেশ কিছু উদ্ভাবনী ও কৌশলী পলিসি গ্রহন করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইটিসি এর তথ্যানুযায়ী চীন বর্তমান পোশাক বাজারের প্রায় ৩৬ শতাংশ ধরে রেখেছে। চীনের এ বাজার ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ যদি চীনের ছেড়ে দেয়া বাজারের ১ শতাংশ দখল করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে প্রায় ০.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাছাড়া বাংলাদেশ শীঘ্রই এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হবে যার চাপ পড়বে রপ্তানি খাতে। তাই বাড়তি রপ্তানি সম্ভবপর করতে বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিবেশি প্রতিযোগি দেশসমূহের কথা বিবেচনায় নিয়ে বিচক্ষণতার সাথে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

১। উচ্চ মূল্য সংযোজিত পোশাক তৈরী করা। পোশাকের মূল্য সাধারণত নির্ধারণ হয় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ও বিভিন্ন কাঁচামালের মূল্য সুচক বিবেচনায় নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের ক্রেতাগণ তৈরী পোশাক ক্রয়ের জন্য পূর্বের চেয়ে হ্রাসকৃত দাম প্রস্তাব করছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিক মূল্য পাওয়া যায় এমন ধরনের পোশাক তৈরীতে দক্ষতা অর্জন এবং রপ্তানিতে উদ্যোগ নিতে হবে। এ দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বৈশ্বিক ফ্যাশন ডিজাইনের উপর দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রনোদনা দেয়া যেতে পারে।

২। বাংলাদেশ বিদেশের বাজারে যে পোশাক রপ্তানি করছে তার চুড়ান্ত বিক্রয়মূল্যের মাত্র ১৫% পোশাক প্রস্তুতকারকগণ অর্জন করতে পারেন। তাই, পোশাক বাজারের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে পোশাক প্রস্তুতকারকগণকে নিজস্ব ব্র্যান্ডে বিশ্ববাজারে পোশাক বাজারজাতকরণ করতে হবে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকারকগণের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা অর্জনে এবং বাজারজাতকরনের জন্য বিদেশের মাটিতে আউটলেট স্থাপনে নীতিগত এবং আর্থিক সহযোগিতা দেয়া প্রয়োজন।

৩। বিশ্ব মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা সঠিকভাবে পেতে হলে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সে অনুযায়ী, নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে সম্ভাব্য আমদানিকারক দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং চুক্তি হতে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের জন্য চুক্তির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৪। বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় দেশসমূহে পোশাক রপ্তানির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণামূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান বাজারের সাথে সাথে নতুন বাজার খুঁজে বের করার পাশাপাশি ঐসকল দেশসমূহে পোশাক রপ্তানিতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তা বের করার জন্য নির্দিষ্ট বাজার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এর পাশাপাশি সম্ভাব্য সমাধানের পথ বের করা। এজন্য সরকারের বৈদেশিক মিশনগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশীয় রপ্তানিকারকদের জন্য তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। তাছাড়া বাজার বিশ্লেষণ এবং তথ্য নির্ভর গবেষণার জন্য ভারতের Scheme for Research and Development for the Textiles Industry এর ন্যায় দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে।

৫। পোশাক রপ্তানিতে লীড টাইম হ্রাসের জন্য উৎপাদনের কাঁচামালের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার দিকে নজর দিতে হবে। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থার দিকেও মনোনিবেশ করতে হবে।

৬। বর্তমান বিশ্বে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং সেসাথে গুনগত মান নিশ্চিত করা হয় যার মাধ্যমে শিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামুলক অবস্থানে টিকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত এ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমূহের দাম বেশি হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ নিজস্ব তহবিল দ্বারা এটা সম্ভব না হওয়ার কারণে উচ্চ সুদে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে তা আমদানি করতে বাধ্য হয়। এতে দেশে তৈরী পোশাকের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের অবনতি ঘটায়। তাই এ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল গঠন এবং এ তহবিল থেকে উৎপাদকগণকে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋন প্রদান করা যেতে পারে।

৭। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তিসমুহ সহজলভ্য না হওয়ার কারনে উচ্চ মূল্য দিয়েও অনেক সময় এসব উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভবপর হয়না। তাই প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন চুক্তির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো থেকে এসব উন্নত প্রযুক্তি আনয়ন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সকল প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য ঐসকল দেশের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ক্রেডিট ট্রান্সফার সহ এ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক স্মারক চুক্তি করা যেতে পারে।

তবে যা কিছু করা হোক না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের নীট শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের দেশের শ্রমিকদের শ্রম, মেধা এবং পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ শ্রমিকদের কারনেই নীট শিল্পের পরিধি এবং প্রবৃদ্ধি আজকের পর্যায়ে এসেছে। অনেক শ্রম-বান্ধব কর্মসূচী নিলেও শ্রমিকরা যাতে শিল্পের সাথে মিশে সর্বোচ্চ আত্মনিবেদন করতে পারে, সেদিকে বিকেএমইএ শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে।

একারনেই আমরা গর্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশের নীটশিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের পরিমান প্রায় শূন্যের কোঠায়। এটা সম্ভব হয়েছে মালিক, শ্রমিক এবং বিকেএমইএ'র মধ্যে একটি সুষম সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরী হওয়ার কারনে। এক্ষেত্রে অবশ্যই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ, পুলিশ প্রশাসন তথা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের অবদান সবচেয়ে বেশী বলে আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নিম্নে বিকেএমইএ'র শ্রমিককল্যাণ বান্ধব কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হলোঃ

ক)	রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে বিজিএমইএকে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
খ)	বিকেএমইএ'র খাঁনপুরস্থ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য ২৬,৮৫,০০০/- টাকার একটি এম্বুলেন্স অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে নীটওয়্যারের শ্রমিকরা উক্ত হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা লাভ করবে।
গ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহায়তায় অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিকেএমইএ।
ঘ)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এ এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর আর্থিক সহযোগিতায় এসইআইপি প্রজেক্টের মাধ্যমে বিকেএমইএ ২০১৮ সালের মধ্যে বিনামূল্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে।
ঙ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাস্থ বিসিকে "সানি সাইড ডে-কেয়ার" সেন্টারের মাধ্যমে বিকেএমইএ'র প্রতিদিন কর্মজীবী মায়েদের কমপক্ষে ৬০ জন শিশুকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও পড়ালেখার (কর্মকালীন সময়ে) ব্যবস্থা করা করা হয়েছে।
চ)	সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক উৎসব আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ছ)	নীট শিল্পে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শ্রম অসন্তোষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "দ্বন্দ্ব নিরসন ও শৃঙ্খলা নীতি" শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
জ)	বিকেএমইএ নিজস্ব হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।
ঝ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ব্র্যাকের সহায়তায় "টি.বি প্রজেক্ট" এর মাধ্যমে কর্মরত নীট শ্রমিকদের যক্ষা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বিনামূল্যে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।
ঞ)	গত ২৫ জানুয়ারী'১৫ রবিবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিকেএমইএ নারায়ণগঞ্জে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের বেদখলকৃত জায়গায় শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে ৩,০০,০০০,০০/- (তিন কোটি) টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ট)	বিকেএমইএ কর্তৃক বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল" এর আওতায় ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন মহিলা শ্রমিককে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে টাকা প্রদানের জন্য কাজ চলছে।
ঠ)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিকেএমইএ'র যৌথ উদ্যোগে চৌদ্দ হাজার শ্রমিক নিয়ে হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ওরস্যালাইন, সেভলন, সাবান ও খাবার দেয়া হয়েছে।
ড)	এডিবি প্রজেক্টের আওতায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায় চারটি ওয়ার্কার্স ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
ঢ)	জিআইজেড এর সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তির আওতায় প্রতিটি কারখানা "ওয়াকার্স ট্রেনিং" সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে।

ণ)	ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার প্রাক্কালে শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে বাড়ি যাত্রার পথে যেন কোন ধরনের ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়তে না হয়, সেজন্য নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান দিয়ে বিশেষ সময়ের জন্য কমিউনিটি পুলিশ চালু করার ব্যবস্থা করেছে বিকেএমইএ।
ত)	বিকেএমইএ শ্রমিকদের উন্নয়নে চাঁনমারিতে একটি ডরমেটরী স্থাপনের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে আসছে।
থ)	এছাড়াও বিকেএমইএ বিসিকে একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। খুব শীঘ্রই এটি উদ্বোধন করা হবে। এরফলে যে কোন ধরনের অগ্নিজনিত দূর্ঘটনা থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা সহজ হবে।
দ)	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিকেএমইএ ২০১৫-২০১৮ সালের মধ্যে ৫,০০০ (পাচঁ হাজার) নতুন নীটওয়্যার শ্রমিক প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে কাজ করছে।
ধ)	বড় কারখানাগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ন)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং ইপিবি'র সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জের বিসিকে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের (মূলত হেলপার) ট্রেনিং প্রদান করে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তর করার কাজ চলছে।
প)	শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত যেকোন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য "লেবার এ্যাফেয়ার্স সেল" গঠন এবং এর আওতায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে শ্রম আইনানুসারে সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
ফ)	কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সুশ্রষা প্রদানের জন্য ডাক্তার নিয়োগ দেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ব)	বিকেএমইএ ইতোমধ্যেই আইএলও এর সহায়তায় অক্যুপেশন্যাল হেলথ এন্ড সেফটি ইউনিট গঠন করেছে এবং এর আওতায় প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে সেফটি কমিটি গঠনের কাজ চলছে। ফলে শ্রমিকরা কর্মরত কারখানাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে আরো বেশী সচেতন থাকতে পারবে।

সমাপ্তি বক্তব্য ঃ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিসংখ্যান, জ্ঞান নির্ভর ও গবেষনালব্ধ ব্যবসায়িক কৌশল---এ সবগুলোই আন্তর্জাতিক শিল্প ব্যবস্থাপনার এখন গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। তাই ব্যবসা পরিচালনা কাঠামো এখন পরিসংখ্যানভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী কর্মপরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল নিয়ে তাই নতুনভাবে চিন্তাভাবনা চলছে। কিন্ত বাংলাদেশের নীট শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের বিকাশ এবং উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে ত্বরান্বিত হয় না। তাই নতুন অবিকশিত বাজারগুলো সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নীট পণ্যের রপ্তানী কৌশলকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়ার কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই জাপান ও রাশিয়ার বাজার উম্মোচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অধিক সম্ভাবনাময় দক্ষিণ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বাজারে প্রবেশের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে পদ্ধতিগত কৌশলের দূর্বলতা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিজমের সঠিক প্রায়োগিক অক্ষমতার কারণে বর্তমানে আমাদের নীট শিল্প কারখানাগুলো অতিরিক্ত অপচয়ের শিকার হচ্ছে এবং এর কারনে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুনাফার পরিমান হ্রাস পাচ্ছে আশংকাজনকহারে। তাই সদস্যভূক্ত শিল্প কারখানাগুলোতে সংগঠিত বিভিন্ন অপচয়মূলক কার্যাবলি সনাক্ত করে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক উন্নতি সাধন এবং একইসাথে অপচয় হ্রাস করে পণ্য উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে অধিক গুনগতমান সম্পন্ন নীট পণ্য প্রস্তুত করার জন্য বিকেএমইএ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেব্রিক্স অপটিমাইজেশন- অপচয় রোধের এ ধারাবাহিক কার্যক্রমে একটি নবতর সংযোজন।

সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে নীটপণ্য রপ্তানীতে আরো কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। কেননা আমাদের প্রতিযোগি দেশগুলো বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য নানাধরনের পরিকল্পনা কৌশল ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। তাই এখন থেকেই এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া শুরু করতে হবে এবং নতুন বাজারগুলোতে প্রবেশের জন্য আমাদের চেষ্টা আরো শক্তিশালী করতে হবে। একইসাথে প্রযুক্তিগত পরিকল্পনার পাশাপাশি যন্ত্র কৌশল এবং তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোতেও আধুনিক উৎপাদন কৌশল নিয়ে শিল্প মালিকদের প্রচুর মনোযোগ প্রদান ও পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আর এসবগুলো ক্ষেত্রকে সুসমভাবে সমন্বয় করা গেলে নীট শিল্পের বিকাশ ও ইতিবাচক বিবর্তন ঘটানো কোনভাবেই অসম্ভব নয়। বিকেএমইএ নীট শিল্পের বিকাশের জন্য উক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পোশাক শিল্প ও ভবিষ্যৎ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি
বিজিএমইএ

ইতিহাসে ১ মে হচ্ছে একটি বিশেষ দিন। বিশ্বব্যাপি শ্রমিক আন্দোলনের বহুমূখী সংগ্রামী অধ্যায়ের সাথে এ দিনটি ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত। একশ একত্রিশ বছর আগে ১ মে ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে রিপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবস-আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। মে দিবসে পৃথিবী জুড়ে সকল শ্রমিক একাত্মতা প্রকাশ করে, সংহতি প্রকাশ করে-সেইসাথে প্রত্যাশা করে সুন্দর জীবনের যেখানে কাজের অধিকার, মর্যাদা আর মজুরি হবে নিশ্চিত। আমি শ্রমিক ভাই-বোনদের এ প্রত্যাশার সাথে শতভাগ একাত্মতা প্রকাশ করছি। এ মে দিবসে আমি সমগ্র পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অর্থনীতি যারা সচল রেখেছেন, জাতীয় অর্থনীতির সেবক পোশাকশিল্পে নিয়োজিত আমাদের প্রাণপ্রিয় সকল শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে জানাচ্ছি। একইসাথে তাজরিন ফ্যাশন্স লিঃ এর অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে যেসব শ্রমিক ভাইবোন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে বেদনার সাথে স্মারণ করছি এবং তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

এ ব্যাপারে আজ আর কারুরই কোন দ্বিমত নেই যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে যে কয়টি ক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে রপ্তানিমূখী তৈরি পোশাক শিল্প। ৮০ এর দশকে অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে যাত্রা শুরু করা তৈরি পোশাক শিল্প আজ ২১.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি সফল পরিণত শিল্প। বেসকারীখাতে গড়ে উঠা এ শিল্প সরাসরিভাবে ৪৪ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে; জাতীয় রপ্তানি আয়ে ৮০ শতাংশ অবদান রাখছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে। লক্ষ্যনীয় যে, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ৮০ ভাগই হচ্ছে সমাজের দরিদ্র-অবহেলিত নারী সমাজ, যাদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে উৎপাদনের মূল ধারায় সংযুক্ত হয়ে আজ সমগ্র অর্থনীতির চেহারাই বদলে দিয়েছে। পোশাক শিল্পের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বছরে এ শিল্পে আরও ৩০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে আমরা গভীরভাবে আশাবাদী।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, বর্তমানে পোশাক শিল্পখাতে চাহিদা অনুযায়ী প্রায় ২০-২৫ শতাংশ শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে বিকাশমান পোশাক শিল্পের পূর্ণসামর্থ্যের সদ্ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। পোশাক শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনসম্পদ যোগান দেয়ার জন্য সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগে একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এ মুহূর্তে সময়েরই দাবী। বিশেষ করে অধিকাংশ জেলাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা, পোশাক শিল্পভিত্তিক আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সরকারের সকল ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে কাজে লাগানো ও এ কাজে বিশেষ তহবিল বরাদ্ধ দান-এ বিষয়গুলোতে কালক্ষেপন না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, আরেকটি বিষয়ে এ মুহূর্তে গভীরভাবে ষ্টাডি করারও প্রয়োজন রয়েছে প্রতিকুল পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য আমরা অদক্ষ শ্রমিকদেরকে বিদেশে পাঠাবো, না কি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে পোশাক শিল্পের কাজে লাগাবো, যারা সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। এসব শ্রমিকের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা, চাকুরির নিশ্চয়তা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বলতে কিছুই নেই। প্রতি বছর ৫ ভাগের ৪ ভাগ শ্রমশক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। এদেশের রাজধানী ঢাকা শহরেই কর্মরত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়।

তাদের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে ২ লাখ থেকে ২.৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়, বেসরকারী পর্যায়ে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ, আত্মকর্মসংস্থানে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার মানুষ এবং বর্তমানে প্রবাসে প্রতিবছর ৪ লাখ থেকে ৪.১৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

প্রতিবছর আমাদের প্রায় ৪-৫ লাখ শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। পোশাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় যে, সাম্প্রতিককালে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, শ্রম আইন সংশোধন ও শ্রম বিধিমালা জারীর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ৬ বছরে পোশাক শিল্পে শ্রমিক ভাইবোনদের মজুরি ২২৩% বৃদ্ধি করা হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাক শিল্পে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শ্রমিক ভাইবোন যারা কিনা এ শিল্পের প্রাণ, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শিল্পের পরিপূরক – যারা ভালো থাকলে শিল্প ভালো থাকে আর খারাপ থাকলে শিল্প খারাপ থাকে – তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে। বিজিএমইএ এ সকল পদক্ষেপে সম্পৃক্ত থেকে শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি সংগঠনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করছে।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, সরকার শিল্প ও শ্রমিকের কল্যাণে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে রেশনিংয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমনঃ ডাল, লবণ, তেল, আটা ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হলে শ্রমিক ভাই-বোনেরা উপকৃত হবে। পাশাপাশি, গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বাড়ীওয়ালাদের যখন তখন বাড়ী ভাড়া বাড়ানোর অত্যাচার থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যেতে পারে।

পোশাক শিল্পের প্রতিটি উদ্যোক্তা মনেপ্রাণে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনেরা এ পোশাক শিল্প পরিবারেরই সদস্য। তাদেরকে ছাড়া এ শিল্প কোনভাবে গড়ে উঠতে পারতো না। এ শিল্প বর্তমানে যে পর্যায়ে এসেছে, এ কৃতীত্বের দাবীদার আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনরাও। সুশৃঙ্খল শ্রমিক হিসেবে সারা বিশ্বে আমাদের কর্মী ভাই-বোনদের সুনাম আছে। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অপপ্রয়াস চালায়, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি একান্তভাবে আশা করি, শ্রমিক ভাই-বোনেরা এ ব্যাপারে সজাগ থেকে শিল্পের বিরুদ্ধে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবেন-প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। শ্রমিক ভাই-বোনেরা ভালো থাকলে শিল্প ভালো থাকবে। আর তাই, তাদের কল্যাণে আমরা বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হাসপাতাল নির্মাণ; ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদেরকে বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রদান; শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৫টি স্কুল পরিচালনা; গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করণ, শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রদান ও দক্ষ কর্মীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, পোশাক শিল্পে বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ পোশাক শিল্পকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও আইএলও যৌথভাবে ২৪.২১ মিলিয়ন ডলারের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, সেখানে উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। এই কর্মসূচীটি অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত ত্রি-পক্ষীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তাবয়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিক ভাই বোনেরা যাতে মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারেন, সে ব্যাপারে ক্রেতাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমি মনে করি, উদ্যোক্তা ও ক্রেতারা মিলে একটি নিরাপদ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন, যেখানে আমাদের শ্রমিক ভাই বোনেরা উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী হতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি ও শিল্প সমাজ উন্নয়নে সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

পরিশেষে বলতে চাই মহান মে দিবসের শিক্ষা শুধু শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শানিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার নয় বরং ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জাতীয় আর্থ-সামাজিক মুক্তির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করার বিষয়টিও এ মহান দিবসে অঙ্গীকারের অংশ হওয়া একান্তভাবে বাঞ্চনীয়।

প্রযুক্তির বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান

সালাহ্উদ্দীন কাসেম খান
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে (১৯৮১)। সারা বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। কিছু কিছু দেশ যেমন চীন, ভারত, কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তার ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করে প্রাচুর্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

চীন, কোরিয়া, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ফলে, দরিদ্রতার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে প্রযুক্তি ও দক্ষতার অবদান অনস্বীকার্য। এ উন্নয়নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মানবীয় গুণাবলি ও ন্যায়পরায়ণতাকে উপেক্ষা করা যাবে না। অসাম্য পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না, অন্যথায় অর্জিত উন্নয়ন নিষ্ফল ও অনর্থক হয়ে যাবে। তবে এটা বাস্তব যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত দারিদ্র্য বিমোচন ও কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা ধরে রাখতে হবে এবং অসাম্য অর্থাগমের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও নব্যতা প্রবর্তনের অবকাঠামো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। এ পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকে সৃজনশীল বিনাশ। এ বিন্যাসের মাধ্যমে পুরোনো প্রযুক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস করে নব্য শিল্প প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটে এবং আধুনিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। আমরা লক্ষ্য করি, উন্নত দেশে গবেষণা ও তত্ত্বান্বেষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শিল্পকার্যক্রম তুলনামূলকভাবে সীমিত। কারণ প্রযুক্তির পরিবর্তন মন্তর। এমতাবস্থায় আন্তরাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি বিনিময় শিল্পোন্নতি ক্রমোন্নতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সর্বজাতি সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তৎসঙ্গে বৈদেশিক বিনিয়োগ তৎপরতার মাধ্যমে শিল্প খাতে প্রযুক্তির পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি পরিগ্রহণের জন্য মানবসম্পদের স্তর হতে হবে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ, যাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, শোভন পরিবেশ, দুর্নীতিমুক্ত এবং নিরঙ্কুশ পরিবেষ্টন নিশ্চিত হয়।

শিল্পোন্নয়নের গতিধারা বিকাশের জন্য মূলধন বা পুঁজি সঞ্চয় প্রয়োজন। পুঁজি শক্তিশালী হলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ হয়। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশে জনসংখ্যার হার অধিক, সেসব দেশে মানবসম্পদ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তরিত হলে দক্ষ ও নিপূণ কারিগরসমৃদ্ধ দেশ হবে। ফলে শিল্পোন্নয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দরিদ্রতা দূর হবে এবং অর্থাগমের সমন্বয় ঘটবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন। সমাজব্যবস্থার ন্যায়সম্মত পরিবর্তন ও সুশাসন অপরিহার্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, বৈষম্যহীন অর্থাগম সঞ্চয়ের পথ প্রসারিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব দূর হয়, সরকার নির্লিপ্তভাবে প্রশাসন পরিচালনায় স্বস্তি বোধ করে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনার মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করতে পারলে, শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে, কর্মস্থান বৃদ্ধি পাবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে, পণ্য রপ্তানি করে অর্থ অর্জিত হবে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বৃদ্ধি করতে হবে, রপ্তানির গতি বৃদ্ধি করতে হবে, অধিক পরিমাণ বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে হবে এবং উন্নয়নের বুনিয়াদ স্থায়ীভাবে ও সার্বিকভাবে গঠন করার জন্য অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে।

এর সাথে যোগাযোগ ও বন্দরব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে অধিক জিডিপি অর্জনের প্রচুর সুযোগ বিদ্যমান। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে হবে এবং সে জ্ঞানের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস মে দিবসের চেতনা ও আদর্শ আমেরিকাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনিভাবে বাংলাদেশেও শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং সর্বস্তরের মানুষ এ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের উন্নয়নে আগ্রহী হবে।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম পরিদপ্তর।

১ মে পৃথিবীর ৮০টি দেশে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সরকারী ছুটি থাকে। এ ৮০টি দেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ রক্ষায় এ দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়। এ দিনে শ্রমিকদের নিয়ে যারা ভাবেন, তারা স্মরণ করেন ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ঘটে যাওয়া করুন কাহিনী। তবে এ করুন কাহিনীর সূত্রপাত আরও আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের সমাজ সংস্কারক ও সমাজ বিজ্ঞানী বরার্ট ওয়েন যখন সর্বপ্রথম শ্রমিকদের আট ঘন্টা শ্রম, আট ঘন্টা মনোরঞ্জন এবং আট ঘন্টা বিশ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কিন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ও অধিক মুনাফার জন্য শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের কাজের কোন সময় বেঁধে দিতে রাজী ছিলেন না। এসময় শ্রমিকরা সপ্তাহে ছয়দিন ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা, এমনকি আরও বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য হতো। তাই শ্রমিক সংগঠন ও প্রতিবাদী শ্রমিকরা সর্বোচ্চ আটঘন্টা শ্রমের দাবীতে ইউরোপজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দেন। শিল্প সমৃদ্ধ আমেরিকায় শিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল শেষে এ আন্দোলন প্রবল গতি লাভ করে। এর ২ বছর আগে ১৮৮৪ সালে আন্দোলনকারীরা আমেরিকার ফেডারেশন অব অরগানাইজড ট্রেডস এন্ড লেবার ইউনিয়ন সময় বেধে দিয়েছিল যে ১ মে ১৮৮৬ সালের মধ্যে আট ঘন্টা শ্রমের দাবীকে মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এর সমাধানে ১ মে, ১৮৮৬ সালে আমেরিকা জুড়ে হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। ৪ঠা মে ঘটে হৃদয়বিদায়ক ঘটনা। যদিও বলা হয় এতে চারজন শ্রমিক নিহত ও ৬০ জন শ্রমিক আহত হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য অনেকটাই আড়ালে ঢাকা পড়ে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবছরও জাতীয়ভাবে মে দিবস পালন করছে। শ্রমিক মালিকের সু-সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে শান্তি ও সুষ্ঠ কর্ম-পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ বছর প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মহান এ দিবসে আত্মউৎসর্গকারী শ্রমিকদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও বিশ্বের সকল মেহনতি শ্রমিকদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশ বিগত দেড় দশক যাবৎ প্রায় ৬.১৫ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে, যা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করেছে। জাতীয় এ উন্নয়নে অংশীদার তিনটি পক্ষ হচ্ছে শ্রমিক-মালিক-সরকার। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মালিকের সাথে শ্রমিকের একটি নিবিড় সম্পর্ক দরকার। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে উভয় পক্ষের এ মানসিকতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সরকারের নীতি খুবই ইতিবাচক। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস। একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক মালিক সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ ছাড়া গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা আশা করা যায়না। মে দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিন বদলের মন্ত্রে কাজ করতে হবে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সামিল হতে হবে আমাদের সবাইকে। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সংলাপ একটি চর্চিত ও ফলপ্রসূ পন্থা। শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে কোন বিভেদ বা বিরোধ সৃষ্টি হলে তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন অংকুরেই নিষ্পত্তি করা যায় সেজন্য সকল ষ্টেক হোল্ডারকে কাজ করতে হবে। যথার্থ অর্থে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিভেদ ভুলে সু-সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে অধিক উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হবেই

ব্রত। সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে কিছু দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে যেমন- নেপাল ও শ্রীলংকা। স্বাধীনতার পূর্বে সিংগাপুরে এমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল না। সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সিংগাপুর এখন উন্নয়নের শিখরে। ইউরোপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো সামাজিক সংলাপ। আমাদের দেশেও শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও সামাজিক সংলাপের ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। তবেই জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকবান্ধব। তাঁর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে শিল্প কলকারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে সমিতি বা সংঘ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তার অধীনে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকৃত। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার দলিলে ২৩ (৪) অনুচ্ছেদে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও) এর ৮৭ ও ৯৮ কনভেনশনে গুরুত্বের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৬ এ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে আরো সহজ করে শ্রমিককে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৭৬৯ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ১৩২ টি শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশন, ৪৪ টি গার্মেন্টস ফেডারেশন ও ৩২ টি জাতীয় ভিত্তিক ফেডারেশন রয়েছে।

শ্রম পরিদপ্তরের অন্যতম কাজ-শ্রম বিরোধ নিস্পত্তিকরণ। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সৃষ্ট মত পার্থক্য কিংবা বিরোধকেই শিল্প বিরোধ বলা হয়ে থাকে। তবে শ্রমিক-মালিকদের মাঝে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা করে বিরোধ নিস্পত্তিতে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিস্পত্তিতে উৎসাহ প্রদান করি। শিল্প বিরোধ যদি দ্বিপাক্ষিকভাবে নিস্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তবে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী ৩য় পক্ষ অর্থাৎ সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রম পরিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ শিল্প বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের জন্য সালিশ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। যেহেতু শিল্পে শান্তি ও সু-সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নতিই আমাদের কাম্য সেহেতু যেকোন প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত শিল্প বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সংঘাতের পথ পরিহার করে সালিশের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মত পার্থক্য কমিয়ে সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হতে আমরা সহায়তা করি। সালিশ দক্ষতার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। সাম্প্রতিক সময়ে সালিশের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন সেক্টরে শ্রমিক আহুত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা – শ্রম পরিদপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা।

বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, শ্রম আইন- ২০০৬ সংশোধন, বাংলাদেশ বিধিমালা ২০১৫, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, নাবিকদের জন্য মেরিটাইম আইন সংশোধন, শিশু-শ্রম নীতি ২০১১ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১০, ব্যক্তিমালিকানাধীন সরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালাসমূহ উল্লেখ্যযোগ্য। সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪২টি সেক্টর চিহ্নিত করে গার্মেন্টস সহ ৩৯টি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে।

শ্রম পরিদপ্তরের অধীন ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ১টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট, ৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দেশের প্রচলিত শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম অর্থনীতি, শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিক শিক্ষা ও কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়নসহ বিবিধ বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করেছে এবং অব্যাহত উন্নয়ন ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের বিভিন্ন শিল্পোঞ্চল সমূহে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে চিকিৎসা সেবা, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, পরিবার পরিচর্চার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও শ্রমিকদের বিনোদন সেবা প্রদান করা হয়।

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহ আরো যুগোপযোগি করে সামাজিক সংলাপ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্ভব। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরের ২২ জুন বাংলাদেশ ২৯টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করে, যা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা। ১৯৯৮ সালে ১টি সহ ২০১৪ সালে আরো ২টি কনভেনশন অনুসমর্থিত হয়েছে। বাংলাদেশ এ যাবৎ ৩৫টি আই.এল.ও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। যার মধ্যে ৩২টি কনভেনশন আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে অনুসমর্থিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন নিষ্পত্তি ও ইহার কৌশল প্রক্রিয়া আই.এল.ও, আন্তর্জাতিক পোষাক ক্রেতা সংগঠন ও বাংলাদেশস্থ আমেরিকান দূতাবাস কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গণশুনানীর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রশংসার দাবী রাখে।

সর্বোপরি শ্রমিকদের আইনানুগ দাবী পূরণে মালিকগণকে আন্তরিক হতে হবে। তবেই শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন হবে।

**"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"**

HISTORICAL DEVELOPMENT OF LABOUR LAWS

MD. SHAMSUZZAMAN BHUIYAN
(Additional Secretary)
Inspector General
Department of Inspection for Factories and Establishment

Introduction: The objective of labour legislation was to maintain industrial peace designed to advance economic growth. Even though the industrial revolution resulted in the maximization of production and the national income and so on the per capita income went to high terrain, paradoxically the wage earning class did not improve. Rather their condition became more disgraceful both outside and inside the factory. Labour laws emerged when the employers tried to restrict the powers of workers' organizations and keep labour costs low. The workers began demanding better conditions and the right to organize so as to improve their standard of living. Employer's costs increased due to workers demand to get higher wages and better working conditions. This led to a chaotic situation which required intervention of government. In order to put an end to the disputes between the evercontending employer and employee, the government enacted many labour laws.

The price per unit of time, or wage rate, commanded by a particular kind of labour in the market depends on a number of variables, such as the technical efficiency of the worker, the demand for that person's particular skills, and the supply of similarly skilled workers. Other variables include training, experience, intelligence, social status, prospects for advancement and relative difficulty of the work. All these factors make it impossible for economists to assign a standard value to labour. Instead, economists often quantify labour hours according to the quantity and value of the goods or services produced. A demand for labour laws reforms had been at the core of debate for a long time. Everything, including concentration of workforce in the unorganized sector, is blamed on rigid labour laws.

An important distinction that is popularly made nowadays in all discussions relating to labour legislation is between workers in the organized/formal sector and those in the unorganized/informal sector. Many who make this distinction do so with hidden motives, yet we must estimate with it especially because out of the total workforce in the country, 92% work is in the informal sector while only 8% work in the formal sector. At the outset it must be remembered that those who were unorganized yesterday are organized today and those who are unorganized today desire to become the organized tomorrow. The move towards granting protection to the workforce continued on the basis of the fact that the worker is a weaker partner in employer-employee equation. It was also in this background that the government sided with the workers that resulted in enactment of Bangladesh Labour Law-2006 and Bangladesh Labour Rules 2015.

Labour law contains laws, administrative rulings, legal rights of, and restrictions on, working people and their organizations. As such, it mediates many aspects of the

relationship between trade unions, employers and employees. In other words, labour law defines the rights and obligations as workers, union members and employers in the workplace. Generally, labour law covers:

- Industrial relations-certification of unions, labour?management relations, collective bargaining and unfair labour practices;
- Workplace health and safety;
- Employment standards, including general holidays, annual leave, working hours, unfair dismissals, minimum wage, layoff procedures and severance pay. History of labour law concerns the development of labour law as a way of regulating and improving the life of people at work.

Development of Labour laws in British-India: The labour movement has been an instrumental in the enacting of laws protecting labour rights in the 19th and 20th centuries. The history of labour legislation in British-India can be traced back to the history of British colonialism. The British destroyed the ancient industries of India, which were village centric. This led to the downfall of self-sufficient rural economy of the country. The influences of British political economy were naturally dominant in sketching some of these early laws. In the beginning it was difficult to get enough regular Indian workers to run British establishments and hence laws for chartering workers became necessary. However in India in the 19th century at least 80% of the population was working class. In order to be considered middle class had at least one servant. Most servants were female. (Male servants were much more expensive). Throughout the 19th century 'service' was a major employer of women. Labour rights have been integral to the social and economic development since the industrial revolution.

In the beginning aperennial factory workers worked day-night hours, i.e., eleven and a half hours a day or eighty and a half hours a week in the cold weather and fourteen hours a day or ninety-eight hours a week in hot weather. Later, from 1887, when electric light was introduced in the factories, the daily hours of work were extended even further and ranged from twelve and a half to sixteen in different localities. Bombay was the pioneer in the formulation of legislation on labour.
Considering all these the first labour related law was introduced in 1802 termed as The Health and Morals of Apprentices Act 1802 which addressed the health and welfare of children employed in cotton mills.

Second labour related law titled as The Cotton Mills and Factories Act, 1819 was introduced in 1819 where stated that no children under 9 years was to be employed and that children aged 9-12 years was limited to 12 hours work per day. It applied to the cotton industry only, but covered all children, whether apprentices or not.

In 1829, Parliament passed an act to amend the laws relating to the employment of Children in Cotton Mills & Manufactures which relaxed formal requirements for the service of legal documents on mill-owners.

Cotton Mills Act 1831 was promulgated in 1831 where night working was forbidden for anyone under 21 and if in a mill any workers had been working at night the onus of

proof was on the mill-owner (to show nobody under-age had been employed).
The 'Ten Hour Bill' 1832 promulgated for introducing 10 hours working day for children. Sadler's Bill 1832 introduced to ban on night-work up to 21 years; no child under nine was to be employed; and the working day for under-eighteens was to be no more than ten hours (eight on Saturday). These restrictions were to apply across all textile industries. Ashley's Bill 1833 also tried to introduce ten hours working period for child workers.
In 1844 Graham introduced a bill to bring in a new Factory Act, 1844 and repeal the 1833 Factory Act in which again set a twelve-hour day. Three years later another factory act was introduced in 1887 which was called Factory Act, 1847,which law limited the work week in textile mills (and other textile industries except lace and silk production) for women and children under 18 years of age.
Factories Act 1850 was introduced where main features were-

- Women and young persons could only work from 6 a.m. to 6 p.m. or in winter and subject to approval by a Factory Inspector 7 a.m. to 7 p.m.; since they were to be allowed 90 minutes total break during the day, the maximum hours worked per day increased to 10.5.
- All work end on Saturday at 2 p.m.
- The work week was extended from 58 hours to 60 hours.

In 1856 a new Factories Act was promulgated introducing mill gearing needed secure fencing only of those parts with which women, young persons, and children were liable to come in contact.
In 1867 the Factories Act was extended to all establishments employing 50 or more workers by another Factories Act Extension Act 1867.
Later on, The Factory and Workshop Acts 1870 was promulgated in 1870and amended in 1871, 1878, 1891, 1895 and 1901(Minimum working hour raised to 12 years). New features included in the amended in 1878 were-

- Factory Code applied to all trades;
- No child anywhere under the age of 10 was to be employed;
- Compulsory education for children up to 10 years old;
- 10-14 years old child could only be employed for half day;
- Women were to work no more than 56 hours per week.

With the objective of providing England a "protected and bonded labour market" two important industrial relations legislations, Employers and Workmen Dispute Act, 1860 (making breach of contract by workers punishable, with no provision for employer breaches) and Indian Factories Act, 1881 (applicable to premises using mechanical power, employing 100 or more workers and it also prohibited employment of children between 7 to 12 years of age for more than 9 hours a day) were introduced. As per recommendation of the Commission appointed in 1875 first Factory Act was 1881 promulgated. This Act death primarily with the problem of child labour (between 7 and 12 years of age). Its significant provisions were:

1. Employment of children under 7 years of age prohibited.
2. Working hours restricted to 9 hours per day for children.
3. Children to get four holidays in a month.
4. Hazardous machinery to be properly fenced off.

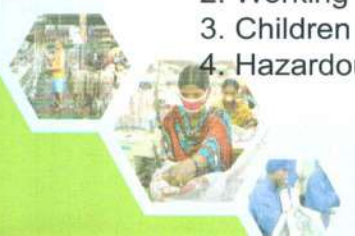

In order to make India labour costlier, the Factories Act 1881 was amended in 1883 because of the pressure brought on the British Parliament by the textile moguls of Manchester and Lancashire. Thus received eight hours of work, the abolition of child labour, and the restriction of women in night employment, and the introduction of overtime wages for work beyond eight hours. While the impact of this measure was clearly for the welfare of the labour force the real motivation was undoubtedly the protection of their vested interests. In 1886 May Day demonstration in Chicago showed to the workers of the entire world the need to join hands in the struggle against capitalism.

The Cotton and Cloth and Factories Act 1889 were introduced in 1889.
Factories Act 1881 amended several times; such as in 1883, 1891 and 1934 under the heading conditions of employment where tow considerable addition to previous legislation were included; the first was the prohibition on employers to employ women within four weeks after confinement (Childbirth); the second was the raising the minimum age at which a child can be set work from ten to eleven.

In British-India there were number of labour laws which were applicable in different sectors and also those were existed in many trade unions. In 1923 Workman Compensation Act andMines Act 1923 were passed, it was the most important measure of the socio-economic justice. The Indian Trade Union Act was passed in 1926 and after a span of three years, Trade Disputes Act, 1929 was also passed. The Trade Union Act allowed the workers to associate and to be represented by unions. The Trade Disputes Act provided for the prevention and settlement of disputes between employers and employees. On July 4, 1929 the Imperial Government of Britain constituted the Royal Commission on Labour in India with the express mandate to enquire into and report on the existing conditions of labour in industrial undertakings and plantations in British India. Recommendations under the Commission led directly to most of the legislation being passed from 1931 onwards.

Payments of Wages Act 1936, Dock Labor Act 1934 and The Essential Services Maintenance Ordinance 1941 were promulgated in the wake of Second World War. Before the Government of India Act, 1935 came into force; legislative powers in the field of labour were held jointly by the central and provincial governments. The Bombay Industrial Disputes Act, 1938 was the first to provide for permanent machinery in the shape of an industrial court for the settlement of disputes. This Act was later replaced by still more comprehensive legislation known as the Bombay Industrial Relations Act, 1946. In 1943 appointed a Labour Investigation Committee known as Rage Committee to examine the exiting labour legislation and make necessary recommendations. The committee in its report 1946 pointed out some anomalies in respect of enforcement of labour legislations, the slow and delayed implementation of the recommendations of the Royal Commission in respect of labour legislation, varying standards of inspection with miserably small inspectorates and absence of social security legislation etc.

Another labour related law termed as Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 was introduced in 1946.The Bombay Industrial Disputes Act was amended many times i.e. 1946, 1949 etc. In December 1947, an industrial conference was held. Under

it Industrial Truce Resolution was adopted. The Resolution called upon labour and management to maintain industrial peace and avoid strikes, lock-outs and slowing down of production for a period of three years. As an additional measure to solve the disputes between the employers and workers, the tripartite and bipartite machinery of the labour conference played its part. Industrial Disputes Act, 1947, was passed and implemented.

Development of labour laws in Pakistan period: After independence, Pakistan inherited the following legislations, among many others, from the British India: Trade Union Act 1926,Factories Act 1934, Industrial Employment (Standing orders) Act 1946 andIndustrial Disputes Act 1947. These four laws provided the basis for labor laws and policy making in the country.

Trade Union (Amendment) Ordinance 1960, containing provisions of earlier Act, was promulgated in 1960 and it established the principle of compulsory recognition of trade unions by employers and also included the unfair labor practices, both on the part of Employers and Employees. The Industrial Disputes Act 1947 was replaced with Industrial Disputes Ordinance 1959 by a military ruler Ayub Khan. The legislation withdrew the right of strike in an indirect manner. During Yahya Khan Regime labour legislation was rewritten and promulgated as Factories Act 1965 with emphasis on two points: the trade union movement should remain factory/plant based and delinked from the party politics. Apart from this Pakistan Government promulgated a number of labour related laws; these were The Employment (Records of Service) Act, 1951;The Plantation Employees Provident Fund Ordinance, 1959; The Coal Mines (Fixation of Rates of Wages) Ordinance,1960;The Road Transport Workers Ordinance , 1961; The Minimum Wages Ordinance ,1961; The Plantation Labour Ordinance ,1962; The Apprenticeship Ordinance,1962;The Shops And Establishment Act, 1965; The Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965; The Company's Profits (Workers Participation) Act, 1968; The Industrial Relations Ordinance, 1969.

Development of labour laws in Bangladesh: Immediately after independence in 1971, Bangladesh adopted labour laws and policies that prevailed during colonial era and the Pakistani period. However, the new government of Bangladesh declared a labour policy in 1972, which recommended reduction of trade union activities in welfare organizations. The military regime of 1975 imposed restrictions on the rights of collective bargaining and striking through Industrial Relations (Regulation) Ordinance, 1975. The Industrial Relations (Amendment) Ordinance, 1977 liberalized the Rights of Freedom of Association to some extent. Another improvement took place through adoption of the Labour Policy of 1980, which restored the right to freedom of association to a considerable extent. The situation worsened again with the imposition of martial law in 1982 when the military regime proclaimed the Industrial Relations (Regulation) Ordinance 1982 by which the government suspended trade union activities, strikes, and right of freedom of association. The scenario improved in 1990 with the fall of the military regime and full trade union activities were restored by the democratic government in 1991.

Until 2006, there were more or less thirty separate laws which related to labour issues in the country. To simplify the labour laws and make a comprehensive single labour

code, the Government formed a commission namely the Labour Law Commission, 1992 with members from employers and workers, as well as Government representatives and legal experts. Based on the Draft Labour Law submitted by the commission on 31st March, 1994 and followed by long discussions with the Employers and Workers, Government of Bangladesh passed the Bangladesh Labour Act, 2006 on the 11th October, 2006 repealing the existing 25 laws of the country:

Sl. No	Name of the Law
1.	The Workmen's Compensation Act, 1923
2.	The Children (Pleading of Labour) Act, 1933
3.	The Workmen's Protection Act, 1934
4.	The Dock labourers Act, 1934
5.	The Payment of Wages Act, 1936
6.	The Employer's Liability Act, 1938
7.	The Employment of Children Act, 1938
8.	The Maternity Benefit Act,1939
9.	The Mires Maternity Benefit Act,1941
10.	The Motor Vehicles (Drivers) Ordinance,1942
11.	The Maternity Benefit (Tea Estate) Act, 1950
12.	The Employment (Records of Service) Act, 1951
13.	The Plantation Employees Provident Fund Ordinance, 1959
14.	The Coal Mines (Fixation of Rates of Wages) Ordinance,1960
15.	The Road Transport Workers Ordinance , 1961
16.	The Minimum Wages Ordinance ,1961
17.	The Plantation Labour Ordinance ,1962
18.	The Apprenticeship ordinance,1962
19.	The Factories Act, 1965
20.	The Shops And Establishment Act, 1965
21.	The Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965
22.	The Company's Profits (Workers Participation) Act, 1968
23.	The Industrial Relations Ordinance, 1969
24.	The Newspaper Employees (Condition of Service) Act, 1974
25.	The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1980

CONCLUSION: Labour laws have been changing from pre Vedic period to post Vedic period, Hindu kingdoms period, Muslim kingdoms period, British-India period, Pakistan period and then in independent Bangladesh period and it will be happening in future. In the previous periods due to the powers of the kings the conditions were not tolerable but in independent Bangladesh due to the Political Commitment of the governments, present need of the country, international influence and the influence of the UNO and ILO, with their various Conventions, Recommendations and Covenants passed, the condition of the Bangladesh labour law has under gone a great change. It is well accepted that survival of workers depends upon survival of industry. Therefore, creation of conditions and environment favorable not only for survival but further growth of industry is needed for development of the country.

শ্রমিক আন্দোলনের সোনালী যুগ ও মহান মে দিবস

আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ
সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ

১৮৮৬ সালের ১ মে Michigan Avenue থেকে শ্রমিকরা যেসকল দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল আমরা তাদের উত্তরসূরী হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের সোনালী যুগে অবস্থান করছি। McCormick Harvesting Machine Company এর যে শ্রমিকরা শিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বরে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন আমরা তাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকল ভাঙতে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দাবীসমূহ স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন এবং ১৯৭১ সালে তদানিন্তন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে ঘোষণা করেছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধু তারই ধারাবাহিকতায় সেই মুক্তির সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিকসহ সকল পেশাজীবীদের সম্পৃক্ত করেন। তাঁর সুদক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগণ বাঙালি জাতির বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের পথ সুগম করেন এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর তৎকালীন ৭টি কোর কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তাই তিনি উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্থপ থেকে তুলে এনে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করেছিলেন। তিনি এদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা বিরোধীচক্রর জাতির পিতার সে স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু'র শিশু সন্তান শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতির আশা আকাঙ্খা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ইতোমধ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংশোধন করে আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ২০১৩ সালে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করেছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরপর দুইটি পে-স্কেল প্রদান করে তাদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর করেছেন। দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের কাজ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ৩৮টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বোর্ড মজুরী ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করেছেন। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সরাসরি কৃষকদের সার-ডিজেল-বীজে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং প্রবাসে গমন ইচ্ছুক শ্রমিকদের অধিক আয়ের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর জন্য ইতোমধ্যে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

যেসকল সেক্টরে বিদেশে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে সেসকল সেক্টরে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য ট্রেড কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার জন্য প্রতিটি জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিটি উপজেলা ও থানা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বার্গেনিং এজেন্ট হয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ১৬৬২.৫০ থেকে ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অন লাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ করেছেন, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করেছেন এবং প্রায় ৪৫০ দক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ দিয়েছেন। শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন এবং বর্তমানে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ফাউন্ডেশনে শ্রমিকদের কল্যাণে জমা রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। ইতোমধ্যে সমুদ্রগামী নাবিক ও আভ্যন্তরী নৌ শ্রমিকদের জন্য নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করেছেন। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপরে টেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করেছেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যাক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করেছেন।

বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির ৮০% রয়েছে অসংগঠিত সেক্টরে। এই সেক্টরে রয়েছে গার্মেন্টস, দর্জি, রিকসা, ভ্যান, সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহণ, নির্মান, হকার্স, কুলি, ট্যানারী, গৃহ শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিক যারা সরকারের বেশির ভাগ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প আমাদের দেশে একটি বিকাশমান শিল্প। এ শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। বাংলাদেশের শ্রমিক সেক্টরের মধ্যে সব থেকে বেশি নারী শ্রমিক কাজ করে কৃষি, গার্মেন্টস ও গৃহ কাজে। এ নারী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত। এদের ভাগ্যের উন্নয়নে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও মালিকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প মালিকদের অনুধাবন করতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য করতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রমমান (ILS) নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও একটি সুস্থ্য সবল শিল্প সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শোভন কাজ, বাঁচার মত মজুরি, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত।

জ্বালাও-পোড়াও, নৈরাজ্য-ভাংচুরের সাথে শ্রমিক আন্দোলনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারেনা। শ্রমিকদের গঠনমূলক, দায়িত্বশীল, আপোষহীন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী আদায়ের প্রশ্নে আপোষহীন ও জাতীয় শিল্প রায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। আলোচনা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত, নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ পথ হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা। অর্থাৎ আই,এল,ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের দ্রুত ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত হতে হবে।

সাম্প্রতিককালের গার্মেন্টস সেক্টরে কয়েকটি ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ শিল্পের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। বেশকিছু ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনায় অসংখ্য শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়স্পর্শী। গার্মেন্টস শিল্পকে আরো উৎপাদনমুখী করতে কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সহঅবস্থানে থেকে আরো সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে কোন মিল-কলকারখানা বন্ধ রাখা যাবে না এবং কোন বেআইনী ধর্মঘটে যাতে শ্রমিকরা সম্পৃক্ত না হয়, সেজন্য আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

সরকারি-আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসংখ্যা প্রাপ্তির মাঝেও অসংগঠিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের প্রাপ্তিতে কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। মহান মে দিবস ২০১৭ এর পাদমূলে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আবেদন, অসংগঠিত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গার্মেন্টস, নির্মান, রিকসা-ভ্যান, সড়ক পরিবহন, নৌ-পরিবহন, দর্জি, কুলি, নৌকা মাঝি, গৃহ শ্রমিক, দোকান-পাট, হকার্স সেক্টরে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য বীমার সুবিধা প্রদান, দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, কর্মক্ষম এবং বার্ধক্যকালীন শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাতার ব্যবস্থা চালু করাসহ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। দেশবিরোধী যেকোন ষড়যন্ত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিহত করতে বাংলার শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় শ্রমিক লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ আছি, থাকব– এ হোক মহান মে দিবসের অঙ্গিকার।

দুনিয়ার মজদুর এক হও
জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু

“শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ”

পহেলা মে ঃ বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন শেখ হাসিনা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক লীগ

পহেলা মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য গৌরবের দিন। সেই ১৮৮৬ সালের পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বিজয় অর্জন করেছিল তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর সারা বিশ্বে পহেলা মে– মহান মে দিবস পালিত হয়ে আসছে।

দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর আমলে মে দিবস পালনের কোন রেওয়াজ ছিলনা। রক্তঝরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভুদ্বয়ের পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পহেলা মে- মে দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন শুরু করেন। সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ১ মে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। কারণ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারাটি জীবন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে– শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। তাই তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন– 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত– একদিকে শোষক, আরেক দিকে শোষিত; আমি শোষিতের পক্ষে'।

শুধু তাই নয়, তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পরিত্যাক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। এদেশের শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে প্রচলন করেন অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করতে না করতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীদের মদদে তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্থ করা হয়। দেশে জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী রাজনৈতিক অপশক্তি, বিএনপি-জামায়াত ও স্বৈরাচারখ্যাত এরশাদশাহী। দেশের অর্থনীতিতে দেখা দেয় মন্দাভাব। কাগজী উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে একের পর এক কলকারখানা। গোল্ডেন হ্যান্ড শেকের মাধ্যমে বেকারত্বের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত করা হয় শ্রমিক শ্রেণিকে।

জাতির পিতার আদর্শ অনুকরণ করে তারই কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহৎ ঐতিহ্যকে সব সময় সমুন্নত রেখেছেন। ঠিক তেমনি তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এক মুহুর্তের জন্যও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার কথা বিস্মৃত হননি। তিনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানাগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করে বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করছেন। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং তাদের রেমিটেন্স দেশে পাঠাবার পথ সহজ ও সুগম করেছেন। পোষাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্পখাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ যুগোপযোগি ও আধুনিক করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ (সংশোধনকরা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা- ২০১৫ প্রণয়ন করেছেন জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার। শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি- ২০১০ প্রণয়ন করেছেন। নারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কৃষি শ্রমিক তথা ভূমিহীনদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, মাত্র ১০/- টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, শ্রমজীবী ও গরিব দুঃখী

মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করতে সোস্যাল সেফটি নেট ওয়ার্ক জোরদার করা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি অব্যাহত রাখা, গরিব মানুষের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে সোলার বিদ্যুৎ ল্যাম্প সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সরকারি হাসপাতালগুলোয় বিনা খরচে চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প- ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিদিন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এখন বিশ্ব উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন চিন্তা ও গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাঁর প্রণীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করতে শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক যেমন আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহার। সেই সাথে সমৃদ্ধ শক্তিশালী অর্থনীতি গড়তে শিল্পোদ্যোক্তা মালিক ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রয়াসও খুব জরুরী। আর মহান মে দিবসের সাথে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মে দিবসের তাৎপর্য এখনো বিশ্বে সমানভাবে প্রয়োজন।

মহান মে দিবস ২০১৭ এর পাদমূলে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আবেদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে জাতীয় নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করা। Informal সেক্টরে কর্মরত কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ, রিক্সা-ভ্যান, পরিবহন, দর্জি, কুলি, নৌকা মাঝি, গৃহ শ্রমিক, হকার্স, দোকান-পাট শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তিকল্পে কল্যাণ তহবিল গঠন, বীমার সুবিধা প্রদান ও দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ কর্মক্ষম এবং বার্ধক্যকালীন শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা চালু করা হলে ২০৪১ সালের পূর্বেই আমারা উন্নত বিশ্বের স্বাদ পাবো বলে মনে করি।

তবে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শি নেতৃত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগ আজ আরো সুসংগঠিত ও বিস্তৃত। অসংগঠিত সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা, শ্রমিকদের শোভন কাজ ও তাদের প্রতি শোভন আচরণ, শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক ভিত্তি আরো সুসংহত করা, আউট সোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ প্রদান এবং শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের যে কোন যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে সর্বদাই সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন। বাংলার শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি রয়েছে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। আসুন, মে দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক-মালিক ঐক্যবদ্ধভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
দুনিয়ার মজদুর এক হও

**"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"**

মে দিবস ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মহান মে দিবস, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার ও দাবী আদায়ের এক গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। শতাব্দীকাল আগে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে বিজয় হয়েছিল তার মাধ্যমেই ৮ ঘন্টা শ্রম, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ ঘন্টা বিনোদন ও শোভন কর্মসহ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জন করেছিল। তাই মে দিবস আসলে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আরো উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের মতো দেশসমূহে অধিকাংশ শ্রমিকরা উক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত।

মে দিবসের উৎপত্তি মূলতঃ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য। মে দিবস শ্রমিক-মালিক তথা রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশে উৎপাদনশীলতার প্লাটফর্ম। মে দিবস উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের ইতিহাসে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ এখনো এ দিবসে তার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন করে আসছে। এখনো আমাদের দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ এর প্রেসক্রিপশনে বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে দেশের বৃহৎ কলকারখানাগুলো আজ বন্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজী জুট মিল, এশিয়ার বৃহত্তম পেপার মিল খুলনা নিজউপ্রিন্ট মিলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বড় বড় শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিক আজও বাঁচার মতো মজুরি, আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদানসহ অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকেও বঞ্চিত। দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা অনেকটা দিশেহারা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও শ্রমিক-কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে আইনগত বাঁধা না থাকলেও ছলে, বলে, কৌশলে শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার যথাযথভাবে দেয়া হচ্ছে না। কথায় কথায় ছাটাই নির্যাতন চলছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন দমন করতে হামলা নির্যাতনের পাশাপাশি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা অথবা হয়রানি বা চাকুরীচ্যুত করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের শিল্প, অনেক কারখানার মালিক হচ্ছে নব্যধনী। বেশির ভাগই শিল্প মালিক হয়েছেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক আনুকূল্যে। এরা সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন, শ্রমিকদের তারা অনেকটা গৃহ ভৃত্যের মতো অথবা শ্রমদাসের মতো বিবেচনা করে অর্থাৎ তারা সমাজদরদী আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় তারা ট্রেড ইউনিয়নকে সহ্য করতে পারে না।

আমাদের দেশের সিংহভাগ শ্রমিক যেমন নির্মাণ, চাতাল, পরিবহণ ও গার্মেন্টসসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করছে। এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক, অসংগঠিত শ্রমিকদের দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করানো হয়। তাদের কোন নিয়োগপত্র দেয়া হয়না, ছুটির বিধান নেই, সমকাজে সমমজুরি সেখানে দেয়া হয় না। শহর-উপশহরগুলোতে বাড়ি ভাড়া দফায় দফায় বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের আয়ের একটি বড় অংশ বাড়ি ভাড়া বাবদ পরিশাধ করতে হয়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানীর মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক-কর্মচারীরা আরো বিপাকে। প্রয়োজনীয় ক্যালরী ও পুষ্টির অভাবে ন্যূনতম মানসম্মত খাবার খেতে না পারায় শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন রোগ ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এ প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা তার অর্জিত অধকার রক্ষা এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে গঠিত ফ্যাসিষ্ট সরকাররে ভ্রান্ত নীতির ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ও শিল্প পরিস্থিতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিল্প বিকাশের পরিবর্তে দেশ ক্রমশঃ বিশিল্পায়ন হচ্ছে। ফরমাল সেক্টরের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইনফরমাল সেক্টর।

আইএলও স্বীকৃত ৮৭ ও ৯৮ ধারা কনভেনশন যা সরকার অনুসমর্থন করেছে, সে আইন অনুযায়ী সংগঠন করতে চাইলে মালিকদের প্রভাবে প্রশাসনের একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেয়া হয়না। মালিকরাই মূলতঃ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অথচ ইতিহাস বলে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের জন্যই শিল্প ও কৃষি বিপ্লব হয়েছে। এ শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন সৃষ্টির নির্মাতা হিসাবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমাদের দেশের লুটেরা ধনীকরা কোনভাবেই বুঝতে চায় না। এটাই হচ্ছে মালিক গোষ্ঠীর দৈন্যতা।

মানুষের বিকল্প রোবট তৈরি করতে হলেও শ্রমিকদের দুইটি হাতের প্রয়োজন। তাই শ্রমিকদের প্রতি অনাস্থা নয় বরং আস্থায় নিয়েই শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব। আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিকরা কাজে দক্ষ এবং মেধার দিক থেকে অতুলনীয়। শ্রমিকরা জানে একটি শিল্প-কারখানার সঙ্গে মানুষের রুটি রুজির সম্পর্ক এক এবং অভিন্ন। তাই কল-কারখানার ক্ষতি কোনভাবেই শ্রমিকরা চায় না। ট্যানারী শিল্পসহ যেখানে দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেখান সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত।

স্বাভাবিক পথে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিলে যে মালিকদের সুবিধা এ বোধটা এখনো অনেক মালিকের আসেনি। দেশের নব্য ধনীকরা এখনো ভাল শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। দুঃখজনক হচ্ছে এদের পাশে কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর আমলা ও শিল্প প্রশাসনের মানুষ।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের দেশের শিল্প মালিকদের মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। যার কারণে তারা কোনভাবেই শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানতে রাজী নয়। আমাদের দেশে এক ধরনের লুটেরা মালিক রয়েছেন যারা জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরিবর্তে যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনে বেশী ব্যস্ত থাকে। অথচ জাতির প্রত্যাশা একজন দেশপ্রেমিক শিল্প উদ্যোক্তা অবশ্যই শিল্প, শ্রমিক এবং দেশের স্বার্থ দেখবে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প মালিক এ তিনটির একটি কথাও কখনো ভাবে না, তারা ভাবে কিভাবে তারা তাদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলবে। তাই আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে বিদেশী পণ্যের বাজার। পাশাপাশি এটাও প্রতীয়মান হচ্ছে দেশে সুষ্ঠু ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে এক ধরনের দলবাজী ট্রেড ইউনিয়ন। এরা সবসময় মালিক বা সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। এরা শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত বন্ধু নয়। সাধারণ শ্রমিক ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কোন সময় শিল্প বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। তাই শ্রমিক কর্মচারী তথা ট্রেড ইউনিয়নের উপর দোষ চাপিয়ে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রতিনিধিত্বমূলক এবং দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কোন সময় শিল্প বিকাশে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেনা। কারণ তারা জানে এ শিল্পের উপর শ্রমিক বা তার পরিবার পরিজনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

মে দিবস এলে দিনটি পালনে আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং চেতনা দেখা যায় তাতে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠি। তবে মনে রাখতে হবে বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের যে অবস্থা তা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে দলমত চিন্তা চেতনার উর্ধ্বে উঠে সব শ্রমিক সংগঠনকে একতাবদ্ধ হওয়া।

আমাদের দেশের অর্থনীতি, জাতীয় শিল্প এবং শ্রমশক্তিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমাদের দেশে যে শ্রমশক্তি ও সম্পদ রয়েছে সেটা পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। যে উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা হবে সে উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষ তার সর্বস্ব দিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত, বিনিময়ে শ্রমিকরা চায় তার ন্যায্য মজুরি, যার মাধ্যমে একজন শ্রমিক তার পরিবার পরিজন নিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে। শ্রমিকরা তাদের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও অধিকার প্রদানের মাধ্যমে শিল্প বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই জাতীয় অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে এবং বিশ্বের মাঝে বাংলাদেশ একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শ্রমিক

মোঃ শাহজাহান মিয়া
যুগ্মসচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। উন্নত দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দেশ ও সরকারের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিল্প ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণসহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-2021 এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১-এ উন্নত দেশ গড়ার পিছনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তথা শ্রমজীবী মানুষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগিকরণ, ন্যূনতম মজুরি পুণঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে শুধু পোশাক শিল্পে ৪০ লাখেরও বেশী শ্রমিক কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে আবার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। শ্রমবাজারে নারীর অধিক অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকারের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যেকোন ধরণের বৈষম্য দূরীকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নারী ও পুরুষে সমতা অর্জন করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী নারী শ্রমিকের অবদান বাড়ছে। নব্বই দশকের প্রথম দিকে ১৭৯ জন নারী শ্রমিক বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট এ্যন্ড ট্রেনিং (বিএমইটি) এর সর্বশেষ প্রতেবেদন অনুযায়ী, ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ২৬ বছরে বিদেশে গেছেন সাড়ে পাঁচ লাখ নারী শ্রমিক। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গত ৪০ বছরে এদেশে রেমিটেন্স এসেছে প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ছে। অন্যদিকে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার (রিজার্ভ) সঞ্চায়ণও বাড়ছে। গত কয়েক বছরে পুরুষের তুলনায় নারী অভিবাসীদের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নারী অভিবাসীরা সাধারণত হাউসকিপার (গৃহকর্মী), গামেন্টস, বেবি সেন্টার, কেয়ার গিভার, ডে-কেয়ার কর্মী, নার্স ও বিউটিশিয়ান পেশায় বিদেশে যাচ্ছে।

দক্ষ কর্মী হিসেবে নারী শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানো গেলে তাদের আয় আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে প্রায় ৯৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। এদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নারীদের সরকারিভাবে বিদেশে যাওয়ার খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে; সরকার বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে অনেক বেশি আন্তরিক।

তৈরি পোশাক শিল্প বা আরএমজি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পোশাক শিল্পের কোন বিকল্প নেই। দেশের তৈরি পোশাকশিল্প রপ্তানি বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা সমাধান, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের অবদান উৎসাহজনক। বাংলাদেশের নারীদের হাতের তৈরি পোশাক গত বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলোয়াড়দের পরণে ছিল। যা আমাদের গর্বের বিষয় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নানাবিধ কর্মসূচীর কারণে এ খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০ সালে। দেশে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ঢাকার উর্দুরোডে যার নাম রিয়াজ গার্মেন্টস। ১৯৬৭ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস এর উৎপাদিত ১০,০০০ পিস শার্ট বাংলাদেশ হতে সর্বপ্রথম বিদেশে (ইংল্যান্ডে) রপ্তানি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮১-৮২ সালে ০.১ বিলিয়ন ডলার রেডিমেড গার্মেন্টস রপ্তানি করে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পদচারণা আরম্ভ হয়। মাত্র ১০ বৎসরের ব্যবধানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালে ১৪৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের ফলে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি কোটা অনুযায়ী তৈরি পোশাক রপ্তানির জট খুলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সর্বমোট পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৯,০৮৯.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে তা ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৫১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫,০০০ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রয়েছে। সেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। আর এ উন্নতির পিছনে নারী শ্রমিকদের ভূমিকাই বেশী।

বাংলাদেশে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক তৈরি পোশাক শিল্পের উপর নানা সময়ে এসেছে ছোটবড় অসংখ্য আঘাত। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ নানা সংকট গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ট্রাজেডিতে নিভে যায় প্রায় ১১৩৭টি তাজা প্রাণ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এ তৈরি পোশাক শিল্পে সামাজিক বিপর্যয় মোকাবেলা সরকারের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সরকারের যুগোপযোগি সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঘুরে দাঁড়ায় এ খাত। গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সংস্কার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ এ সেক্টরে উত্তরোত্তর উন্নতি, মজুরি বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের যুগোপযোগি সংশোধনীসহ নানাবিধ অভূতপূর্ব পদক্ষেপের বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান বেশী। এতে ৫৩ শতাংশ নারীর অবদান থাকলেও পুরুষের অবদান ৪৭ শতাংশ। গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রমশক্তি যুক্ত হয়েছে। যার প্রায় ৫০ লাখই নারী শ্রমিক। দেশের ১ কোটি ২০ লাখ নারী শ্রমিকের প্রায় ৭৭ শতাংশই গ্রামীণ নারী, যাঁরা মূলত কৃষিকাজ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত । নারী শ্রমশক্তির ৬৮ শতাংশই কৃষি উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত ।

নারী কৃষকদের স্বীকৃতিসহ তাঁদের রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ব্যবস্থার আওতায় আনা, পারিবারিক কৃষি কার্ড প্রবর্তন করা, প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করাসহ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা নারীর কাছে পৌঁছে দেয়া, বাজারে নারীর প্রবেশক্ষমতা বাড়াতে বাজারের নির্দিষ্ট স্থানে আলাদাভাবে নারী কৃষকদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শ্রমিকরা আরো বেশী অবদান রাখতে পারবে।

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৩৪৫ ধারায় নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সম কাজের জন্য সম-মজুরি প্রদানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে এককালীন অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে প্রদান করা হয়।

৩. মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫ (পচিঁশ) হাজার টাকা প্রদান।

৪. জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান।

৫. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ (পচিঁশ) হাজার টাকা প্রদান।

৬. কোন শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান ।

৭. কোন শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ অনধিক ২৫ (পচিঁশ) হাজার টাকা প্রদান।

৮. শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ নিমার্ণ শ্রমিক লীগ, ফুলবাড়ীয়া রাজমিস্ত্রি সমাজ কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশনকে ৫ (পাচঁ) বছর মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩২ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ২১৮ বিধি অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য দ্বিপক্ষীয় মতামতের ভিত্তিতে এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানী মূল্যের শতকরা ০.০৩ (দশমিক শূন্য তিন) ভাগ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমা হবে। জমাকৃত অর্থ থেকে রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

১০. গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" নামে গৃহকর্মীদের জন্য একটি নীতি অনুমোদন করা হয়েছে এবং তা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ নীতিতে গৃহকর্মীদের অধিকার অধিকতর নিশ্চিত করা হয়েছে । এ নীতিমালা গৃহকর্মীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অনুসৃত হবে বলে আশা করা যায়।

১১. শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরের জন্য "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩" ঘোষণা করা হয়েছে।

১২. গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩. উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নর্দার্ন এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভস (NARI) শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০,৮০০ জন নারীকে গার্মেন্টস বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রমিক মুক্তির মহান মে দিবস

ফজলুল হক মন্টু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
কার্যকরী সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

পহেলা মে বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের ছিলনা কোন ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, ছিলনা কোন কাজের নির্দিষ্ট সময় সীমা। মালিকরা তাদের খেয়াল খুশি মতো শ্রমিকদের ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করাতো। কিন্তু বিনিময়ে দিতনা কোন ন্যায্য মজুরি। দীর্ঘ বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে ১৮৭৭ সাল থেকে ন্যায্য মজুরি, আট ঘন্টা কার্যদিবসের দাবীতে শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘট পালন করেন। শ্রমিকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে মালিক পক্ষ পুলিশ লেলিয়ে দেয়। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে প্রায় ৩০০ শ্রমিক নিহত হন।

১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার ঘোষণা করেন দাবী মানা না হলে ১৮৮৬ সালের ১ মে সর্বাত্বক ধর্মঘট পালন করা হবে। অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে ১১ হাজার ৫৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নেন।

৩ মে রিপার কারখানার ধর্মঘট শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ৬ জন শ্রমিক সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং আহত হয় অসংখ্য শ্রমিক। এর প্রতিবাদে ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে আহবান করা হয় বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশেও পুলিশ হামলা চালালে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায়। শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক এবং ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আহত ও গ্রেপ্তার হয় অনেকে।

শ্রমিকদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে শীর্ষ নেতৃত্বস্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রহসনমূলক বিচারে আদালতের রায়ে চার জন শ্রমিক নেতাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু তাতে শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত মালিক পক্ষ শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর রক্তঝরা অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে ১ মে- মে দিবস পালিত হয়ে আসছে।

১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জনের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম ১৯৭২ সালের ১ মে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেন। তিনি পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিএনপি-জামাত জোট আমলে প্রাচ্যের ডান্ডি খ্যাত নারায়নগঞ্জের আদমজী জুট মিলসহ বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রায় ছয় হাজার কলকারখানা পর্যায়ক্রমে চালু করার ব্যবস্থা করে বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করছেন। পোষাক শিল্পসহ সকল শিল্প খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করেছেন।

তিনি ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারি সড়ক পরিবহণ কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করেছেন। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং শ্রম আইন ২০০৬ কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিধানাবলী

অনুসরণ করে দেশের শ্রমিকদের কল্যাণমূখী যুগোপযোগি শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ সংশোধন করেছেন। গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তিনি শ্রমিকদের অবসরের বয়স ৬০ বছরে উন্নীত করেছেন। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহিঃবিশ্বে কর্মসংস্থানের পথ সহজীকরণ ও বহির্গমন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ব্যয় সংকোচন ও ডিজিটালাইজড করে সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠাবার অবৈধ ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল চ্যানেল নিরুৎসাহিত করে এ ব্যবস্থা সহজ ও উদারীকরণ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি করতে তার সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সরাসরি কৃষককে সার-ডিজেল-বীজে ভর্তুকী প্রদান এবং কৃষি শ্রমিক তথা ভূমিহীনদের বিনা জামানতে কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা গরিব দুঃখী মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করতে সোস্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক জোরদার করা, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা অব্যাহত রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী বাস্তবায়নে তিনি সর্বদাই সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবমূখী সর্বাধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ পরিকল্পনামতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প কারখানা। কমছে বেকারত্ব। বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার উন্নয়ন চিন্তা ও গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রণীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক মালিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, এ হোক এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রমবান্ধব রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা

আবদুল মতিন মাষ্টার
সাবেক সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি,
সদস্য, শ্রম আদালত -১, ঢাকা
উপদেষ্টা- BILS.

অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে প্রতি বছরই মে আসে নতুন সব সম্ভাবনা নিয়ে। সম্ভাবনার সূচনা ঘটে একেবারে শুরুতেই, পহেলা মে' র ইতিহাস থেকে। নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিকের বছরটা তাই যেন মে মাসকে ঘিরে আবর্তিত হয়। নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন এক বাংলাদেশ। শ্রমিক বান্ধব রাষ্ট্র, শ্রমবান্ধব রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শ্রমিক বান্ধব সরকার, শ্রমিক বান্ধব সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বপ্নসব প্রতিফলিত হতে হয় এই মে কে ঘিরেই। সময়ের ক্যানভাসে বাংলাদেশ আজ সেই দিনক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সুনিপুণ নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আশার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আরোহন, সেই সাথে প্রথম মেয়াদে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকান্ত প্রচেষ্টা এবং শ্রম আইন ও শ্রম বিধান প্রণয়ন ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য এবারের মে দিবসটিও বাংলাদেশের নিপীড়িত শ্রমিক-জনতার জন্য একটি সুখকর সংবাদ নিঃসন্দেহে এবং এটি খুবই সংগত এই কারণে যে, শতাব্দী উন্নয়ণ লক্ষমাত্রা পেরিয়ে আজ আমরা টেকসই উন্নয়ণ লক্ষমাত্রার দিকে ধাবিত হচ্ছি। রূপকল্প ২০২১' কে সামনে রেখে ২০৪১' এ একটি উন্নত বাংলাদেশ এ শুধুমাত্র শ্রমিকের স্বপ্ন নয়, পুরো জাতি তাই নেতৃত্বের সঠিক নিশানা পেয়ে জননেত্রীর পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

মে-ডে' আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে খ্যাত। দিবসটি মূলতঃ শ্রমিক আন্দোলনের সাথে বিশ্ব মানবতার সংহতি প্রকাশ। পৃথিবীর মানচিত্রে আজ ৮০ টিরও বেশী দেশে ১ মে' রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় ছুটি পালিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সংঘটিত হে-মার্কেট ঘটনার স্মরণে মে দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। হে-মার্কেট ঘটনাটি শুধুমাত্র একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সুদীর্ঘ উনিশ শতাব্দী ধরে ঘটে আসা শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এ দিনটাতে। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে বীর বাঙালীর দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বব্যাপি অধ্যায়টি যেমন পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল ৭১-এ। একইরকমভাবে উনিশ শতকের নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর দাবি আদায়ের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে হে-মার্কেট আন্দোলন।

১৪ ঘন্টার পরিবর্তে ১০ ঘন্টার কর্মদিবসের দাবিতে ১৮২৭ সালে Mechanics' Union of Philadelphia প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলে। নিউইয়র্কের বেকারি শ্রমিকদের এক ধর্মঘট সম্বন্ধে ১৮৩৪ সালের Workingmen's Advocate Report থেকে জানা যায়, "journeymen employed in the loaf bread business have for years been suffering worse than Egyptian bondage. They have had to labor on an average of eighteen to twenty hours out of the twenty-four."

১০ ঘন্টার কর্ম দিবস একটি পরিপূর্ণ আন্দোলনে রূপ নেয় ১৮৩৭ সালে । '৮ ঘন্টা কাজের দাবি' বিশ্বব্যাপি সোচ্চার হয়ে উঠে ১৮৫৬ সালে যখন অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা "8 hours work, 8 hours recreation and 8 hours rest"-এ দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

৩০ এপ্রিল, ১৮৮৬ সাল, রোববার। কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন, আমেরিকা আয়োজন করে এক শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশের যাতে পঁচিশ হাজারেরও বেশী শ্রমিক অংশ নেয়। তাদের অগ্রগণ্য দাবি ছিল ৮ ঘন্টার কর্মদিবস। নিশ্চিত করতে হবে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ ন্যায্য মজুরি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব উদাহরণ তৈরী হয় পরদিন ১ মে ১৮৮৬ তে। দাবি আদায়ের জন্য শিকাগোর শ্রমিক শ্রেণী কর্ম বিরতি পালন করে পরবর্তী দিনগুলোতে যা শ্রমিক আন্দোলনে গভীর রেখাপাত করে। ৩ মে', বুধবার, পুলিশ শিকাগোর মেক' কমিক রিপার কোম্পানিতে দাবি আদায়রত শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে ছয়জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হয় অনেকে।

সংঘটিত এ বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার হে-মার্কেট স্কোয়ারে আয়োজিত এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ আবারো বর্বরোচিতভাবে হামলা চালায়। পুলিশসহ এতে সাতজন শ্রমিক নিহত হয়। আহত হয় অগুনিত। এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়- "The police reacted by firing on the workers, killing dozens of demonstrators and several of their own officers. Initial newspaper reports made no mention of firing by civilians. Reliable witnesses testified that all the pistol flashes came from the center of the street, where the police were standing, and none from the crowd. A telegraph pole at the scene was filled with bullet holes, all coming from the direction of the police." পরবর্তী বছরগুলোতে পুলিশের আন্দোলনকারি অসংখ্য শ্রমিককে গ্রেফতার করে। বিচারের নামে বিভিন্ন প্রহসনের মধ্যিমে অন্তত পক্ষে পাঁচজন শ্রমিককে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ১৮৯১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২য় ইন্টারন্যাশনাল'- কংগ্রেসে মহিমান্বিত শিকাগোর এ ঐতিহাসিক ঘটনাটির স্মরণে ১ মে'-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে বিশ্বব্যাপি দিনটি জাতীয় ছুটিসহ নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মে' কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। পাকিস্তান আমলে মে দিবসের ছুটি ছিল না। ১৯৭২ সালের ২২ শে জুন বাংলাদেশ International Labour Organisation (ILO)' র সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ILO 'র মৌলিক সাতটি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ILO 'র ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ২৫ জুন। বাংলাদেশ আজ অবধি মোট ৩৫টি ILO Recommendation অনুসমর্থন করেছে। কোন প্রকার দাবিনামা পেশ করার পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরি কমিশন ও বেতন কমিশন গঠন করে তাদের মজুরি ও বেতনভাতাদি পরিশোধ করেছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ILO Convention বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মহাজোট সরকার তার মন্ত্রীসভা গঠন করার অব্যাবহতি পরই নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী 'সরকার, শ্রমিক ও মালিক' এই তিনের সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক কমিটি (Tri-partite Consultant Committee) পুনর্গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংস্কারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহন করেছিল। শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় ১৯টি শ্রমিক ফেডারেশন থেকে ২০ জন, মালিক পক্ষ থেকে ২০ জন এবং ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি সদস্য সমন্বয়ে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি (TCC) শ্রমিকদের স্বার্থ ও শিল্প উৎপাদনে নিরলসভাবে কাজ করে। কমিটি শ্রম আইন, শ্রমনীতি ও বিধি এবং শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাসময়ে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে যায়। সরকার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে শ্রমিক পরে ১২ জন, মালিক পক্ষ থেকে ১২ জন এবং ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম আইন সংশোধন কমিটি গঠন করে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনকে Ratify (সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন) করে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বিলটি 'সংশোধিত শ্রম আইন -২০১৩' নামে ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই সংসদে পাশ হয়। এরই মধ্যে TCC - এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১২ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মহান জাতীয় সংসদে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে নতুন শ্রমনীতি পাশ করে এবং 'বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৪' চুড়ান্ত করণের লক্ষে কাজ করে। ১৯৮১ সালের পর সময় ও বাস্তবতা বিবর্জিত হলেও আর কোন নতুন শ্রমনীতি ও বিধি প্রণীত হয়নি। বর্তমান সরকারই এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই মধ্যে আহত-নিহত শ্রমিক কর্মচারীদের সহায়তার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকার পরে সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন' পূণর্গঠন হয়েছে। মহান জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে একটি আইন পাশ হয়েছে যে প্রত্যেক মালিক তার লভ্যাংশের ৫% কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অনুদান দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে 'শ্রমিক-মালিক-সরকার' এ তিনের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়া বর্তমান সরকার চালু রেখেছে।

উল্লেখ্য, মহাজোট সরকারের সময়েই ২০০৯ সালের জুন মাসের ৩ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ILO-র ৯৮তম Central Council -এ বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালিন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি সভাপতিত্ব করেন। সভায় ILO সদস্য ১৮৩ টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি (শ্রমমন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা সম্পন্ন) ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ৭টি দেশের রাষ্ট্রপতি, ৯টি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। দেশের দক্ষিণ বঙ্গে সেসময় প্রলয়ংকারী ঘুর্নিঝড় আইলা'র কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের পাশাপাশি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। ILO -এর সেই সভায় আমাকে বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। ILO-এর সেই সভায় তাই উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সভায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যকার ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায়সম্মত স্বার্থ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়।

শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন প্রকার আন্দোলন বা দাবি-দাওয়া ব্যতিরেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্ব-উদ্যোগে তাঁর সরকার সরকারি কর্মচারিদের জন্য নতুন পে-কমিশন ঘোষনা করেছে যেটি ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। একই সাথে সরকার 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠন করে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করেছে যা উল্লেখিত ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকেই কার্যকর হয়েছে। এছাড়া বর্তমান মহাজোট সরকার বিগত সরকারসমূহের আমলে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করেছে। সরকার এরই মধ্যে কয়েকটি জুট মিলসহ বিভিন্ন বন্ধ শিল্প-কারখানা চালু করেছে এবং পানির দামে যে সমস্ত মালিক এসব সরকারি সম্পত্তি ক্রয় করে বন্ধ রেখেছেন, তাদের ব্যর্থতার কারণে বন্ধ এসব কল-কারখানা সরকারি খাতে ফেরত এনে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রম-বান্ধব বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে অসৎ মালিকদের হাত থেকে শিল্প-কারখানা রক্ষা করতে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে যে সমস্ত শিল্প মালিকরা অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থ নষ্ট করেছেন এবং করছেন, তাদেরকে উপযুক্ত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা সরকারের সুস্পষ্ট বিবেচনায় রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪২টি শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে সরকার ইতোমধ্যে গার্মেন্টসসহ ৩৮টি সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি-মালিকানাধীন অন্যান্য সেক্টর চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্যও ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা সরকারের বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে।

বর্তমান বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ সরকারের একটি অত্যাবশ্যক কর্ম। মজুরি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পাঁচ বছর পরপর পে কমিশন ও মজুরি কমিশন গঠন না করে স্থায়ী পে ও মজুরি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বাজার দর বিবেচনায় উভয় কমিশনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মজুরি ও বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ এবং পূণঃ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিতে হবে। মজুরি নির্ধারণে উভয় কমিশনের সুপারিশ একই সময়ে দাখিল ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

শ্রম আইন' ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরির বয়স সীমা ছিল ৫৭ বছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ মে ২০০৯ সালে শ্রমিকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬০-এ উন্নীত করার ঘোষণা দেন যা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবার ও পোষ্যদের চাকুরির বয়সসীমা পূর্বেকার ৫৭ থেকে ৫৯ ও পরবর্তীতে আরো এক বছর বাড়িয়ে ৬০-এ উন্নীত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষতঃ এ সীমা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে সরকারী চাকুরিতে যোগদানের বয়স সাধারণের জন্য ৩০ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩২ করেছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় সেশন জটসহ নানাবিধ কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সরকারি-বেসরকারি চাকুরি কিংবা বি.সি.এস -এ অংশ গ্রহন করতে পারছে না।

এতে করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। চাকুরির বয়স সীমা তাই ৩৩-এ উন্নীত করা এখন সময়ের দাবি। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ বিষয়ে ২০১২ সালে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ সরকারি চাকুরির পদ শূন্য রয়েছে। চাকুরির বয়স সীমা ৩৩-এ উন্নীত করার মাধ্যমে এ সকল শুন্যপদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব। ২০১২ সালে মে দিবসের এক আলোচনায় এ বিষয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চাকুরির বয়সসীমা ৩৩ করার দাবি জানিয়েছিলাম।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Productivity Committee (NPC) কে আরো সক্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে আসছে। উৎপাদন সম্পৃক্তিতে বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে এ কমিটি একাগ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিদ্যমান ৭ টি শ্রম আদালত পূনর্গঠন করা হয়েছে। সরকারের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে এই শ্রম আদালতগুলো সূচারুভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলছে। শ্রমিক ও মালিকদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এবং বিচার প্রার্থীদের কোর্টে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনে শিল্পঘন এলাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে এ ধরণের আরো আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষতঃ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর,বগুড়া এবং কুমিল্লার মতো শ্রমঘন এলাকায় এবং বিভাগীয় শহর সিলেট, রংপুর ও বরিশালে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিরসনকল্পে সরকার এরই মধ্যে শিল্পঘন এলাকায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বয়ে Crisis Management Committee (CMC) গঠন করেছে। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবীদের জন্য আবাসন (Dormitory), হাসপাতাল, কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সুবিধার্থে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিতে আরো নজরদারি প্রয়োজন। শিল্প-কারখানাগুলোতে যথাযথভাবে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য ETP স্থাপনসহ পরিবেশ সুরার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া চামড়া শিল্প (Tannery), গার্মেন্টস ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল কল-কারখানা শহর থেকে সরিয়ে যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ যথা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও যাতায়াত এবং আবাসনের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প-পার্ক গড়ে তুলতে হবে। হাজারিবাগ ট্যানারি শিল্পকে সাভারে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার এরই মধ্যে নগরীর পরিবেশ সমুন্নত রাখার প্রত্যয় দেখিয়েছে। এছাড়া সরকার শিল্প পুলিশ গঠন করে ইপিজেডসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে শিল্প পুলিশ যেন শিল্প ও উৎপাদন সহায়ক হয়, কখনোই যেন মালিক শ্রেণীর শোষন-নিপীড়নের হাতিয়ার না হতে পারে। শুধুমাত্র ন্যায্য মজুরি (Proper Wage), শোভন কাজ (Decent Work) এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (Trade Union Rights) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প-কারখানায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব।

সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ এবং ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রম বন্ধে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। এমপিও ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ২৩,০০০ রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণসহ মোট ৩৭৬৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় এনেছে। ফলতঃ প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষকের চাকুরি সরকারি হয়েছে। সরকার ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী নিয়োগ করবে পর্যায়ক্রমে যারা সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় আসবেন। সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সরকার এরই মধ্যে সংবাদপত্র শিল্পের জন্য নবম ওয়েজবোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। তাই সকল বিবেচনায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী শ্রমিক-বান্ধব সরকার। ২০১৩ সালের নভেম্বরে সরকার পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে। পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্নয়ন বজায় রাখার স্বার্থে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পোষাক শিল্পের জন্য ৭টি ধাপে নির্ধারিত বেতন কাঠামো (সর্বনিম্ন ১নং গ্রেডে ৫৩০০ টাকা- ৭নং উচ্চ গ্রেডে ১৩৪০০ টাকা বেসিক) ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই কার্যকর করা হয়। তবে পোষাক শিল্পের অধিকতরঃ উন্নয়নের স্বার্থে সরকার গৃহীত অন্যান্য শ্রম আইনগুলোর বাস্তবায়ন অতি প্রয়োজন। এ জন্য শ্রম দপ্তর ও ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টের জনবল বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং শ্রমঘন অঞ্চলে এদের আরো শাখা অফিস খুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা না করে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে শ্রম আইন অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজনে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার বিশ্বাস করে, দেশের শিল্প আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক অগ্রগতি অত্যাবশ্যক। এই শিল্পে আমাদের দেশ গণচীনের পর ২য় অবস্থানে রয়েছে। আমাদের প্রতিযোগি হিসেবে চীনের পরেই রয়েছে ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। তবে আশার কথা, চীন এরই মধ্যে ভারি শিল্পে মনোনিবেশ করায় পোষাক শিল্পের বিদেশী ক্রেতারা ক্রমান্বয়েই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছেন। তাই গার্মেন্টস শিল্পকে ঘিরে যে কোন দেশী-বিদেশী নাশকতামূলক আত্মঘাতি চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের বৃহৎ এ খাতটিতে ৮০ ভাগই নারী। জিএসপি সহ অন্যান্য সুবিধাদি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই বেপজাসহ সকল ইপিজেড -এ এসব অবহেলিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের সুবিধার্থে এসকল শিল্পে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, দুধ, বিস্কিটসহ বিনামূল্যে শিশু খাবার নিশ্চিত করা আবশ্যক। গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা বর্তমান মহাজোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। এ সেক্টরের ক্রম-বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকার এরই মধ্যে কিছু কিছু গার্মেন্টসে এ প্রথা চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে এ সেক্টরের প্রতিটি ফেক্টরিতে রেশনিং প্রথা চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে সকল শিল্প সেক্টরে যথাযথ উৎপাদন ও শ্রমিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে সকল শিল্প-কারখানায় রেশনিং প্রথা চালু করা অতীব আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি কল-কারখানায় ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঞ্চিত-অবহেলিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এ প্রথাকে পূণরুজ্জীবীত করা আজ আমাদের সুমহান দায়িত্ব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল বাংলার মেহনতি-শ্রমিক জনতা আশায় বুক বেঁধে আছে বর্তমান শ্রমিক-বান্ধব মুক্তিযুদ্ধের সরকার এ বিষয়ে আশু সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিবেন।

সরকার শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Technical Training Centre (TTC) গুলোকে বিশেষ সক্রিয় করে তুলেছে। বর্তমানে দেশে মোট ৩৭ টি TTC রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২৬ টি সেন্টারের ১৪টিতে ট্রেড কোর্স চালু রয়েছে। এগুলোকে আরো কার্যকর করে তুলতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, নতুন নতুন কোর্স চালু এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেন্টারগুলোকে আরো সক্রিয় ও কার্যকর করে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদেরকে ইংরেজী, শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর স্থানীয় ভাষা ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারকে বিবেচনায় রেখে আরবী ভাষায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান ও ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন। বর্তমান প্রায় ৮৭ লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। এ সকল শ্রমিকদের স্বার্থে এবং একই সাথে বিদেশ গমনেচ্ছু নতুন শ্রমিকদের সুবিধার্থে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সু-ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে এখন থেকে দালালদের প্রতারণায় জমি-জমা সব হারিয়ে বিদেশগামী কোন শ্রমিকের নিঃস্ব হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হবে আশা করা যায়। শ্রমিকরা যাতে স্বল্প খরচে শুধুমাত্র বিমান ভাড়া দিয়ে বিদেশ যেতে পারে, সরকার সে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। মালয়েশিয়ায় মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশব্যাপী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

মাত্র ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক রপ্তানির জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, এর মাধ্যমে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় আয় রেমিটেন্স আরো বাড়বে। বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশে প্রতিটি বাংলাদেশ মিশনে লেবার সহায়ক ডেস্ক চালু করা এবং নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

গৃহ শ্রমিকদের (Domestic Worker) অধিকার সুনিশ্চিত করতে সরকার ২০১২ সালে ILO General Council-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন প্রণয়ণ করেছে। ILO-এর ধারা ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী Domestic Worker সহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচনের সুযোগ দেয়া সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন। দেশের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য উদীয়মান শিল্পখাত হচ্ছে ঔষধ শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প । ঔষধ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও দূরীভূত করে এ খাতটিকে পোষাক শিল্পের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি সুবিশাল খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার জাহাজ ভাঙ্গা'কে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। তবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক এ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে SENSREC শীর্ষক একটি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সম্পন্ন করেছে।

শোষণমুক্ত সুখি-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। 'ভিশন- ২০২১' এবং ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDGs) অর্জন এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিগণিত করতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যাবশ্যক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরি জননেত্রী শেখ হাসিনা এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে দিবা-রাত্রি কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি শ্রমবান্ধব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন আর নিছক শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ন্যায় এ আজ দিবালোকের মতোই দেদীপ্যমান হতে চলছে ।

জয় বাংলা, জয় হোক বাংলার মেহনতি জনতার।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবসের চেতনায় শিল্পোন্নয়ন,অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধি

মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী
সহ-সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ ও সভাপতি
জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ, বি-১৯০২,সিবিএ
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক মে-দিবস অর্থাৎ ১ মে তারিখ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে জুতার কারখানায় ধর্মঘটি শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবসের ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের ইতিহাস। বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কর্মকাল বা কাজের সময়সীমা। মালিক পক্ষ উপলব্ধি করেছিল দাবীর বাস্তবতা এবং এতদসম্পর্কে নিয়মনীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয় এবং কাজের সময়সীমা সম্পর্কে কনভেনশন গৃহীত হয়। এ কনভেনশন পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অনুসমর্থন লাভ করে এবং কনভেনশনের বিধান মোতাবেক স্ব-স্ব দেশে কাজের সময়সীমা সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়।

শ্রমিকদের বিক্ষোভ বা আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংগঠন স্বীকৃতি পায়, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, দাবী আদায়ের অবকাঠামো গড়ে উঠে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ও মজুরি কমিশন গঠিত হয়, চাকুরির শর্তাবলীর বিধান নির্দিষ্ট হয়, প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায়। এসব শ্রমিক আন্দোলনেরই প্রতিফলন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সুতরাং পূর্বের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। কারণ অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মালিক বা শ্রমিক আলাদা কোন দল বা গোষ্ঠী নয়, এ হচ্ছে সমন্বিত গোষ্ঠী। এ পরিবেশে সমন্বিত গোষ্ঠীর উপর অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কেবল দেশের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও উৎপাদিত পন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, পন্যের গুণগতমান অন্য সব দেশের পণ্যের গুণগতমানের তুলনায় কোনক্রমেই কম না হয় সে সম্পর্কে প্রতিযোগিতা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা আবশ্যক। কারণ, এ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে উৎপাদিত পণ্য কেবল গুদামজাত হয়ে থাকবে। এ বিষয়গুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে। মালিকদেরকে বিশ্বায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এছাড়া প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্ব শ্রম বাজারে আসছে। বর্তমানে বেকার শ্রমিক এর সংখ্যা নগণ্য। বার্ষিক জিডিপি হার ৭.০৫%। মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ ডলার। ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য সময়ের চেয়ে অনেক ভাল। জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এসব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং লাগসই কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ পূর্বের তুলনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন ২০২১ সালের দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নীত হয়ে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলো বাতিল করে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে একটি সমন্বিত আইন জারি হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের শ্রম আইনকে আরও যুগোপযোগি করে ২০১৩ সালে সংশোধনি শ্রম আইন জারী করা হয়েছে। ফলে আইনটি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে ইপিজেড শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সৃষ্টিসহ কতগুলো নতুন বিষয় এ আইনে স্থান পেয়েছে। যেমনঃ চাকরি হতে অবসর গ্রহণ, ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা, কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করা।

এছাড়া বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ জারি হওয়ার ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ সাধনের জন্য বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন এবং এই সচেতনতার বিকাশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং মালিক শ্রমিকদের বিশ্বাসকে অর্থবহ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাস্তবমূখী সর্বজন গৃহীত জাতীয় পে-কমিশন/২০১৫ এর মধ্যদিয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাহলো সংক্ষেপে নিম্ন রূপ ঃ -

১। আর্ন্তজাতিক শ্রম বাজারে বিপুল পরিমাণে জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২। সরকারিভাবে স্বল্প খরচে শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
৩। মজুরি কমিশন গঠন;
৪। বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় শ্রমিকদের দ্বিগুনেরও বেশী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ;
৫। কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমার টাকা ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ;
৬। সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের পেনশনের হার প্রতি টাকায় ২০০ টাকা থেকে ২৩০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে;
৭। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন মূল বেতনের ৮০% থেকে ৯০% এ উন্নীত করা হয়েছে;
৮। অবসরে যাওয়ার সময় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এককালীন ১২ মাসের পরিবর্তে ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৯। সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি;
১০। ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা;
১১। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ ভাতার প্রবর্তন;
১২। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চল তথা মফস্বল সমূহের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড ও ইন্টারনেট সেবা বৃদ্ধি; এবং
১৩। শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মের পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে চলমান সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারনে ২০১৪ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রের হার ১৩% এ নামিয়ে আনা, সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩২০০ মেগাওয়াট হতে ১৫০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরন সহ সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যখন বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে চলেছে, ঠিক সেইসময় অর্জিত সাফল্য বিনষ্ট করার জন্য ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুরা অর্থাৎ বিএনপি-জামাতসহ ২০ দলীয় জোট বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এ ষড়যন্ত্র নসাৎ করতে বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অনেক অংশে সফল এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড কোন অপশক্তি চালাতে না পারে সে ব্যাপারেও সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সে মূহুর্তে বিউবোর্ডকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এক শ্রেনির উচ্চবিলাসী কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সৃষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ভেঙ্গে কোম্পানীতে রূপান্তরের পায়তারা করছে।

ইতোপূর্বে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে যেসকল কোম্পানী করা হয়েছে, সেসকল কোম্পানীগুলি লোকসানে পরিণত হয়েছে। এহেন কর্মকান্ডের কারনে বিদ্যুৎ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে।

মে-দিবসের আদর্শ ও চেতনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শ্রমিকের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন মালিকের দায়িত্ব, তেমনিভাবে মে-দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে শ্রম প্রদান করা শ্রমিকের কর্তব্য।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু ।

“শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ”

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করে গড়ে উঠুক বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতি

মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন (বি-২১৪২)
মহা-সচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের গৌরবময় এক ঐতিহাসিক দিন। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে এ অধিকার আদায়ের গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচিত হয়েছিল। সভ্যতার শুরু থেকেই শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে শোষিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ দু'শতাধিক বছরের ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ শোষিত, বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ পায় ১৮৮৬ সালের ৪ মে। রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় অধিকার আদায়ের পথ, জন্ম হয় মহান মে দিবসের। সেই থেকে দিবসটি ঐতিহাসিক মহান মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। মহাকালের অগ্নিগর্ভে হারিয়ে যায়নি মহান মে দিবসের শ্রমিকদের অবদান, আত্মত্যাগ-আত্মাহুতি। উজ্জীবিত বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ অতি গর্ব ভরে স্মরণ করে সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অকুতোভয় সেসব শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে যাদের রক্তে স্নান করে এক ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত।

মহান মে দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হলেও অধিকারের প্রশ্নে আমাদের দেশের শ্রমিকরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশ আইএলও মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮। ৮৭ কনভেনশনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবাধ সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে এবং পছন্দ মত নেতা নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে পছন্দ মত নেতা নির্বাচন তো দূরের কথা কোন শ্রমিক চাকুরী হারালে বা অবসরে গেলে সেই শ্রমিককে তার অনুসারীরা নেতা মনে করলেও তাকে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতে পারে না। এটা শুধু আইএলও কনভেনশন ৮৭ এর মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী নয় এটা শ্রমিক কর্মচারীর মৌলিক অধিকার পরিপন্থী। এছাড়া আইএলও কনভেনশনে বলা হয়েছে মালিকানা নির্বিশেষে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত হতে পারবে এবং সংগঠন করার অধিকার পাবে। সেখানে আমাদের দেশে কৃষি, গৃহশ্রমিক, সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীসহ একটি বৃহৎ অংশের শ্রমিক কর্মচারীরা সংগঠন করতে পারে না। অন্যদিকে আইএলও কনভেনশন ৯৮ এর ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মালিকরা নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাথে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আছে তা সঠিকভাবে সকল ক্ষেত্রে কার্যকর না হওয়ার কারণে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আস্থা অনাস্থার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়ে বিক্ষোভের রূপ নেয় এবং এ বিক্ষোভ থেকে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। সব যুগে সব সমাজে এটি ছিল। শ্রমিকদের ঘামে মালিকদের প্রাসাদ অট্টালিকা তৈরী হলেও অনেক শ্রমিককে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। দিন-রাত শ্রম দিয়েও জীবনের ন্যূনতম চাহিদা তারা পূরণ করতে পারেন না। অনেক সময় শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়। আজ সময় এসেছে, শ্রমিকদের সকল আইনানুগ দাবী পূরণে মালিকগণকে সর্বোচ্চ আন্তরিক হতে হবে এবং শ্রমিকদেরও কাজের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। তবেই শ্রমিকদের রক্তঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন হবে।

শিল্পোন্নয়নের অংশীদার হিসেবে মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ না হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। একদিকে বিনিয়োগ না হলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না, অন্যদিকে নিষ্ঠার সাথে শ্রম না দিলে শিল্পের

উৎকর্ষ ঘটে না। শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়নের গতিধারা বৃদ্ধি, বেকারত্ব দূর এবং সর্বোপরি বাণিজ্য কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তৃত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক-মালিক সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ ছাড়া গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা আশা করা যায় না। মে দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে আবশ্যক। শিল্প পরিচালনায় মালিক ও শ্রমিকদের সু-সম্পর্ক স্থাপন ব্যতিত শিল্পের বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক ঐক্য এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা। শ্রমিক ও মালিকের যৌথ উদ্যোগই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল, যথাযথ প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মালিক শ্রমিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করে মানসম্মত পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণে আমাদের তৎপর হতে হবে।

শিল্পের বিকাশ ও শ্রম ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারের নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিক মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। পাশাপাশি জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০১৩ (সংশোধনি) প্রণয়ন এবং গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক নিরাপত্তা সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও অধিকারহারা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তার দুই কন্যা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাঙ্গালী জাতির অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, আমার সরকার শ্রমিক বান্ধব সরকার এবং তিনি সর্বদা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ যাতে ভালভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে সঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি কৃষক শ্রমিক তথা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষকে নিয়ে। আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বিভিন্ন খোড়া অজুহাত তুলে বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আইএলও কনভেনশন ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পরিপন্থী।

মে দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমজীবী মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ, যুদ্ধাপরাধীসহ সকল অপশক্তিকে প্রতিহত করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ভিশন-মিশন বাস্তবায়নই হোক এবারের মে দিবসের শপথ।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবসের চেতনা ও অধিকার আদায়ে মেহনতি মানুষের ভূমিকা

শামসুন্নাহার ভূইয়া
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ, মহিলা কমিটি
মহিলা সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি

১ মে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এ ঐতিহাসিক দিনটি দেশে দেশে যেমন আনন্দের, তেমনি বেদনার । এ দিনটি কেবল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিনই নয়, বিশ্বের সকল, শোষিত, নিপীড়িত নর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে সচেতন ও সংগ্রামের দিন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। ১ মের আত্মত্যাগের ইতিহাস অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল।

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে শ্রমিকদের প্রতি শোষন, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ ঘন্টা বিনোদনের দাবীতে শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল। ৩ ও ৪ মে সেই ধর্মঘট চূড়ান্তরূপ লাভ করে। সেই আন্দোলনে শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলি করেছিল পুলিশ । সেই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক আহত হয়েছিল। বহু শ্রমিক নেতাদের জেলে যেতে হয়েছিল। সেই দিন ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে বিচারের নামে প্রহসন করে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ৪জন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিশ্ব নন্দিত অকুতোভয় চিরঞ্জীব শ্রমিক নেতা আলর্বাট, পার্সনস, অগাস্ট স্পাইজ, অ্যাডলফ ফিশার ও জজ এঙ্গেল। আজও সারা বিশ্বের মানুষ তাদের স্বরণ করেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। ১ মের রক্তদানের ইতিহাস আজও মানুষকে আন্দোলনের অনুপ্রাণিত।

বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। শ্রমিকের ছিল না কোন অধিকার, কোন নিয়োগপত্র, সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা, কর্মক্ষেত্রে অত্যাচারিত হয়েছে শ্রমিকেরা। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রাম ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৬৬ সালে স্বাধীকার আন্দোলনে তেজগাঁও এর শ্রমিক নেতা মনুমিয়ার রক্তদান, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে টঙ্গীর শ্রমিক নেতা মোতালের পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রতিরোধ আন্দোলনে জীবন দিতে হয়েছে গাজীপুরের দর্জি শ্রমিক হুরমত খলিফাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন ৩০ লক্ষ মানুষ। ১৯৮৪ সালে ১লা মে আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুলের আত্মদান, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নুর হোসেনের রক্তদান ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

আমি আজ শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করতে চাই শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, তিনি এদেশের শ্রমজীবী মানুষসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অধিকার আদায়ের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন জেল খানার অভ্যন্তরে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির নির্দেশনা পেয়ে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ দেশের শ্রমজীবী মানুষসহ সকল মুক্তি পাগল বীর সৈনিকেরা। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানের সেই বর্বর বাহিনীকে হারিয়ে, সেই মুক্তি সেনারা এদেশের মাটিকে মুক্ত করেছিল। সেই যুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ মুক্তিসেনা শহীদ হয়েছিল। সম্ভ্রম হারিয়েছিল ২ লক্ষ মা বোন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করলেও স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তখনো ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিশালা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঐ দিন বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জনতা ছুটে যান বিমান বন্দরে তাদের প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ILO Convention ৮৭, ৯৮ সহ ৩৩টি Convention অনুমোদন করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, " বিশ্ব আজ দু ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর এক দিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"। তিনি স্বাধীনতার পর পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করে ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এদেশের সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অনেক স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত শক্তিরা বঙ্গবন্ধুকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সময় দেয়নি। মাত্র ৩১/২ বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁর পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য শেখ রাসেলসহ পরিবারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর দেখা স্বপ বাস্তবায়নে এক বুক জ্বালা নিয়ে পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে সমস্ত কারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন বিএনপি জোট সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে একে একে ঐ সমস্ত কারখানা পানির দরে বিক্রি করার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পুনরায় ঐ সমস্ত বন্ধ মিল কারখানা আবার শ্রমিকদের মালিকানায় দিয়ে চালু করেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা ৩য় বারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করেন। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১৫ আইন প্রণয়ন, শিশু শ্রম নিরসন নীতি-২০১০, শিশু শ্রম নিরসনের লক্ষে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১২ এবং গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ সহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

RMG Sector এর ন্যূনতম মজুরি ২০১০ সালে ঘোষিত ১৬৬২.৫০ থেকে ২০১৩ সালে বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা করেন। সরকার শ্রমিকের স্বার্থে বিভিন্ন আইন প্রনয়ন করলেও সকল আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। একদিকে শ্রমিকরা তার অধিকার সম্পর্কে যেমনি সচেতন নয়, পাশাপাশি মালিকেরাও অনেকেই এখনো ট্রেড ইউনিয়নকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননা। আমাদের দেশে RMG একটি বড় রপ্তানী নির্ভর শিল্প। এ শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন, তার মধ্যে ৮০% নারী শ্রমিক। এ সেক্টরের শ্রমিকরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। কিছু কিছু মালিক এই সুযোগ নিয়ে যেমন নিয়োগপত্র, ছুটি, নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা, ওভার টাইমসহ বিভিন্ন সুযোগ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেন।

অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের বাহিরে বিভিন্ন সংস্থাগুলো মূলত ট্রেড ইউনিয়ন কি, কেন প্রয়োজন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না করে যেনতেন প্রকারে শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে ফরম ফিল আপ করে ইউনিয়ন গঠন করার ফলে, ঐ সমস্ত ইউনিয়ন কার্যকর হয়না। তাই শ্রমিক আন্দোলনের গতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন অধিকার সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করে তোলা। প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের দিয়েই ট্রেডইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন হ'ল শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান। ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ট্রেড ইউনিয়ন কোন সময় শিল্প উন্নয়নে অন্তরায় নয়। এ বিষয়টি এপ্রজন্মের মালিকদের উপলব্ধি করতে হবে।

এবারের মে দিবসের চেতনা হোক শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এ অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের সকল ক্ষেত্রে সম অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা, নারীর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণাসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা। সকল নীতি নির্ধারনী কমিটিতে নারীদের সমপৃক্ত করা।

আজ জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আজ প্রয়োজন নবীন ও প্রবীন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশ প্রেমিক শ্রমিক নেতৃত্বের। তাই এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার হোক, মালিক ও শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিকে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্র মুক্ত আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

"আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এবং মহান মে দিবস"

এ্যাডভোকেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান
সাবেক এম. পি.
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন-বিএলএফ

মহান মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতিবছর পহেলা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"-- এই দিনের আন্তর্জাতিক শ্লোগান। ১৮৮৬ সালের এ দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘন্টা কর্মসময় নির্ধারণ এবং ন্যায্যমজুরির দাবিতে শুরু করেন সর্বাত্মক ধর্মঘট। শ্রমিকদের এ-আন্দোলন ৩ ও ৪ মে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, এই দুইদিন শিকাগো নগরীতে ১০ শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। গুলিতে আহত হয় বহু শ্রমিক। বহু শ্রমিককে পাঠানো হয় জেলে। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের ৬ জনকে পরে ফাঁসি দেয়া হয়। একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কারাগারে। শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রামেরই স্মারক এ মে দিবস। একই সঙ্গে তা শ্রমিকদের সংগ্রামের বিজয়োৎসব ও নতুন শপথ গ্রহণের দিন। সকল দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে। ইউরোপ-আমেরিকায় সেকালে শ্রমিকদের প্রথমে উদয়াস্ত ক্রমে শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে কর্মসময় হ্রাস করে খাটানো হতো ১০-১২ ঘন্টা। তবে, তখনও কোথাও কোথাও শ্রমিকদের ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হতো। ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবি শ্রমিকদের অনেক দিনের। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর ৮ ঘন্টার কাজের দাবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এ দাবি আইএলও সনদের অনুমোদন পেয়েছে।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণি উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকদের মতো কাজের পরিবেশও পায় না, তেমন উন্নত সুযোগ-সুবিধাও তারা পায় না। আমাদের শ্রমিকের সামগ্রিক অবস্থা ভাল নয়। ভাল নয় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। অন্যদিকে, বহু শ্রমিক বেকারত্বের শিকার, অনেক শ্রমিকের মজুরি সামান্য। অনেককেই অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত পরিবেশে কাজ করতে হয়। আইএলওর বিধান অনেক স্থানেই পালন করা হয় না। বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায়। আমাদের দেশে এখনও অগুণিত শিশু নানা ধরনের কষ্টকর শ্রমের কাজে নিয়োজিত। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইএলও'র সনদ আজ পর্যন্ত বহু দেশে পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনেক পোশাক শিল্পকারখানায় আট ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানোর এবং ওভারটাইম না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ এ পোশাক শিল্প আমাদের প্রধান একটি রফতানিমুখী শিল্প। এ শিল্পই আমাদের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। এ শিল্পকে সচল রাখেন যাঁরা তাঁদের অনেকেই বিশ্বস্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকরা প্রত্যেকে ন্যায্য মজুরি পেলে, তাঁদের জীবনমান উন্নত হলে একদিকে যেমন কমে আসবে শ্রমিক- অসন্তোষ, অন্যদিকে, তেমনি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি পাবে, যার জন্য সামগ্রিকভাবে বাড়তে পারে শিল্পোৎপাদন। তবে সে-আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকা দরকার। এক্ষেত্রে অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। অসৎ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব। ওই ধারাটিকে বর্জন করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সুস্থ্য ও সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন- মহান মে দিবসে মেহনতী মানুষকে এ অঙ্গীকারই নিতে হবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা সবাই শ্রমিক, শ্রমের কর্ম কৌশলের আদলে শ্রমের প্রকার ভেদ থাকতে পারে। তবে পার্থিব জগতে নানাবিধভাবে আমরা অবশ্যই শ্রমিক। তাই এ মহান মে দিবসে আমাদের সবারই উচিত একে অন্যের শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা। তাহলেই আমরা নিজ, নিজ অবস্থান থেকে এ ঐতিহাসিক মে দিবসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আমাদের মহান নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন নিজ জীবনে এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবান হওয়ার তাগিদ দিয়ে গেছেন বিশ্ব উম্মার জন্য- তাঁর সাহাবাগণদের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৬টি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন আছে- যাহা খুবই দুঃখজনক। মালিকদের যদি একটি মাত্র জাতীয় সংগঠন থাকতে পারে তবে আমরাও অন্যান্য দেশের ন্যায় দলমত নির্বিশেষে একটি মাত্র "কনফেডারেশন" গঠন করলে শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী গুলি অতি সহজে আদায় করতে সক্ষম হব।

৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির মাধ্যমে অর্জিত এ স্বাধীন দেশটি সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল শ্রমিক ও মালিক ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসুক- ইহাই হোক আজকের মহান মে দিবসে আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এবং এবারের মহান মে দিবসে আমাদের শ্লোগান হোক "শ্রমিক-মালিক ঐক্য চাই, উন্নয়নের বিকল্প নাই"।

আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী আমাদের প্রতিটি শিল্পে একটি করে ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ইহাই হোক মে দিবসের বর্তমান দাবী। এখন পর্যন্ত বহু গার্মেন্টস কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয়নি। ৮৭% ইনফর্মাল সেক্টরে এখনও পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কোন পরিবেশ নেই। দেশে সুষ্ঠু শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আমাদের সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রমিকের বঙ্গবন্ধু-শ্রমিক বান্ধব শেখ হাসিনা

জেড এম কামরুল আনাম
সভাপতি, বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোষাক শিল্প শ্রমিক লীগ
(বিটিজিডব্লিউএল) এবং চেয়ারম্যান, সোনাগাজী উপজেলা পরিষদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর বৃহৎ এবং পরিত্যক্ত কল-কারখানা পিও-২৭ এর মাধ্যমে জাতীয়করণ করেন, তাছাড়া শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য প্রত্যেক শিল্প এলাকায় স্কুল স্থাপন, চিকিৎসা কেন্দ্র/হাসপাতাল স্থাপন, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়, মুনাফার ২.৫০ শতাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন, ন্যূনতম মুজুরি ঘোষণা ও মুজুরী কমিশন গঠন, ১ মে (মে-ডে) সরকারি ছুটি ঘোষণা, শ্রমিকদের উৎপাদন ও উৎসব বোনাস প্রদান, ILO Core Convention ৮টির মধ্যে ৭টি এবং শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কনভেনশন অনুসমর্থনের পাশাপাশি শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার রক্ষায় অনবদ্য ভূমিকা রেখে ছিলেন। তিনি নিরন্তর শ্রম মেধা আর যোগ্যতার সবটুকু ঢেলে দিয়ে এগিয়ে গেছেন নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষের অধিকার আদায়ে। এমন নিবেদিত থাকা মানুষের জন্য নিবেদিত থাকবে বাংলাদেশের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ; এটাই স্বাভাবিক। আলোকিত দেশ গড়ার কারিগর জাতির পিতা প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য। আর তাই সাহসের সাথে বলতে চাই, যারা জাতির জনকের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শণ করে না, তারা শুধু অবৈধই না; অবৈধ আগামী গড়ারও কারখানা।

আমরা জানি যে, ১ মে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায় ও মুক্তির লড়াইয়ের প্রতীক ছিল। বাংলাদেশেও তাই ছিল। কিন্তু কালক্রমে মে দিবস যেমনটি দুনিয়াতে তার ধার হারিয়েছে তেমনি হারিয়েছে বাংলাদেশেও। এখন বাংলাদেশে এটি একটি ছুটির দিনও। এ দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা লেবার দিবস হিসেবেও দুনিয়ার কোথাও কোথাও পালিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের আগে এ দিনটি সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অনুপ্রেরণার দিবস হিসেবে পালিত হতো। কিন্তু রাশিয়ার পতনের পর পুঁজিবাদী দুনিয়ার দাপটে মে দিবস অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসনে শ্রমিক শ্রেণির ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। তবে এখনও বিশেষত কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় দিনটি গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে এ দিনটি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে পালিত হতো। শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দিনটি পালনে আমাদের শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। মে দিবসের বিশাল র‍্যালি বা জনসভার কথা এখনও আমাদের যৌবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর পঁচাত্তর পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরকারের সময়ে বাংলাদেশে সরকারিভাবে দিনটির অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক-শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম করার জন্য তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে সরকারি শ্রমিক সংগঠন তো বটেই অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল মে দিবসকে গুরুত্ব দিত। শ্রমিকরাও দিনটিকে তাদের নিজেদের দিন হিসেবে পালন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পর বাংলাদেশের জন্মের আদর্শকে তথা স্বাধীনতার চেতনার মূল্যবোধকে বদলে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা এবং পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা শুরু করার পর পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র পুঁজিবাদের তোষণ শুরু করে।

বাংলাদেশের জন্মের আগে বা পরে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যে প্রভাব ছিল পঁচাত্তরের পর সেগুলো হাওয়ায় উড়ে যায়। যে দেশটি সাধারণ মানুষ, মেহনতি মানুষ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে জন্ম নিয়েছিল তাতে শ্রমিক শ্রেণি দিনে দিনে আরও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকল। পাকিস্তান আমলে যেসকল বৃহৎ কল-কারখানা ছিল তাতে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তেমন কিছু ছিল না। আলোকিত সম্মৃদ্ধ আর সুন্দর জীবন চারণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত থাকার

পাশাপাশি শ্রমিকের কথা ভেবে ভেবে ব্যাপক কাজ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়, শ্রমিকের সন্তান ও পরিবারের বাসস্থানসহ অসংখ্য কাজ করে গিয়েছিলেন। শ্রমজীবীদের সম্মান করার আহবান আজো শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা গর্বের সাথে স্মরণ করে।

আজ স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই একই রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছেন। নিবেদিত রেখেছেন বাবার মত করে রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-কূটনীতির প্রতিটি স্তরে নিজস্ব ভূমিকা। এ ভূমিকার হাত ধরে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবেই। সে প্রত্যয়ে আবারো জাতির পিতার দেখানো পথে এগিয়ে যেতে যেতে আসুন সবাই উচ্চারণ করি-জাতির পিতা টনক নাড়ান শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে/ আজ এসেছে দায়িত্ব তাই করতে হবে রক্ষে/ শ্রমিক বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, দেশ বাঁচাও হেসে/ শ্রমিক কৃষক আমজনতা দেশকে ভালোবেসে...
শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ৩৫ বছর অতিক্রান্ত করেছে। তিনি শুধু দলকেই সুসংহত করেননি তাঁর নেতৃত্বে তিন বার সরকার গঠন এবং পরিচালনাও হচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার এবং জঙ্গিদের বিচারের মাধ্যমে একর পর এক শাস্তি কার্যকর করে চলেছেন। তিনি ক্ষুধা, দারিদ্র, শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বেড়েছে ব্যাংক রির্জাভ, রেমিটেন্স ইত্যাদি। বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সমুদ্র বিজয়ও অন্যতম। ডিজিটাল বংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় তা বাস্তব। শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণে নিয়েছেন হাজারো পদক্ষেপ। শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমজীবীদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। যার কারনে আজ তিনি শ্রমিক বান্ধব নেত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। শ্রমিক বান্ধব শেখ হাসিনা/ উন্নয়নের কান্ডারী/ মুছে যাক দুঃখ কেশ/ তিনিই আলোর দিশারী।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবস এবং বাংলাদেশ

মোঃ সামসুল আলম (বকুল) হাওলাদার
সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ

মে দিবসের ইতিহাস শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ দিবসটির উদ্ভব ঘটেছিল। অধিকার আদায়ে শ্রমজীবী মানুষকে যুগে যুগে করতে হয়েছে সংগ্রাম, সইতে হয়েছে নানা রকমের পুলিশি নির্যাতন, জেল-জুলুম, হুলিয়াসহ দমন-পীড়ন। শ্রমজীবী মানুষকে আজো মোকাবেলা করতে হয় শোষক শ্রেণির ষড়যন্ত্র। এখনো বিভ্রান্তি ছড়ানোর মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে মে দিবসের মর্মবাণীকে অন্তঃসারশূন্য করার চেষ্টা করা হয়।

মে দিবসের এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির দিন। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টাও ছিল না। নামমাত্র মজুরিতে তারা মালিকের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য হতো। শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ১ মে শিকাগো শহরের ৩ লাখ শ্রমিক ধর্মঘট করে রাস্তায় নেমে আসে। ৩ মে এর শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। ক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে সমাবেশ ডাকা হয়। শান্তিপূর্ণ এ সমাবেশের শেষের দিকে দূর থেকে একটি বোমা এসে পড়ে সমাবেশস্থলে। সেসময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। পুলিশ সমাবেশের শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পুলিশ শ্রমিক সংঘর্ষে চারজন শ্রমিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সভাস্থলে নিহত একজন কিশোর রক্তে ভেজা জামা খুলে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়, যা পরবর্তীকালে লাল পতাকার মর্যাদা পায়। ৮ জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ৫ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়। আমেরিকার শ্রমিকদের এ আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংহতি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন স্থানে মালিকরা বাধ্য হয়ে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি মেনে নিতে শুরু করে। সেই থেকে ১ মে দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও সংহতির প্রতিক হিসেবে মে দিবস নামে পরিচিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সময়ে ছোট ছোট আকারে মে দিবস পালন করা হয় তবে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ প্রথমবারের মতো বিপুল উৎসাহ নিয়ে মে দিবস পালন করে। লাল পতাকা নিয়ে সভা সমাবেশ মিছিল করে আদমজীর প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক। এর মাঝেই পাকিস্থান সরকারের দমন নিপীড়ন এর প্রতিবাদে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিতে থাকে এদেশের মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর দেয়া মুক্তির সনদ ৬ দফা আন্দোলনে শহীদ হন তেজগাঁও এর শ্রমিক মনু মিয়া । ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৬৯ সালে ১২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরাসরি নির্দেশে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে গঠিত হয় জাতীয় শ্রমিক লীগ। শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করে জাতীয় শ্রমিক লীগ, বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীন বাংলার মুক্তির সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রমিকদের বিরাট অংশ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বাধীন বাংলার মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবসটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। বঙ্গবন্ধু ১ মে'কে মহান মে দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে এবং তাদের অধিকার আদায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু মহান মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধু ব্যাংক, বীমা, শিল্প কল-কারখানাগুলো জাতীয়করণ করেন । ফলে শ্রমিক, কর্মচারীরা সরকারি চাকুরীজীবী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। যুদ্ধবিদ্ধস্থ বাংলাদেশকে পূনর্গঠন এর জন্য বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের উপড় ভরসা রাখেন, এসব শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে এবং এদের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি দেন।

শ্রমিক কল্যাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল বিশ্বব্যাপি সমাদৃত। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে"। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তার এ স্পষ্ট অবস্থান বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ছিল ব্যাপক সমাদৃত। তাইতো তিনি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিক হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর শ্রমিক শ্রেণির সংগঠনগুলোতে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শিক চর্চার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় দলীয় রাজনৈতিক আদর্শিক ধারার চর্চা। ১৯৭৫ পরবর্তী পাকিস্তান এর মদদপুষ্ট সামরিক সরকারের তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে মৌলবাদী স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করতে শুরু করলে শ্রমিক সংগঠনগুলোয় তার প্রতিফলন ঘটে, জামায়াতের মতাদর্শের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নামে শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। একে একে ধ্বংস করা হয় বাংলাদেশ মতাদর্শের মুক্তিকামী শ্রমিক সংগঠন গুলোকে। শ্রম রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণির হাতে থেকে চলে যায় বুর্জোয়া শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে। বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে শুরু হয় শ্রমজীবী মানুষের নতুন লড়াই। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের দাসত্ব মুক্তির আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাই শ্রমিকদের ছিল ব্যাপক ভূমিকা। ১৯৯৬ এর অসহযোগ গনআন্দোলনেও শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে লেখা রয়েছে।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যখন জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়, যখন শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করে ঠিক তখনই দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে রাজাকার আলবদর বাহিনীর গাড়ীতে তুলে দেয়া হয় ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া গর্বের জাতীয় পতাকা। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বেছে নেয়া হয় শ্রমিক শ্রেণির লোকগুলোকে ধ্বংস করা। ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হয় গার্মেন্টস সেক্টরকে এবং এর সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে। বন্ধ করে দেয়া হয় গর্বের আদমজী জুট মিলসহ শত শত শিল্প-কারখানা। বেকার হয়ে পরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। ধ্বংস হতে থাকে দেশের অর্থনীতি। দেশের শ্বাসরুদ্ধকর সেই সময়ে রাজাকার পৃষ্ঠপোষক নব্য স্বৈরাচার সরকারকে হটাতে রাজপথে নেমে আসে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জনতা।

শ্রম বান্ধব জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমজীবী মানুষের মুখে আবার হাসি ফুটতে শুরু করে । শ্রমজীবী মানুষের অধিকার এবং ন্যায্য সম্মান বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় । গার্মেন্টস সেক্টরে যা ছিল বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য। ২০১০ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৬৬২/- থেকে বাড়িয়ে ৩০০০/- টাকা করা হয়। আবার ২০১৩ সালে ৫৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। শুধু গার্মেন্টস সেক্টরেই নয় অন্য সকল শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধি হয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয় । শ্রমিকদের চাকুরী ৫৭ থেকে ৬০ বছর বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্ব ভাতা প্রণয়ন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে ২০১৩ সালে সংশোধন, জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। শ্রমিক কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব পদক্ষেপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ।

স্বাধীন বাংলাদেশে এপর্যন্ত যত সরকার এসেছে তার মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারই শ্রমিক বান্ধব সরকার হিসেবে সমাদৃত। শ্রমের মর্যাদা শ্রমিককে কাজে উৎসাহিত ও কর্মদীপ্ত করে। শ্রমিক কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাওয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে আজ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। সকল অনাচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস দূর করে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন এটা সকলের কাম্য। আর জননেত্রীর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলার মেহনতি মানুষ একযোগে কাজ করে যাবে এ হোক শ্রমজীবী মানুষের মহান মে দিবসের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শিকল ছেঁড়ার ডাক.....

নইমুল আহসান জুয়েল
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ
উপদেষ্টা, এলায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ারকার সেফটি
সদস্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)
সদস্য, জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল

বিখ্যাত মার্কিন গীতিকার জন উইলের পঙক্তি, যা আজও মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগকে উজ্জীবিত করে....."জেগে ওঠো সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষ জেগে ওঠো/তোমার ভেতরে থাকা সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে ওঠো"। জেগে উঠেছিলো শ্রমিকরা ১ মে ১৮৮৬-তে। যে দিনটি শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের আন্দোলন আর অধিকার আদায়ে রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে চিরদিন।

৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের আন্দোলন সফল পরিণতি পেয়েছিলো ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক মে দিবসে। কিন্তু শুরুটা তারও বেশ আগে। ১৮৩৪ সালে ইংল্যান্ডের সুতাকল শ্রমিকদের সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট, ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের একদিনের ধর্মঘট। ১৮৬২ সালে ভারতের হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিকদের কয়েক দিনব্যাপী ধর্মঘট। এরপর ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলনটি গোটা বিশ্বের নজর কাড়ে। ঐতিহাসিক মে দিবসের বিশ বছর আগে ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বাল্টিমোড়ে সমবেত হয়ে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলনে একটা প্রস্তাব নিয়ে শুরু করেছিলেন আট ঘণ্টার লড়াই। সেটা ছিল মার্কিন শ্রমিকদের প্রথম ঘোষণা। "এ দেশের শ্রমিককে পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে, প্রথম ও বিরাট প্রয়োজন ছিল এমন একটা আইন পাস করা, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোতে আট ঘণ্টাই যেন কাজের দিন হিসেবে গণ্য হতে পারে। যতদিন এ গৌরবময় ফল অর্জন করতে না পারি, ততদিন আমরা আমাদের শক্তি নিয়োগের সংকল্প নিচ্ছি।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আট ঘণ্টার এ প্রস্তাব নিয়েই শুরু হয়েছিলো আন্দোলন এবং ক্রমশ তা ব্যাপ্তি ও তীব্রতা পেতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে শুরু হয় এক গুরুত্বপূর্ণ সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট। বঞ্চিত শ্রমিকের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে ফেটে পড়েছিলো সেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে। কাজের সময় ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ, মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি ও কাজের উন্নত পরিবেশ তৈরি করাসহ শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে হে মার্কেটের শিল্প শ্রমিকেরা ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘটে যোগ দেন প্রায় ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক। তাঁরা কলকারখানা বন্ধ রেখে নেমে এলেন রাজপথে। মালিকরা তখনও শ্রমিকের দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন না।

প্রতিবাদে ৩ মে শ্রমিকরা সমাবেশের ডাক দিলে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রমিক এলাকা থেকে দলে দলে শ্রমিকরা এসে যোগ দেন সেই সমাবেশে। সেদিন হে মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অগাস্ট স্পিজসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতারা। শ্রমিকদের সেই সমাবেশ পন্ড করে দেয়ার জন্য পুলিশবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর। শুরু হয় সংঘর্ষ, নিহত হন ১১ জন শ্রমিক। কোনো প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত করা হয় অগাস্ট স্পিজসহ ৮ শ্রমিক নেতাকে। প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয় ৬ জনের, ১ জন কারাগারে আত্মহত্যা করেন, আরো ১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সমস্ত ন্যায়-নীতি ও বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করেই ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল শ্রমিক নেতাদের। শ্রমিক আন্দোলনে সেটা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সত্য আর গোপন থাকেনি। প্রায় ৬ বছর পরে ১৮৯৩ সালের ২৬ জুন ইলিয়নসের গভর্ণর আলটগেলড বিচারালয়ের আগের রায়কে বাতিল করে মুক্ত করে দিলেন অন্যান্য বন্দি শ্রমিক নেতাদের। আর তীব্র সমালোচনা করলেন বিচারকদের, আদালতের জুরি সভ্যদের ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীদের। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১ মে 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১ মে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের এ গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে বিশ্বব্যাপি পালন হয়ে আসছে "মে দিবস" বা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। শুধু পালন হয় না আজও আমেরিকা ও কানাডাতে।

বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণের নেপথ্যের মূল কারিগরই হলো সাড়া পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ। তাঁদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে আধুনিক বিশ্বের চাকা সচল রয়েছে। যেকোনো দেশের প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে সেই দেশের মানবসম্পদ। যথাযথ শিক্ষা, পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত মানবসম্পদ দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। মহান মে দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়.....কেবল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার মধ্যদিয়েই সম্ভব একটি উন্নত ও মানবিক বিশ্ব গঠন করা। আর একটি মানবিক বিশ্বই পারবে শ্রমজীবী-পেশাজীবী-কর্মজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে।

বর্তমান বিশ্ব পরিবর্তনশীল এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে হলে অবশ্যই শ্রমিকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি।

যতদিন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থাকবে, শ্রমিক শোষণ থাকবে ততদিন। তাই শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সংগ্রামই হোক গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মহান মে দিবসের শপথ।

দুনিয়ার মজদুর এক হও
জয় বাংলা। জয় হোক মেহনতি মানুষের।

**"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"**

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

এ. আর. চৌধুরী রিপন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি
হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)

সকল বঞ্চনা, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম আর অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত গৌরবময় দিনের নাম মে দিবস।

১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের 'মকরপ্যাক রিপার ওয়ার্কস' নামের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘটি শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান মে দিবসের জন্ম। বিশ্বব্যাপি ৮ ঘণ্টা কাজের সুযোগ নিশ্চিতের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অধিকার আদায়ের যুগান্তকারি প্রয়াস হচ্ছে এ দিনটি।

মহান স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনীতিতে দেশের শ্রমিক সমাজের অবদান সর্বজনবিদিত।
বাংলাদেশ আজ একটি অমিত সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনাকে ধারণ করছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দুর্ঘটনায় মারা যায়। দেশের তৈরি পোশাক খাতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রানা প্লাজা ভবন ধসে প্রায় ১১৩৫ শ্রমিকের মৃত্যু এবং ১২৪৮ শ্রমিকের মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, তাজরিন ফ্যাশন্সের অগ্নিদুর্ঘটনায় ১১৩ শ্রমিকের মৃত্যু এবং প্রায় ৩০০ শ্রমিকের আহত হওয়া জাতির জন্য বেদনাদায়ক।

বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি) পরিচালিত কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বার্ষিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৬ সালে অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রের কারণে বিভিন্ন সেক্টরে ১২৪০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৫৪৪ জন। গতবছরের তুলনায় শ্রমিক নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ২৮৯ জন। ২০১৫ সালে নিহত হয়েছিলেন ৯৫১ জন।

কর্মস্থলে হতাহতের উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে-বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকান্ড, ভবন বা স্থাপনা থকে পড়ে যাওয়া, বজ্রপাত, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, সহিংসতা, গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে শারিরীক নির্যাতন, দেয়াল-ভবন-ছাদ ও ভূমিধ্বস। অধিকাংশ পেশাগত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব যদি মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকরা কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থেকে তা হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংবিধানের ৭, ১৪ এবং ২০ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

অগ্নিকান্ড এবং ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশের তৈরি পোশাক খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আইএলওর সহযোগিতায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে ২০১৩ সালের মার্চে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইএলও ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের অধীনে বুয়েট, অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স-এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩ হাজার ৭৪৬ টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

তবে তৈরি পোশাক খাতে অগ্নিকান্ড এবং ভবন নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হলেও অন্যান্য খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ উপেক্ষিত থেকেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর টঙ্গীতে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড কারখানায় অগ্নিকান্ড ও ভবন ধ্বসে ৩৯ জন শ্রমিক মারা যায়, ৪০ জন মারাত্মকভাবে আহত এবং ১০ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়। বয়লার পরিদর্শনসহ অন্যান্য সেক্টরের কারখানা পরিদর্শনে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাছাড়া সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অপর্যাপ্ত জনবল দেশের সব শিল্পখাতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যথেষ্ট নয়। ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করে এর জনবল ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। তবে এ উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আরও শক্তিশালী পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত জনবল।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিকের পরিবারে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে। অন্যদিকে, পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শ্রমিকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তদুপরি নতুন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের সুনামও নষ্ট হয়। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব মালিকের। শোভন ও সবুজ কাজ নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও শেষমেষ মালিকই এ উদ্যোগের ফলে লাভবান হন। বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত ২০১৩) ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর আলোকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে নজরদারি বাড়ানো, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ সম্পর্কে শিল্পের মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের সচেতন করা, কর্মস্থলে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইউনিট চালু করা, সরকারি হাসপাতালে পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো, পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, গৃহকর্মী সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার ও আহত শ্রমিককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

পুঁজি ও শ্রম উৎপাদনের মধ্যবিন্দু

কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
শ্রম উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
(সাবেক প্রধান পরিদর্শক
এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রম পরিচালক)

ইতিহাসের পাতা খুলে দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে মালিকদের বা মালিক সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নের যে ভুল ধারণা ছিল, এ উপমহাদেশে সে ধারণার অবসান আজও হয়নি। শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের ধারণা এই যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শ্রমিকদের অধিক পরিশ্রম করে মুনাফা অর্জন করছে এবং তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন। অন্যদিকে মালিক বা নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল মনে করছেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূতভাবে আচরণ করছে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো বা শ্রমিক শ্রেণি অযৌক্তিক দাবিনামা উত্থাপন করে শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত করছে। উভয় পক্ষের এরূপ ধারণার পেছনে অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে। এর প্রধান কারণ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যথাযথ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এবং উভয়ের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব রয়েছে।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘাত কোনো নতুন বিষয় নয়। শিল্প থাকলে শিল্প সংঘাত বা শিল্প বিরোধ থাকবে। কারণ শিল্প প্রক্রিয়ায় উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে। পুঁজি ও শ্রম ব্যতীত উৎপাদনপ্রক্রিয়া চলতে পারে না। এ অমোঘ সত্য উভয়কেই উপলব্ধি করা একান্ত অপরিহার্য। এতে সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিমাণ কমে।

শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হলে বা শিল্পে পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্ব নিরসন না হয়ে অব্যাহত থাকলে উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন হ্রাস পেলে লোকসান পোহাতে হয়, শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, টাকার মান কমে যায়, দেশের উন্নয়ন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পরিশেষে আপামর জনসাধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শিল্পোন্নয়নের পূর্ব শর্ত শিল্পে শান্তি। এতে মালিক, শ্রমিক ও দেশের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হয়। উৎপাদন হ্রাস পেলে বা উৎপাদনের মান ক্ষুণ্ন হলে যেমন মালিককে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হলে শ্রমিকদেরও বেকারত্বের বোঝা বহন করতে হয়। শ্রমিক দেবেন শ্রমের পূর্ণমান আর মালিক দেবেন শ্রমের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা। একে অপরের সমস্যা জানবেন ও উপলব্ধি করবেন। সুসম্পর্কের মাধ্যমে একে অপরের সমস্যা নিরসন করবেন। তবেই হবে শিল্পে শান্তি ও প্রগতি।

বিদ্যমান শ্রম আইন পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত ও স্বচ্ছ। সময়ের প্রয়োজনে সরকার শ্রম আইন আরও উন্নত ও প্রায়োগিক করতে পারে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিল্পে দুই পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সব ধরনের বিরোধ বা বৈপরীত্য দূর হতে পারে। 'আমি যা বলছি সেটাই ঠিক' এমন ধারণা উভয় পক্ষকে পরিহার করতে হবে। যেকোনো শিল্পবিরোধ বা দ্বন্দ্ব সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব। একে অপরের বৈরী বা বিদ্বেষী না হয়ে সহায়ক হওয়ার চিন্তা চেতনা সৃষ্টি করতে হবে।

শ্রমিক বা মালিক প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো দাবি উত্থাপন করতে পারে। বিদ্যমান শ্রম আইনে এ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ করে কর্মবিরতি করা বা আলোচনা ব্যতীত দাবির প্রতি অবিচল থাকা একটি আত্মঘাতী প্রয়াস। অনুরুপভাবে বিনা নোটিশে অথবা আকস্মিকভাবে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া, শ্রম আইন অনুসরণ না করে শ্রমিক ছাঁটাই করা বা ছাঁটাইয়ের ক্ষতিপূরণ না দেওয়া বা শ্রমিককে চাকরি থেকে টার্মিনেট করা শ্রম আইনের পরিপন্থী। পদ্ধতি অনুসরণ করে শিল্প পরিচালনা করা উত্তম।

কোনো কারণবশত আকস্মিক শিল্পবিরোধ সৃষ্টি হলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কালবিলম্ব না করে দ্বিপক্ষীয় সামাজিক সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। অযৌক্তিক দাবীও আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা যায়। আর শিল্পসম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে যেকোনো সংকট সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে নিরসন করা সহজ হয়।

পুঁজি এককভাবে কোনো উৎপাদন দিতে পারে না। শ্রমশক্তিও এককভাবে কোনো উৎপাদন দিতে পারে না। পুঁজি ও শ্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় পণ্য। পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শ্রমশক্তিকে দক্ষতাপূর্ণ করতে হয়। আবার পণ্য উৎপাদনের জন্য পুঁজির জোগান দিতে হয়। এ অমোঘ সত্য মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই উপলব্ধি করতে হয়।

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। চলতি অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অর্থের বা পুঁজির প্রয়োজন। মালিককে এ পুঁজির জোগান দিতে হয়। শ্রমিককেও এক্ষেত্রে দক্ষতাপূর্ণ শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ে সৃষ্টি করতে হবে কর্মতৎপরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি। তবেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। সরকারের পরিকল্পিত সাহায্য-সহযোগিতা অপরিহার্য।

এবারের মে দিবস হোক পরিকল্পিত প্রয়াস, শিল্প সম্পর্কের পরিসীমা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার পরিবেশ সম্প্রসারণ এবং পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবসে আমাদের শপথ

এম এ রশীদ
অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর

প্রগতির পথে পা রেখেছি এবার
কুয়াশার পার হতে এনেছি প্রভাত
আর কথা নয়, চাই কাজের দু'হাত।
এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তি সৈনিক
শান্তির পথে তাঁরাও ছিলেন সদা নির্ভিক
নতুন সূর্য দেয় ইশারা সামনে নতুন প্রভাত
ডিজিটাল বাংলা গড়তে চাই, কাজের দু'হাত।
আলসে নয় খেটে খাই, ব'সে থাকার সময় নাই
দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ
শপথ নেবার সময় আজ, ভাবনা নাইরে।
শোনো ভাই ব'লে যাই, হাটে-মাঠে ঘাটে যাই
যা'র যে কাজে হাত রয়েছে, লেগে পড়ো সে সেই কাজে
সোনার এদেশ গড়বো এবার চিন্তা নাইরে।

এদেশের কৃষক-শ্রমিক-কামার-কুমার
হাতিয়ার হাতে সবার ভাগ্য গড়ার।
আমাদের মানুষ আছে মাটি আছে
কল-কারখানা সবই আছে
শপথ নিলাম কাজ করে গড়বো বাংলাদেশটাকে।

কুলি মজুর শ্রমিক সমাজ
কাজের তরে চলোরে আজ
সবাই মিলে করবো কাজ নিজের ভাগ্য বদলাতে,
দুঃখ কষ্ট রইবেনা আর
সুখের হাসি ফুটবে সবার
সোনার বাংলা উঠবে ভরে খাঁটি সোনার খনিতে,

কর্মবিমুখ হবোনা আর
সময় এখন ভাগ্য গড়ার
ঐক্যহাতে ধরবো এবার কল-কারখানার হাতিয়ার।
অন্ন বস্ত্র পাবার
আজকে সবার অধিকার
এ শ্লোগান বলে সবাই হাত দেবো আজ কাজেতে,

খেত-খামার কারখানাতে
উৎপাদন আজ বাড়াতে
শ্রমিক-মজুর কিষাণ-তাঁতি চলো খামার কলেতে,
আমাদের মানুষ আছে মাটি আছে
কল-কারখানা সবই আছে
শপথ নিলাম কাজ করে গড়বো সোনার দেশটাকে।

ইতিহাসের আলোকে মহান মে দিবস

খান আখতার হোসেন
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা।

শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের অধিকার, শ্রমের সময় প্রতিষ্ঠা পেতে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় ২০২ বছর। বিক্ষিপ্ত আন্দোলন থেকে সমষ্টিগত আন্দোলনে রূপ নেয় ১৬৮৪ সালে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে সংগঠিত হয় ঠেলাওয়ালারা। গড়ে তোলে ঠেলাওয়ালাদের সংগঠন। ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে বিভিন শ্রেণি, বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবিদের সংগঠন। তবে প্রথম ধর্মঘটে যায় চার্লস্টনের চিমনী পরিস্কারক শ্রমিকেরা ১৭৬৩ সালে। ১৭৭০ সালে নিউইয়র্কে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৭৭৮ সালে নিউইয়র্কে ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়। আমেরিকার মহিলা দর্জি শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে ১৮২৩ সালে। ১৮২৮ সালে শিল্প শ্রমিকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঘটে যোগ দেয়।

ইউরোপের ব্রাসেলস, প্যারিস ও লন্ডনে শিল্প বিপ্লব ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয় ১৮৩০ সালে। আমেরিকা ও কানাডায় মজুরি বৃদ্ধি ও দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজের দাবীতে (আন্দোলনের প্রথম দাবী ছিল দৈনিক ১০ ঘন্টা যা পরবর্তিতে দৈনিক ৮ ঘন্টার দাবীতে পরিণত হয়) ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় ১৬৮ টি ধর্মঘট পালিত হয়। ১৮৩৬ সালে ব্রাসেলস এ শিল্প বিপ্লব ও আন্দোলনের কারণে একজন শ্রমিক নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে শ্রমিক সমাজ। লন্ডন ওয়ার্কিং ম্যান এসোসিয়েশনের ডাকে এই মৃত্যুর প্রতিবাদে বিশাল শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম লোবেস্টসহ অনেক শ্রমিক নেতা গ্রেফতার হয় ব্রাসেলস-এ। কানাডা-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৮৪২ সালে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার আইনগত স্বীকৃতি পায়। লন্ডনের সেন্টমার্টিন হলে কার্ল মার্কস উদ্বোধন করেন ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনভেনশন। এ কনভেনশনেই গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংম্যান অর্গানাইজেশন। ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল ব্যাপী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস- এর নেতৃত্বে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' রচিত হলে 'সব মানুষ ভাই ভাই', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ কায়েম কর' ইত্যাদি বক্তব্য ও শ্লোগান শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৬৬ সালের ২২ আগষ্ট আমেরিকায় বাল্টিমোর শহরে ৬০ টি ট্রেড ইউনিয়নের এক সম্মেলনে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন সর্বপ্রথম ৮ ঘন্টা কাজের দাবী তোলে। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন এর মূল নেতা উইলিয়াম এইচ সিভিস 'সম্মেলনে' উক্ত দিনকে তিন ভাগে বিভাজন করে কাজের ঘন্টার দাবী উপস্থাপন করেন এভাবে We work eight hours, we rest eight hours and other eight hours what we will..... এ দাবী দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। দাবীর স্বপক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠলে ১৮৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জনসনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় এ দাবীর পক্ষে একটি আইন পাস হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এ দাবী মেনে নেয়। কিন্তু আইনটি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম এইচ সিভিল মৃত্যুবরণ করেন। ফলে ৮ ঘন্টা পক্ষের আইনটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, ইটালি, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি দেশের মালিক ও সরকার এ দাবীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করে। এ অবস্থান ধীরে ধীরে সুদৃঢ় হয়। বিপরীতমূখী অবস্থানে আসে মালিক ও শ্রমিক সমাজ। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও জার্মানীর শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং ম্যান অরগানাইজেশনকে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

১৮৭২ সালে প্যারিস সিটিতে ৭২ দিনের ধর্মঘট আহবান করেন শ্রমিকেরা। ব্রাসেলস- এ স্থাপন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন এর সদর দপ্তর এবং ১৮৭৪ সালে উক্ত দপ্তর বদলী করে আনা হয় নিউইয়র্কে। ১৮৭৪ সালে নিউইয়র্কে টমকিন স্কোয়ারে শ্রমজীবীদের জনসভায় সরকারি পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ১৮৭৫ সালে পেনসিলভেনিয়ায় কয়লাখনি শ্রমিকদের আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত ১০ জন নেতার ফাঁসি হয়। নিউইয়র্কে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সম্মেলন বাতিল হয়ে যায় ১৮৭৬ সালে। ১৮৭৭ সালে আমেরিকার রেল ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকেরা ধর্মঘটে যোগ দেয়।

১৮৮২ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওর গাড়ী শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। রাশিয়ার মস্কোর বিখ্যাত কারখানা মারাজভের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে ১৮৮৪ সালে । ১৮৮৬ সালের প্রথম দিকে ফ্রান্সের কয়লা শ্রমিকেরা একটি দীর্ঘ ও তিক্ত ধর্মঘটে অংশ নেয়। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ২ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ২০০ টি শিল্প কারখানায় ৩০৯২ টি ধর্মঘট সংঘটিত হয়। লন্ডন ও ব্রাসেলস্- এ গ্লাস শ্রমিকেরা এ সময় ধর্মঘট শুরু করে। আমেরিকার সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন 'নাইটস অব লেবার' এর কিছু নেতা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর বিরোধিতা করে মালিকদের লেজুড়বৃত্তি শুরু করলে দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে সংগঠনটি। শক্তিশালী হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন 'আমেরিকা ফেডারেশন অব লেবার' (AFL) । ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সম্মেলনে AFL ঘোষণা করে ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে আমেরিকা ও কানাডার শ্রমিকেরা ৮ ঘন্টাকে কাজের দিন হিসেবে পালন করবে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ও মালিক পক্ষ এ ঘোষনার বিপরীতে অবস্থান নেয়ায় ১৮৮৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে AFL ১৮৮৬ সালের ১ মে দেশব্যাপি ধর্মঘটের ডাক দেয়। AFL- এর সাধারণ সম্পাদক গাব্রিয়েল এডমনস্টনের আহবান ধর্মঘট সফল করার জন্য সবাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এ আন্দোলনের প্রস্তুতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মালিক পক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সরকারের সহযোগিতায় মালিকপক্ষ ধর্মঘট বানচাল করার প্রস্তুতি নেয়। ১৮৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের সভায় প্রায় একুশ হাজার শ্রমিক অংশ নেয়। ২৫ এপ্রিলের সভায় প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিকের উপস্থিতিতে আলবার্ট পারসল, অগাষ্ট স্পাইজ প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ৮ ঘন্টা দাবীর সমর্থন বাড়তে থাকে। উজ্জীবিত হয়ে ওঠে গোটা শ্রমিক সমাজ।

ঘনিয়ে আসে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ১৮৮৬ সালের ১ মে, শনিবার। আমেরিকা ও কানাডার শ্রমজীবীরা সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে। আমেরিকার শিকাগো শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় তিন লাখ শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্রায় অচল করে দেয় শিকাগো শহর। শ্রমিক নেতা পারসন্স ও তার স্ত্রী লুসির নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিলে প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক অংশ নেয়। ১৩৫০ জন সশস্ত্র জাতীয় গার্ড থাকা সত্ত্বেও উক্ত মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। আন্দোলনের সাফল্য ও তীব্রতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে মালিক পক্ষ। শিকাগো শহরে আয়োজিত ১ মে'র বিশাল সমাবেশ থেকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন যে- ৮ ঘন্টা দাবী না মানা পর্যন্ত লাগাতারভাবে ধর্মঘট চলবে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মালিক পক্ষ। তারা গোপনে মেহনতী শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকারের দাবী বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ওঠে। শিকাগো ট্রিবিউন, নিউইয়র্ক টাইমস শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়, বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করতে থাকে।

ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার, ২মে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় অনেক শ্রমিক বিশ্রামে থাকেন। তবে আন্দোলনকে ধরে রাখার জন্য সিনসিন্নাটির শ্রমিক সমাবেশে ঐদিন বক্তৃতা করেন আলবার্ট পারসন্স। ৩ মে সোমবার লাগাতার ধর্মঘটের মনোভাব নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে আসতে থাকে শ্রমজীবীদের ঢল। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসে সভা সমাবেশের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সবাই। শিকাগো শহরের ম্যাককর্মিক কৃষিযন্ত্রের কারখানায় শ্রমিকেরা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের (পূর্বে ছাঁটাইকৃত) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মঘট পালন করে আসছিল। উক্ত কারখানার দিকে অন্য শ্রমিকদের মিছিল আসতেই ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকেরা উক্ত মিছিলে যোগ দিলে মালিক পক্ষের সহায়তায় পুলিশ আকস্মিক গুলি চালায়। রক্তের বন্যা বয়ে যায় মূহূর্তেই। মারা যায় ৬ জন শ্রমিক। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে আমেরিকা, কানাডা এবং সর্বত্র। এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রধান সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ৪ মে, মঙ্গলবার শিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বরে। সমাবেশ বানচাল করতে মালিকপক্ষ শিকাগো শহরের মেয়র কার্টার হ্যারিসনের সহায়তায় পুলিশ বাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনী পাঠায়। শ্রমিকনেতা ফিলডেন- এর বক্তৃতার সময় হঠাৎ পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ঐ মুহূর্তে সংঘর্ষের মধ্যে পুলিশের মাঝে একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে দুজন পুলিশ ঘটনাস্থলে ও পরে আহত ৬ জন পুলিশ মারা যায়। শুরু হয় পুলিশ ও মালিকপক্ষের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনীর তান্ডব, বর্বরতা।

যৌথ আক্রমণে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে হে মার্কেট চত্বর। মারা যায় ৪ জন শ্রমিক এবং আহত হয় প্রায় ২০০ জন শ্রমিক। সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক নেতা স্পাইজ, ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জর্জ এঞ্জেল, এডলফ ফিসার, লুইস লিঙ্গে এবং অস্কার নীবেকে। আন্দোলনের মুল নেতা আলবার্ট পারসন্সকে পুলিশ চেষ্টা করেও গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের নামে বোমা বিস্ফোরণসহ পুলিশ হত্যার মামলা দায়ের করা হয়। বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন। আন্দোলনের বিরোধিতাকারীদের মনোনীত করা হয় বিচার কার্যের জরুরী হিসেবে। ফলে বিচারের ফলাফল পূর্ব হতে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আদালতে বিচারকার্য শুরু হয় ১৮৮৬ সালের ২১ জুন। রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে হত্যার আদেশ দেয়া হয় স্পাইজ, ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জর্জ এঞ্জেল, এডলফ ফিশার, লুইস লিঙ্গে ও আলবার্ট পারসন্সকে (পারসন্স নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিচার চলাকালীন সময়ে আদালতে আত্মসমর্পন করেন)। আজও প্রমাণিত হয়নি যে- শ্রমিক পক্ষই বোমা নিক্ষেপ করে পুলিশ হত্যা করেছিল। বিচারের বিরুদ্ধে ঝড় ওঠে বিশ্বের সর্বত্র। জনমতের প্রবল চাপে ইলিনয়ের তৎকালীন গভর্ণর শ্রমিকনেতা ফিলডেন ও স্কোয়ারের ফাঁসির আদেশ রহিত করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেন। জেলের ভেতর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ২২ বছরের টগবগে শ্রমিক নেতা লুইস লিংগেকে। জেলখানা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে- লুইস লিংগে আত্মহত্যা করেছেন। প্রবল চাপের মুখেও স্বৈরাচারী সরকার ন্যায়সঙ্গত দাবীর স্রষ্টা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠনেতা আলবার্ট পারসন্স, স্পাইজ, জর্জ এঞ্জেল ও এডলফ ফিশারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে- ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর, শুক্রবার শিকাগোর কুক কাউন্টি জেলে। ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে রচিত হয় এক নব অধ্যায়, নব চেতনার। যে চেতনার কাছে হেরে যায় সকল কুচক্রী মহল। স্বর্ণছটায় মূল্যায়ণ করা হয় বীর শ্রমিকদের। বাস্তবায়ন হয় ন্যায্য দাবী। ঐক্য, সংহতি, সংগ্রাম, ত্যাগ ও বিজয় উজ্জীবিত শ্রমজীবীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও প্রবাহমান। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' ১৮৮৮ সালের ১ মে থেকে প্রতিবছর মার্কিন দেশে শ্রমিকদের মিছিল ও সমাবেশের দিন হিসেবে 'মে দিবস' উদযাপন করার কথা ঘোষণা করে। ১৮৮৯ সালে ১৪ জুলাই প্যারিসে সেকেন্ড সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের (যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত) প্রথম কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে, এখন থেকে প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপিত হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৯০ থেকে আন্তর্জাতিক সংহতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে ১ মে পালন হয়ে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রায় সব দেশেই ১ মে May Day বা মে দিবস হিসেবে পালন হলেও যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ইতালি, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় 'মে দিবস' নেই, আছে Labour Day বা শ্রমিক দিবস। আর কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় এ দিবসটি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার, জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। ইংল্যান্ডে ১ মে'র পরের প্রথম রবিবার হাইড পার্কে 'লেবার ডে' পালন করা হয়। ইটালিতে রোমের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে স্মরণ করা হয় শ্রমিকের অধিকার ও সংহতিকে। মহাকালের অগ্নিগর্ভে হারিয়ে যায়নি মহান শ্রমিকদের অবদান, আত্মাহুতি। উজ্জীবিত বিশ্বের শ্রমজীবী অতি গর্বভরে স্মরণ করে অকুতোভয় সে সব শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে- যাঁদের রক্তে স্নান করে এক ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রম বিরোধ (Labour Dispute)

এস, এম, এনামুল হক
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা।

উপক্রমণিকা (Preface):

আধুনিক সমাজে শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পায়নের ফলে জীবন যাত্রার মানের উন্নয়নসহ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে দুটি পক্ষ ওতোপ্রতভাবে জড়িত থাকে। তাহলো মালিক এবং শ্রমিক। যেহেতু এ উন্নয়ন তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে তাই তাদের মধ্যে সময়ে সময়ে কিছু বিরোধও তৈরী হয়ে থাকে। এ ধরনের বিরোধ মূলত: চাকুরীর শর্তাবলী ও কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে হয়ে থাকে।

শ্রম বিরোধ কি (What is Labour dispute):

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রম বিরোধ বলতে মালিক অথবা শ্রমিকদের মধ্যে উত্থাপিত যেকোন মত পার্থক্য বা বিরোধকে বুঝায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে বিরোধ সাধারনত দু'ধরনের হয়ে থাকে। (১) Right based (অধিকার ভিত্তিক) যা Individual (ব্যক্তি) এর সাথে সম্পর্কিত (২) অপরটি হ'ল Interest based (অধিকার ভিত্তিক) বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এ ধরনের বিরোধ গুলো হয়ে থাকে মূলত: শ্রম আইনে যে সুযোগ/সুবিধা অর্থাৎ অধিকার দেয়া আছে তা যদি শ্রমিক কিংবা মালিক কর্তৃক প্রতিপালন করা না হয়।

অধিকার ভিত্তিক বিরোধ (Right based dispute):

শ্রম আইনে এ ধরনের প্রায় ৩১টি ধারা রয়েছে যেমন-ধারা-৩ (চাকুরীর শর্তাবলী), ধারা-২৮(ক) (নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপর্যয় বা ক্ষতির কারণে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক), ধারা-৩২ (বাসস্থান হতে উচ্ছেদ), ধারা-৩৩ (অভিযোগ পদ্ধতি), ধারা-৮৫ (১) ও ৮৫ (৩) (কতিপয় বিপদের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা), ধারা-৯০ (ক) (সেইফটি কমিটি গঠন), ৯৪(ক) (প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা), ধারা-১২৪ (ক) (আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মজুরীসহ অন্যান্য পাওনাদি পরোশোধ), ধারা-১৩২ (মজুরী হতে কর্তন বা মজুরী বিলম্বে পরিশোধের কারণে উল্লিখিত দাবি আদায়ে শ্রম আদালতে দরখাস্ত), ধারা-১৩৫ (শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল), ধারা-১৬৬ (দূর্ঘটনা জনিত জখমের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে শ্রম আদালতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ), ধারা-১৬৭ (দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যধারার স্থান), ধারা-১৬৮ (ক্ষতিপূরণের জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত), ধারা-১৭২ (দূর্ঘটনার জনিত কারনে ক্ষতিপূরনের বিচারিক জন্য শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল), ধারা-২৩৮ (কোম্পানীর মুনাফার শ্রমিক এর অংশগ্রহণ তহবিল সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি), ধারা-২৮০ (শিক্ষাধীন শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা), ধারা-৩১৯ (প্রধান পরিদর্শক, ইত্যাদির ক্ষমতা ও দায়িত্ব), ধারা-৩২৬ (নকশা অনুমোদন এবং লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রিকরণের ফিস), ধারা-৩২৭ (পরিদর্শকের কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল)।

ধারা-১৭৯ (রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি), ধারা-১৮২ (রেজিস্ট্রিকরণ), ধারা-১৮৬ (রেজিস্ট্রিকরণের দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে চাকুরীর শর্তাবলী অপরিবর্তিত), ধারা-১৮৮ (গঠনতন্ত্র এবং নির্বাহী কমিটির কতিপয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান), ধারা-১৯০ (রেজিস্ট্রি বাতিলকরণ), ধারা-১৯১ (রেজিষ্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আপীল), ধারা-১৯৫ (মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ), ধারা-১৯৬ (শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ), ধারা-২০১ (ট্রেড ইউনিয়নের আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের বার্ষিক হিসাব বিবরনী), ধারা-২০২(ক) (সিবিএ কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ), ধারা-২১৩ (শ্রম আদালতে দরখাস্ত), ধারা-৩১৫ (অপরাধের রিপোর্ট), ধারা-৩১৭ (শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিচালকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা)। এ ধরনের বিরোধগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত অংশীজন (Stake holder) সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

(১) মালিক।
(২) শ্রমিক।
(৩) সরকার।
(৪) মহাপরিদর্শক।
(৫) শ্রম পরিচালক।
(৬) শ্রম আদালত।
(৭) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল।

স্বার্থ ভিত্তিক বিরোধ (Interest based dispute):

এ ধরনের বিরোধ উপস্থাপনসহ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২০৯ (শিল্প বিরোধ উত্থাপন), ধারা-২১০ (শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি), ধারা-২১১ (ধর্মঘট ও লক-আউট) এবং ধারা-২১২ (শিল্প বিরোধের ক্ষান্তি) এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ যে, Interest based শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) অথবা মালিক কর্তৃক দাবীনামা উপস্থাপন করতে হয়।

শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির এর ধাপ (Steps of industrial dispute resolution):

অনানুষ্ঠানিক বিরোধ (Informal dispute):

এটি হল বিরোধ (dispute) নিষ্পত্তির প্রাথমিক ধাপ। এ ধরনের নিষ্পত্তিকে আমরা অনানুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি (Informal dispute resolution) নামে অবহিত করে থাকি। এ ধরনের বিরোধ সাধারণত মালিক এবং শ্রমিক নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের নিষ্পত্তির হার অনেক। পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান থাকলে কেবল এধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

বিরোধ উত্থাপনের প্রেক্ষাপট (Raising of Industrial dispute):

যদি কোন সময়ে কোন মালিক বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি দেখতে পায় যে, মালিক এবং শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিরোধ উত্থিত হওয়ার সম্ভবনা আছে, তা হলে উক্ত মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি তার অভিমত ব্যক্ত করে অন্য পক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন। এ ধরনের লিখিত পত্র পাওয়ার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পক্ষদ্বয়কে আলোচনায় বসতে হয়।

আপোষ (Negotiation):

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (Management) এবং শ্রমিক (Worker) এর মধ্যে দ্বিপক্ষীয়ভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। পত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পত্র প্রাপক, অন্যপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে, পত্রে উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকষি শুরু করার জন্য তাদের সাথে একটি সভার ব্যবস্থা করবেন এবং এইরূপ সভা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হন, তা হলে একটি নিষ্পত্তিনামা লিখিত হবে এবং এতে পক্ষদ্বয় দরখাস্ত করবেন। নিষ্পত্তি নামার একটি কপি মালিক কর্তৃক সরকার, শ্রম পরিচালক এবং সালিসের নিকট প্রেরন করবেন।

সালিসী (Conciliation):

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি অনুযায়ী বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হতে না পারলে অথবা, ক্ষেত্রমত, উল্লিখিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর পনের দিনের মধ্যে বিরোধটি সালিসীর (Conciliation) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানাতে হবে।

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালিস (Conciliator) নিযুক্ত করবেন। উক্তরূপ অনুরোধ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে সালিস (Conciliator) তার সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) শুরু করবেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের সভা আহবান করবেন। বিরোধের পক্ষগণ নিজে অথবা তাদের মনোনীত এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তি সম্পাদন করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিস (Conciliator) এর নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে হাজির হবেন। সালিসীর (Conciliation) ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে, সালিস (Conciliator) তৎসম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন, এবং এর সাথে উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিষ্পত্তিনামার একটি কপিও প্রেরণ করবেন।

সালিস (Conciliator) কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিরোধটি নিষ্পত্তি না হলে সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হবে, অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিক্রমে আরো অধিক সময় চালানো যাবে। যদি সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হয়, তা হলে সালিস (Conciliator) উভয় পক্ষকে বিরোধটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোন মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) এর নিকট প্রেরণে সম্মত করাতে চেষ্টা করবেন। যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণে সম্মত না হন, তা হলে সালিস (Conciliator) সালিসীকার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে, উহা ব্যর্থ হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র পক্ষগণকে প্রদান করবেন।

শ্রম পরিচালক, কোন বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সময় কোন সালিস (Conciliator) এর নিকট হতে কোন সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) উঠিয়ে এনে নিজেই উহা চালাতে পারবেন, অথবা অন্য কোন সালিস (Conciliator) এর নিকট উহা হস্তান্তর করতে পারবেন। যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণ করতে সম্মত হন, তা হলে তাদের সকলের স্বীকৃত কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য যৌথ অনুরোধপত্র প্রেরণ করবেন।

মধ্যস্থতা (Arbitration):

সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) তালিকা হতে Arbitrator অথবা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে Arbitrator হিসেবে নেয়া যাবে। মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) মধ্যস্থতার অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা পক্ষগণ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বীকৃত কোন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তার রোয়েদাদ প্রদান করবেন। মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) তার রোয়েদাদ প্রদানের পর তার একটি কপি পক্ষগণকে এবং আরেকটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন। মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না। মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ অনধিক দুই বৎসর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

সলিসীর চার্ট (Conciliation Chart):

বাংলাদেশের গত ০৫ (পাঁচ) বছরের ত্রিপক্ষীয় সালিসীর চিত্র তুলে ধরা হ'লঃ

ক্রঃ নং	বছরভিত্তিক	নিষ্পত্তির আবেদন	জের	মোট	নিষ্পত্তির সংখ্যা	ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র	পেন্ডিং
০১	২০১২	১০৪	০৭	১১১	১০৪	০৩	০৪
০২	২০১৩	১১৭	০৪	১২১	১১১	০২	০৮
০৩	২০১৪	৭৬	০৮	৮৪	৭৩	--	১১
০৪	২০১৫	৬৩	১১	৭৪	৬৬	০৪	০৪
০৫	২০১৬	৯০	০৪	৯৪	৭৬	০৩	১৫

ধর্মঘট ও লক-আউট (Strike & Lockout):

সালিসী কার্যক্রমে ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে পনের দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ধর্মঘট অথবা, ক্ষেত্রমত, লক আউটের নোটিশ প্রদান করতে পারবে, যাতে নোটিশ প্রদানের পর অন্যূন সাত দিন এবং অনধিক চৌদ্দদিনের মধ্যে কোন তারিখ হতে উহা শুরু হবে তা উল্লেখ থাকবে, অথবা উক্ত বিরোধ উত্থাপনকারী পক্ষ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবে। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক ধর্মঘটের কোন নোটিশ জারী করার পূর্বে গোপন ভোটের মাধ্যমে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ধর্মঘটের পক্ষে সমর্থন আছে কিনা তা সালিসের উপস্থিতে যাচাই করে নিতে হবে।

যদি কোন ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু হয়ে যায়, তা হলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য বিরোধে জড়িত যে কোন পক্ষ শ্রম আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে পারবে। যদি কোন ধর্মঘট বা লক-আউট ত্রিশ দিনের বেশী স্থায়ী হয়, তা হলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। তবে সরকার উক্ত ত্রিশ দিনের পূর্বেও যে কোন সময়ে, লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে যদি সরকার মনে করে যে, উক্তরূপ অব্যাহত ধর্মঘট বা লক-আউট জনজীবনে সাংঘাতিক কষ্টের কারণ হয়েছে অথবা তা জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।

জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা পরে যে কোন সময়, লিখিত আদেশ দ্বারা সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। সরকার কর্তৃক কোন ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সরকার তৎক্ষণাৎ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে প্রেরণ করবেন। শ্রম আদালত বিরোধের উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব, প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে রোয়েদাদ প্রদান করবেন। তবে আদালত কর্তৃক, রোয়েদাদ প্রদানে কোন বিলম্বের কারণে রোয়েদাদ অবৈধ হবে না। শ্রম আদালতের কোন রোয়েদাদ এর মেয়াদ হবে অনধিক দুই বছর। যদি কোন প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপিত হয়, অথবা বিদেশী মালিকানাধীন হয়, অথবা বিদেশী সহযোগিতায় স্থাপিত হয়, তা হলে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু হওয়ার পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত ধর্মঘট কিংবা লক-আউট করা যাবে না। তবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে, উত্থিত কোন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হবে।

শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির সময়কাল (Time line for industrial dispute resolution):

ক্রমিক	প্রক্রিয়া	অন্তর্বর্তীকালীণ ধাপ	সর্বোচ্চ সময় সীমা	
০১	আপোষনামা (Negotiation)	যৌথ দরকষাকষি সভা	১৫ দিন	
		আপোষনামার জন্য সময়কাল	৩০ দিন*	
		আপোষনামার জন্য মোট সময়		৪৫ দিন
০২	সালিসী (Conciliation)	সালিসী প্রক্রিয়া গ্রহণ	১৫ দিন	
		সালিশীর জন্য সময়কাল	৩০দিন*	
		সালিস কার্যক্রম ব্যর্থ তার সনদ	০৩ দিন	
		সালিশীর জন্য মোট সময়		৪৮ দিন
০৩	মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator)	মধ্যস্থতার জন্য মোট সময়		৩০ দিন*
০৪	বিচারকার্য Adjudication	শ্রম আদালতে আবেদনের জন্য সময়কাল	১৫ দিন	
		শ্রম আদালত কর্তৃক বিরোধটির রোয়েদাদের সময়কাল	৬০ দিন**	
		শ্রম আদালতের জন্য মোট সময়		৭৫ দিন
		শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করার জন্য সময়কাল	৬০ দিন	
		শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তর জন্য সময়কাল	৬০ দিন**	
		শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের জন্য মোট সময়		১২০ দিন
		সর্বমোট সময়:	**মধ্যস্থতার জন্য (৪৫+৪৫ +৩০) ১২০ দিন**	**বিচারকার্যের জন্য (৪৫+৪৮ +৭৫+১২০) ২৮৮ দিন**

* পক্ষদ্বয় এর ঐক্যমতের ভিত্তিতে সময় বৃদ্ধি করা যাবে।

** রোয়েদাদ/সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্বের কারণে তা অবৈধ হবে না।

শিল্প বিরোধ ক্ষান্তি (Cessation of Industrial dispute):

(১) শিল্প বিরোধ উস্থাপনকারী পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিরোধটি সালিসীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সালিসের নিকট অনুরোধ পাঠাতে ব্যর্থ হলে।

(২) নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু করতে ব্যর্থ হলে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে প্রেরণ করতে, অথবা ধর্মঘটে বা লক-আউটের নোটিশ জারী করতে ব্যর্থ হলে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন শিল্প বিরোধ ক্ষান্তি হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে উক্ত শান্তির তারিখ হতে এক বৎসরের মধ্যে একই বিষয়ের উপর কোন নতুন দাবীনামা উত্থাপন করা যাবে না।

Adjudication (বিচারকার্য):

কোন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা কোন মালিক অথবা কোন শ্রমিক এই রোয়েদাদ বা কোন নিষ্পত্তি বা চুক্তির অধীন প্রদত্ত কোন অধিকার প্রয়োগের জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন।

দণ্ড (Penalty):

(১) কোন ব্যক্তি নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ ভঙ্গ করলে ০১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(২) নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাস্তবায়নের জন্য দায়ি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

(৩) সালিশের সন্তোষমত ব্যতীত সালিসী কার্যক্রমে পক্ষগণ উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে ০৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা ২,০০০/- টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ (Obstacls):

০১। বিরোধের বিষয়ে কোথায় আবেদন করতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকা;
০২। আবেদনের কোন Standard Format না থাকা;
০৩। Anti Union Resolution এর ক্ষেত্রে কোন SOP's (Standard Operating Procedure) না থাকা;
০৪। অভিযোগ পাওয়ার পর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার মতামত নেয়া;
০৫। মতামত পাওয়ার পর সরেজমিনে তদন্ত করার ক্ষেত্রে (Stake Holder) অংশীজনের অসহযোগিতা;
০৬। Anti Union Discriminataion বিষয়টির উপর স্পষ্ট ধারনা না থাকা;
০৭। বিরোধের বিষয়ে অর্থাৎ অভিযোগে বিস্তারীত উল্লেখ না করা;
০৮। বিরোধের বিষয়ে তথ্য গোপন করা বা সঠিক তথ্য প্রদান না করা;
০৯। এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ না করা;
১০। Anti Union Discriminataion সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করতে না পারা;
১১। মামলা দায়ের সম্পর্কে ধারনা না থাকা;
১২। দণ্ড সম্পর্কে অবহিত না থাকা;
১৩। বিরোধ শ্রেণি বিন্যাস করার বিষয়টি বুঝতে না পারা;
১৪। এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন ও শিল্প বিরোধ সম্পর্কে ধারনা না থাকা;
১৫। ধর্মঘট/লক আউট সম্পর্কে ধারনা না থাকা;
১৬। প্রতিকার কারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অবগত না থাকা;
১৭। বিরোধ ক্ষান্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা;
১৮। Dispute resolution এর ক্ষেত্রে কোন SOP's (Standard Operating Procedure) না থাকা।

প্রতিকার (Remedy):

০১। অংশী জনের (Stake holder) মধ্যে সচেতনতা তৈরী (Awarness build up) করা;

০২। মালিক, শ্রমিক এবং সরকার পক্ষের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা;

০৩। SOP's (Standard Operating Procedure) তৈরী করা;

০৪। Social dialogue (সামাজিক সংলাপ) এর বিস্তর ঘটানো;

০৫। Work place cooperation (কর্মস্থলে সহযোগিতা) শক্তিশালী করা;

০৬। মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক বুঝার সম্পর্ক এর মাত্রা আরও উন্নত করা

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

নারী শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন

মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গার্মেন্টস, দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ এখন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। অফিস আদালত থেকে শুরু করে পাথর ভাঙার মতো কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সব ধরনের কাজই করছে নারী শ্রমিকরা। বাংলাদেশের মোট জনশক্তির বিরাট সংখ্যক নারী শ্রমিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে গার্মেন্টস, সুতাকল, ধানকল, চাতাল, চিংড়ি প্রকল্প, ওষুধ ফ্যাক্টরী, চা বাগান, ব্যাংক বীমাসহ অন্যান্য সার্ভিস সেক্টর সমূহ এবং নির্মাণ শিল্প, হস্তশিল্প, গৃহভিত্তিক কাজ ইত্যাদি অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জীবন ও জীবিকার স্বার্থে এসকল নারীর শ্রমে শুধু তাদের পরিবারই উপকৃত হচ্ছে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তারা একটা বড় ভূমিকা রাখছে। পরিবারে একটু হলেও আয় বাড়ছে। বাল্য বিবাহ, কিশোরী মা হওয়া কমছে। কমছে শিশু জন্মহার। শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি সরকারি সকল কর্মসূচির সফলতায় ভূমিকা রাখছে এ নারীই। নারীর ইচ্ছা, পছন্দ ও ভালোলাগার এখন গুরুত্ব বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্ট্যাটিসটিকস এর অফিসিয়াল হিসাব অনুযায়ী দেশে সিভিল শ্রমশক্তি ৪৯.৫ মিলিয়ন যার মধ্যে ৪৭.৪ মিলিয়ন বর্তমানে কর্মরত আছে। বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনুপাত প্রায় ১৫ঃ৮৫ এবং সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরগুলোর অনুপাত ৩০ঃ৭০। ৪৭.৪ মিলিয়ন কর্মরত শ্রমশক্তির মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ৩৬.১ এবং নারীশ্রমিক ১১.৩ মিলিয়ন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু নারী-পুরুষ অসমতা এখনো বিদ্যমান রয়েছে এ কারণে যে, ব্যাপক সংখ্যক নারী ও পুরুষ এ অধিকার সম্পর্কে অবহিত নয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন -২০০৬ এ আইনগত রক্ষার কথা থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নারীর কথা বলার সুযোগের অভাব থাকায় নারীদেরকে প্রতিনিয়ত কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, দেশে মোট শ্রমশক্তির মধ্য থেকে হাতে গোনা কিছু সংখ্যক নারী ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত।

যদি সত্যিকার অর্থের নারী-পুরুষে সমতা আনয়ন করতে হয় তাহলে নারী-পুরুষ বৈষম্যের যে সমস্ত ইস্যু বা সমস্যা ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে নারী-পুরুষদের সচেতন করা প্রয়োজন। সাধারণত: জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়েরই মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমান নারী-পুরুষ ভারসাম্যহীনতা, নারীর অবস্থানগত দূরাবস্থা ইত্যাদির জন্য এ অজ্ঞতা ব্যাপকভাবে দায়ী।

শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত ও গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত সংগঠনকে খুব সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যে কোনো পেশায় কর্মরত শ্রমিকদের বর্ণ, গোত্র ও জেন্ডার বিশেষে সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়া এবং এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। কাজেই ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নারী শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করা একটি অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে ৯০% নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিক সংগঠিত হলে একদিকে যেমন তাদের সংগঠিত শক্তির বলে কর্মস্থলের সমস্যা-বঞ্চনা, বৈষম্য, হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে তেমনি ট্রেড ইউনিয়নে সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী হবে, সংগঠনের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ট্রেড ইউনিয়নে নারী-পুরুষে ভারসাম্য আনয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে ও এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুর সফলতায়ও সংগঠিত নারী শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে।

ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে তা কেবল পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। নগণ্য সংখ্যক নারী ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করছে এবং যারা যোগদান করেছে তারাও সক্রিয়ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে না। তার প্রধান প্রধান কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। পারিবারিক দায়িত্ব: যেমন শিশুর যত্ন এবং ঘরের অধিকাংশ কাজ মহিলাদের জন্য প্রধানতঃ রেখে দেয়া হয়। এর অর্থ হচ্ছে, যেসকল নারী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় তারা ত্রিমুখী কাজের বোঝার সম্মুখীন যথা- নিজের কাজ, পারিবারিক দায়িত্ব ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে।

২। কাজের বিভাজন: কর্মক্ষেত্রে কোথাও কোথাও নারী শ্রমিকদের মাঝে মাঝে পুরুষদের সহযোগি পদে নিয়োগ দেয়া হয় কিংবা নিচের গ্রেডে নারীদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়, যার ফলে পুরুষদের সেখানে অনেক কর্তৃত্ব থাকে যা নারীদের থাকে না। ইউনিয়নের কাঠামোতেও যোগ্যতা ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে নারীগণ অগ্রসর হতে বাধাগ্রস্ত হয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক নারী ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি বা যৌথ দরকষাকষির টিমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

সাধারণত: নারী শ্রমিকগণ বিশ্বাস করেন যে, তাদের পশ্চাদপদতার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে সময়ের অভাব, সহযোগিতার অভাব এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে নারীর প্রতিনিধিত্ব না থাকা ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের পথে একটি বাধা এবং এ বাধা অবশ্যই দূর করতে হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অধিক সংখ্যক হারে অবস্থান না থাকায় তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার পথে এখনো অনেক বড় বাধা। ট্রেড ইউনিয়নে নারীর কম অংশগ্রহণ করার প্রধান প্রধান কারণগুলো হচ্ছে, মালিক বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাকুরির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভীতি, পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীদের প্রচলিত ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা ও মনোভাব, নারীদের নিজস্ব উদ্যোগের স্বল্পতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে স্ত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বামীদের আপত্তি, শিশুদের যত্ন নেওয়ার সুযোগ সুবিধার অভাব, পুরুষ-নারী সহকর্মীদের কাছ থেকে উৎসাহের অভাব, নেতৃত্বের দক্ষতার অভাব এবং এ ভয়ে ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণে অনিচ্ছা যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো হয়তো তাকে অনেক খাটাবে বা পরিশ্রম করতে বলবে। যাহোক ট্রেড ইউনিয়নকে আরো অধিক জেন্ডার সচেতন হতে হবে এবং নারী শ্রমিকদের সমস্যা বিষয়ে আরো অধিক যত্নবান ও সুনির্দিষ্টভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কাজে নারীদের যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করার জন্য পুরুষদের তুলনায় তাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করা প্রয়োজন। উক্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ট্রেড ইউনিয়ন নারীদের চাকুরীতে নিয়োগের নীতিমালা, মজুরি স্তর, পদোন্নতি, ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং যার ফলশ্রুতিতে নারীদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারসাম্য আনয়ন সম্ভব।

আসুন, নারীর জন্য নিরাপদ, মর্যাদাকর, বৈষম্যহীন কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সকলে মিলে একযোগে কাজ করি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ, মর্যাদাকর সমাজ এবং রাষ্ট্র উপহার দেই।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রম আইনে শ্রমিকের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী

মোঃ বেলায়েত হোসেন
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট
সহ-সভাপতি
লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন, ঢাকা।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণের নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি ২০০৬ সনের শ্রম আইন অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব চাকুরী বিধি থাকিতে পারিবে। চাকুরী বিধি অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক মহা-পরিদর্শকের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং মহা-পরিদর্শক উহা প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিবেচনায় যথাযথ আদেশ প্রদান করিবেন। মহা-পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতীত কোন চাকুরি বিধি কার্যকর করা যাইবে না। মহা-পরিদর্শকের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে সরকারের আদেশ চূড়ান্ত হইবে। তবে সরকারের মালিকানাধীন, ব্যবস্থাপনাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

শ্রমিকদের শ্রেণি বিভাগ এবং শিক্ষানবিশীকালঃ-

কাজের ধরণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রমিকগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইবে। যথাঃ- (ক) শিক্ষাধীন (খ) বদলী (গ) সাময়িক (ঘ) অস্থায়ী (ঙ) শিক্ষানবিস (চ) স্থায়ী ও (ছ) মৌসুমী শ্রমিক।

কোন শ্রমিককে শিক্ষাধীন শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তাহার নিয়োগ প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে হয় এবং প্রশিক্ষণকালে তাহাকে ভাতা প্রদান করা হয়। কোন শ্রমিককে বদলী শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তাহাকে কোন স্থায়ী শ্রমিক বা শিক্ষানবিসের পদে তাহাদের সাময়িক অনুপস্থিতিকালীন সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কোন শ্রমিককে সাময়িক শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তাহার নিয়োগ সাময়িক ধরনের হয়। কোন শ্রমিককে অস্থায়ী শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তাহার নিয়োগ এমন কোন কাজের জন্য অস্থায়ী ধরনের বা সীমিত সময়ের জন্য হয়। কোন শ্রমিককে শিক্ষানবিস শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী পদে তাহাকে আপাততঃ নিয়োগ করা হয় এবং তাহার শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত না হইয়া থাকে। স্থায়ী শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তাহাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় বা তিনি শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করিয়া থাকেন। কেরানী সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের শিক্ষানবিসকাল হইবে ছয় মাস এবং অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য এই সময় হইবে তিন মাস। তবে শর্ত থাকে যে একজন দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাহার শিক্ষানবিসকাল আর ও তিন মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোন কারনে প্রথম তিন মাস শিক্ষানবিসকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। যদি কোন শ্রমিকের চাকুরী তাহার শিক্ষানবিসকালে, বর্ধিত সময়সহ, অবসান হয় এবং ইহার পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি একই মালিক কর্তৃক পুনরায় নিযুক্ত হন তাহা হইলে তিনি, যদি না স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন, একজন শিক্ষানবিস হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার নতুন শিক্ষানবিসকাল গননার ক্ষেত্রে পূর্বের শিক্ষানবিসকাল হিসাবে আনা হইবে। যদি কোন স্থায়ী শ্রমিক কোন নতুন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত হন তাহা হইলে তাহার শিক্ষানবিসকালে যেকোন সময় তাহাকে পূর্বের স্থায়ী পদে ফেরত আনা যাইবে।

কোন মালিক নিয়োগপত্র প্রদান না করিয়া কোন শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারিবেন না এবং নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক মালিক তাহার নিজস্ব খরচে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য একটি সার্ভিস বই এর ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক সার্ভিস বই মালিকের হেফাজতে থাকিবে। কোন শ্রমিককে নিয়োগ করার পূর্বে মালিক তাহার নিকট হইতে পূর্বেকার সার্ভিস বই তলব করিবেন যদি উক্ত শ্রমিক দাবী করেন যে, তিনি ইতিপূর্বে অন্য কোন মালিকের অধীনে চাকুরী করিয়াছেন। যদি উক্ত শ্রমিকের কোন সার্ভিস বই থাকে তাহা হইলে তিনি উহা নতুন মালিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং নতুন মালিক তাহাকে রসিদ প্রদান করিয়া সার্ভিস বইটি নিজ হেফাজতে রাখিবেন। যদি উক্ত শ্রমিকের কোন সার্ভিস বই না থাকে তাহা হইলে সার্ভিস বইয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন শ্রমিক সার্ভিস বইয়ের একটি কপি নিজে সংরক্ষণ করিতে চাহেন তাহা হইলে নিজ খরচে তিনি তাহা করিতে পারিবেন। কোন শ্রমিকের চাকুরি অবসান কালে মালিক তাহার সার্ভিস বই ফেরত দিবেন। যদি ফেরতকৃত কোন সার্ভিস বই বা সার্ভিস বইয়ের কোন কপি শ্রমিক হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে মালিক, শ্রমিকের খরচে তাহাকে সার্ভিস বইয়ের একটি কপি সরবরাহ করিবেন। উল্লেখিত কোন কিছুই শিক্ষাধীন, বদলী বা সাময়িক শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন, গণতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
যুগ্ম শ্রম পরিচালক(অতিরিক্ত দায়িত্ব),
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম।

ভূমিকাঃ সমাজের খেঁটে খাওয়া মানুষগুলো যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিরলসভাবে তাদের শ্রম দিয়ে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে চলেছে তারাই হলো শ্রমিক। পৃথিবীর সৃষ্টির পর হতে মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের উন্নয়নের পুরো কৃতিত্বের দাবিদার যে মনুষ্য সমাজ তারাই শ্রমিক। আজো দেশে দেশে শ্রমিক নির্যাতন এবং শ্রমিকদের ন্যায় সংগত অধিকার না দেয়ার খবর পাওয়া যায়। তবু শ্রম, শ্রমিকদের নিয়ে একটি সার্বজনীন জগৎ গড়ে উঠেছে। আর তার পিছনে যাদের রক্ত, শ্রম, ঘাম আর অশ্রু মিশে আছে তারা হলেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ শ্রমিক, কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। ডি.ইয়োডরের মতে ট্রেড ইউনিয়ন হলো ''শ্রমিকদের নিরবিচ্ছিন্ন দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন বা কাজের সাথে সম্পর্কিত সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত''। বর্তমান সময়ে শ্রমিকগণ যতটুকু আইনগত অধিকার পাচ্ছে, তার শুরুটা ছিল কন্টকাকীর্ণ। পৃথিবীর শ্রমিকগণ আজো ভুলেনি ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টা করার দাবীতে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে সংগঠিত শ্রমিকদের উপর পুলিশের বুলেটের আক্রমনে রাজপথ শ্রমিকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হওয়ার স্মৃতি। শ্রমিকের প্রাণ কেড়ে নেয়া হয় সাজানো প্রহসনমূলক বিচারের রায়ে ফাঁসির মাধ্যমে। পরবর্তীতে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ অব নেশনস এর সাথে আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে ''১ মে'' কে 'আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা শ্রমিক, মালিক, সরকার সর্বোপরি শ্রম ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ শ্রম আইনঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন-শ্রমিকগণ ও মালিকগণকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। শ্রমিকগণ ও মালিকগণ আইনের বিধান প্রতিপালন করে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারে। সরকার ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর এবং সেই সাথে শ্রম পরিদপ্তর শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে, একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন আবেদনকারীগণ আবেদন এবং যাচিত তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদানুসারে পর্যাপ্ত রেকর্ডপত্র প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া আরো দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যভূক্তি ফরম ৫৫(ক) আবেদন ফরমে চাহিত সকল তথ্য প্রদান এবং প্রদত্ত তথ্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, রেকর্ড রেজিষ্টার দিতে পারে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, প্রদত্ত আইডি কার্ড ঘষামাঝা করা হয়, একই আইডি কার্ড ব্যবহার করে একাধিক সদস্যভূক্তি দেখানো হয়। অনেকের আইডি কার্ড দেয়া হয়না। অনেকের স্বাক্ষরের সাথে কর্মরত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল থাকে না। প্রদর্শিত অনেক সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্ম নেই বলেও দেখা যায়। যার কারণে রেজিষ্ট্রারের স্বদিচ্ছা থাকলেও রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনকারীকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা যায় না। তবে যারা আইন মোতাবেক সকল শর্তাদি পূরণ করে, সে সকল ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে আবেদনকারী ট্রেড ইউনিয়ন এর সভাপতি/সাধারন সম্পাদক এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ফেডারেশন সমূহের সভাপতি/সাধারন সম্পাদকদের দাবী হলো ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে যাচাই বাছাই না করে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা। যা আসলে আইনানুগ কাজ করার স্বার্থে মেনে নেয়া যায়না। রেজিষ্ট্রারের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে শ্রম আদালতে আপীল করার ব্যবস্থা শ্রম আইনে বিদ্যমান। আমাদের সকলকেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ জানতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধানে জনগনের সভা, সমিতি, সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট আই.এল.ও. কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতন্ত্রঃ আব্রাহাম লিংকনের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো-Democracy is the of people, for the people and by the people. জনগণের জন্য গণতন্ত্র আর ট্রেড ইউনিয়নের গণতন্ত্র হলো শ্রমিকদের জন্য গণতন্ত্র। গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি শ্রমিকগণ আইন ও ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়ন কার্য্যক্রম পরিচালনা করবে। কিন্তু দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়নের একটি নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত সময়ের পরও কমিটিতে থাকতে চায়, গোপন ব্যালটে নির্বাচন করতে চায় না, যোগসাজশে সিলেকশন কমিটি গঠন করে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করতে চায়। যার কারণে ট্রেড ইউনিয়নে নতুন নেতৃত্ব বিকশিত হয় না, বাধাগ্রস্থ হয়। আরো দেখা যায় নেতৃত্ব ধরে রাখতে গিয়ে একই ইউনিয়নে একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাহী কমিটিতে একবার আসার পরও ঘুরে ফিরে আবারো কমিটিতে থাকার প্রতিযোগিতা চলে, ফলে লংঘিত হয় শ্রমিকদের ন্যায় সংগত অধিকার। আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে উত্তোরণ করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিফলন ঘটলেই শ্রমিকদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকঃ যখনই প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে- তখন থেকেই শ্রমিক মালিক সম্পর্ক বিদ্যমান। যদিও আগের চেয়ে বর্তমান শ্রমিক মালিক সম্পর্ক অনেক বেশি বিশ্বাস নির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক। যার মূলে রয়েছে শ্রমিক সংগঠন গুলোর নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করে দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে সোচ্চার হওয়া এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক বিশেষ ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ব্যবস্থাপনায় কার্যকর অংশগ্রহণ। কিন্তু বরাবরই প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিষয়ে মালিকগণ উদ্বিগ্ন ও আতংকিত অবস্থায় থাকে। মালিক মনে করে- প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত হবে, কারণে অকারণে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দাবী উত্থাপন করে সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং প্রশাসনিক নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে যার কারণে এই ভেবে মালিক সবসময় চায়- প্রতিষ্ঠান ইউনিয়নমুক্ত থাকুক এবং শ্রমিকগণ সরাসরি তাদের সমস্যার কথা মালিককে বলুক। শ্রমিকদের দাবী হলো মালিক শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করুক। তবে এও দেখা যায় আইনে নির্ধারিত পন্থায় শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পর মালিক তা মেনে নেয়। তবে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা বিষয়ে মালিকদের আরো উদার ও সহযোগিতা মূলক পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। পারস্পারিক বোঝাপাড়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারঃ সরকার শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন'২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা'২০১৫ বাস্তবায়ন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছে এবং শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পুরো প্রক্রিয়া জোরালোভাবে গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ একটি কার্যকর এবং স্থিতিশীল শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং আই.এল.ও'র সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে আই.এল.ও. সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার, শ্রমিক ও মালিক সকলকে সার্বিক সহযোগিতা করে চলেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সর্ম্পকঃ শিল্প সম্পর্ক বলতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে বুঝায়। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের উপর সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন নির্ভর করে। মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা একত্রিত হয় নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য, আর একই সংগে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় মালিকরাও একত্রিত হয়। কিন্তু উভয়ই একক নয়, নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থক্ষায় উভয়কেই একটা সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। শ্রমিক-মালিক সর্ম্পককে একটা যৌক্তিক ও আইনানুগ প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে চলেছে সরকার। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক - কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সরকার এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন যাতে মালিকদের সাথে একটা গঠনমূলক সুসর্ম্পকের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মূলতঃ সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক একটি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য খুব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ-শ্রমিকপক্ষ, মালিক পক্ষ এবং সরকার পক্ষ এই সকল পক্ষের মধ্যে পারস্পারিক আস্থা/বিশ্বাস ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। আইন দিয়ে সব কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ সকলের মধ্যে লালন ও পালন করা জরুরী। মানুষ হিসেবে মানুষকে মূল্যায়ন করা সময়ের দাবী। শ্রম পণ্য নয়, এ ধারনাকে সামনে রেখে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রাচীন যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়। যার যার অবস্থানে সবাই সবকিছু জানে ও বোঝে। এড়িয়ে যাওয়া বা ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে যাচ্ছে। শিল্পের সকল স্তরে সকলের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নেতৃত্বের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে গণতন্ত্র যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক সকলের কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে, নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে, শ্রম আইন জানতে হবে ও জানাতে হবে।

মালিক পক্ষকে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকদের আইনানুযায়ী অধিকার প্রদান করতে হবে এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের শুধুই শ্রমিক হিসাবে গণ্য না করে মানুষ হিসাবে গণ্য করলেই সম্পর্ক উন্নয়ন করা যাবে। শ্রমিক-মালিক পরস্পর শত্রু নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক-আস্থার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেই সাথে সরকারকে নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে মধ্যে একটা স্থায়ী আস্থার ভিত্তি স্থাপন করা যায়। মালিক-শ্রমিক-সরকার যার যার অবস্থান থেকে নিজ নিজ আইনানুগ দায়িত্ব পালন করলেই শ্রম ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

উপসংহারঃ মহান মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস, শ্রমিকদের রক্তে রাঙ্গানো ইতিহাস। বাংলাদেশে মে দিবস স্বীকৃতি পায় স্বাধীনতার পর। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতি বছর মহান মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। শ্রমিক সংগঠন গুলোও মহা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান মে দিবস পালন করে থাকে। মে দিবস একই সাথে বেদনার, বিজয় উৎসবের ও সংগ্রামী শপথ নেয়ার দিন। মহান মে দিবসকে সুষ্ঠু শিল্প সর্ম্পক ও গণতান্ত্রিক চর্চার উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক-যেমন হবে মধুর, তেমনি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কও হতে হবে অর্থপূর্ণ এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। আজ থেকে ১৩১ বছর আগে শিকাগোর "হে মার্কেট স্কোয়ার" যে রক্ত গোলাপ বিকশিত হয়েছিল তার সৌরভে নিজেদেরকে সুরোভিত করতে হবে। মানুষ মানুষের জন্য। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকেই আমরা পরের তরে- এ হোক মহান মে দিবসে আমাদের চাওয়া ও প্রত্যাশা।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রমজীবী সংগঠনসমূহ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ-শ্রম পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কিছু আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যেখানে শ্রমিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত, ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা নেই, সেখানেই শ্রমিকদের নিম্নোক্ত সংগঠনসমূহ সোচ্চার।

ডব্লিউআরসি:

ডব্লিউআরসি হচ্ছে ওয়ার্কার্স রাইট কনসোর্টিয়াম। ২০০১ সাল থেকে সব শ্রমিক বিশেষত পোশাক শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসে নতুন সংগঠন ওয়ার্কার্স রাইট কনসোর্টিয়াম (ডব্লিউআরসি)। এ সংগঠনের উদ্যোক্তা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম বা পোশাক আসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। অথচ ছাত্রছাত্রীরা জানত না তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোগো বসিয়ে যে পোশাক গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করে, কেমন আছে সেই গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা।

WRC
Worker Rights Consortium

তাই ডব্লিউআরসি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পোশাকসহ অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে, তাদের অবস্থা অনুসন্ধান ও প্রকাশ, কারখানায় যে কোনো শোষণ বা অন্যায় বন্ধ করা এবং শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে অতিরিক্ত শ্রম বা ওভারটাইম রোধ করা, শিশুশ্রম বন্ধ করা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ দূর করা, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা ইত্যাদি। সংগঠনটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। যেসব ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের ওপর অবিচার করা হয়, তাদের পণ্য কোনো ব্র্যান্ড শপ বা ইউরোপের বাজারজাত রোধ করতেও ভূমিকা রাখে ডব্লিউআরসি।

সিসিসি:

সিসিসি হচ্ছে ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন। ১৯৮৯ সালের কথা। নেদারল্যান্ডসের ঝলমলে মার্কেট, সুপার শপ, মেগাশপ আর ব্র্যান্ডেড শপের মালিকরা জানতেন না কোথায় কি পরিবেশে তৈরি হচ্ছে তাদের দোকানের বাহারি সব পোশাক। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইনের (সিসিসি) জন্ম। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য নারী শ্রমিক অধ্যুষিত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং শ্রমিকদের ওপর যেকোনো ধরনের অন্যায় প্রতিহত করা। বিভিন্ন দেশে ভোক্তা সংগঠন, নারী সংগঠন,

Clean
Clothes
Campaign

CCC Ireland

ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংগঠন এবং এনজিওদের নিয়ে এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কাজ করে সিসিসি। এ ধরনের প্রায় ৩০০ টি সংগঠন বর্তমানে সিসিসি এর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে সংগঠনটি ক্রেতা বা ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে দৃষ্টি দিয়েছে। এর মধ্য দিয়েই তাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ পোশাক কারখানায় নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং যে কোন অন্যায় রোধে সচেষ্ট রয়েছে সিসিসি।

আইএলও:

আইএলও হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৯১৯ সালে ভার্সাইল চুক্তি অনুসারে। এ চুক্তির অংশ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) জন্মলাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতারা অনুধাবন করেন সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। আর সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো শ্রমিক। সুতরাং শ্রমিকরা যদি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সমাজে শান্তির পরিবর্তে সংঘাত আসতে বাধ্য। এ অনুধাবন থেকেই জন্ম নেয় লিগ অব ন্যাশনস যা পরবর্তীতে বর্তমান জাতিসংঘে রূপ নেয়। আর লিগ অব

ILO

ন্যাশনস তথা জাতিসংঘের একটি এজেন্সি হিসেবে এগিয়ে চলছে আইএলও। জাতিসংঘের প্রায় সবকটি সদস্য দেশ আইএলওর সদস্য। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদর দফতর অবস্থিত। জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন থেকে আইএলওর সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা ভিন্ন। সরকার, মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি দ্বারা আইএলও পরিচালিত হয়। বর্তমানে আইএলও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় নানা ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তৎপরতার মধ্যে রয়েছে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ কাজের সময় নির্ধারণ, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, যে কোনো বিপদ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা, শিশু-কিশোর ও নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, মজুরির ক্ষেত্রে সমতা বিধান, শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণে সহায়তা করা ইত্যাদি। জন্মলগ্ন থেকে আইএলওকে নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক দেশের সরকারই আইএলওর কর্মপরিধি ও এখতিয়ারের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অনেকেই আইএলওর নির্দেশনা বা পরামর্শ মেনে চলাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল মনে করেন। মাঝে মামলা-মোকদ্দমাও কম হয়নি। এমনকি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস পর্যন্ত গড়ায় কোনো কোনো বিষয়। তবে কোনোকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি আইএলওর অগ্রযাত্রাকে। জেনেভার সদর দফতরে গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে শ্রমিক স্বার্থরক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিপুলসংখ্যক বই, লিফলেট, পোস্টার, গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সরেজমিন কাজ করার জন্য রয়েছে আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং দেশে দেশে রয়েছে কান্ট্রি অফিস। শ্রমিক স্বার্থরক্ষায় আইএলও আজ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। শ্রেণিসংঘাত ঘুচিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৬৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে আইএলও।

এফডব্লিউএফ:

এফডব্লিউএফ হচ্ছে ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন। ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন (এফডব্লিউএফ) নেদারল্যান্ডসভিত্তিক একটি স্বাধীন অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনটি কোম্পানি এবং পোশাক তৈরির কারখানাগুলোকে পোশাক শ্রমিকদের জন্য উন্নত কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে এ সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ৮০টি সদস্য কোম্পানি ১২০টি ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি করে।

আরও ৮০টির বেশি দেশের ২০ হাজার আউটলেট বা দোকানে বিক্রি হয় এই পোশাক। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার ১৫টি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশে এফডব্লিউএফের কার্যক্রম বিস্তৃত। মূলত পোশাক তৈরি কারখানাগুলো শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণে যে পদক্ষেপ নেয়, তা বেগবান ও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট এফডব্লিউএফ। এ লক্ষ্যে আটটি ধারা বা কোড অব কন্ডাক্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: স্বেচ্ছায় চাকরিতে যোগদান, বৈষম্যহীন চাকরি, শিশুশ্রম বন্ধ করা, সংগঠন করার অধিকার, ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি, অতিরিক্ত পরিশ্রম রোধ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি এবং আইনসম্মতভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টি ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এফডব্লিউএফ পোশাক শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সাভারের রানা প্লাজায় সাম্প্রতিক ধ্বস এবং পোশাক শ্রমিকদের ক্ষয়ক্ষতি তাদের ওয়েবসাইটে দুঃখ ও সমবেদনা জানিয়েছে এফডব্লিউএফ।

বিআইএলএস:

বিআইএলএস হচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বা বিলস নামে বেশি পরিচিত। শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সহায়তা করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট থাকে বিলস। বর্তমানে দেশের ১৩টি প্রধান

শ্রমিক সংগঠন বিলসের সঙ্গে জড়িত। বিলস বিশ্বাস করে, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। যাতে তারা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে পরিচালিত বিলসের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, তথ্য আদান-প্রদান ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষা। বিলস একদিকে ন্যায়সঙ্গত এবং শ্রমিকবান্ধব নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করে, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে

সুশীল সমাজ ও সরকারের সেতুবন্ধন রচনায় সহায়তা করে। দেশ-বিদেশের একাধিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিলসের কার্যক্রম বা প্রকল্প পরিচালিত হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে ডেনমার্কের [illegible]- এর সহায়তায় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নীতি-নির্ধারণে সহায়তাভিত্তিক প্রকল্প, যুক্তরাজ্যভিত্তিক [illegible] [illegible]য়তায় সমাজের ব্যাপক অংশকে ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আনা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ রোধ প্রকল্প ইত্যাদি। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্নভাবে পোশাক শ্রমিক, চিংড়ি ঘেরের শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, নারী শ্রমিক, শিশু শ্রমিকদের জন্য বিলসের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। আর সর্বক্ষেত্রে বিলসের রয়েছে বিদেশি একাধিক দূতাবাস ও সাহায্য সংস্থা।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

সোশ্যাল ডায়ালগ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত

মিতসু শাওলিন
উপ-শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর, ঢাকা।

প্রারম্ভিকাঃ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষে সামাজিক পক্ষগুলোর মধ্যে চলমান পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়াই হলো সোশ্যাল ডায়ালগ। আরো সহজভাবে সোশ্যাল ডায়ালগ বলতে সামাজিক পক্ষসমূহ এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নকে বোঝায়।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে সুশাসনের জন্য সোশ্যাল ডায়ালগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার ও Competetive Economy এর জন্য সোশ্যাল ডায়ালগের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সরকার, শ্রমিক ও মালিকের বৈরী সম্পর্ক কখনো কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না। সোশ্যাল ডায়ালগের মাধ্যমে এই তিন স্টেক হোল্ডারকে এক সিদ্ধান্তে উপনীত করা সম্ভব।

Social dialogue as defined by the ILO includes all types of negotiations and consultations or simply exchange of information between among representatives of government, employer and workers on issues of common interests relating to economic & social policies. However, the definition and concept of Social dialogue varies across countries and region.

সামাজিক সংলাপের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শক্তিশালী শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের প্রয়োজন। সামাজিক সংলাপের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা ও অঙ্গীকার এবং সংগঠনের বা ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতায় পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে।

সোশ্যাল ডায়ালগের ধরণ ঃ নিম্নোক্ত তিন ধরনের সোশ্যাল ডায়ালগ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বি-পাক্ষিক সোশ্যাল ডায়ালগঃ এটা সাধারণত সেক্টর ভিত্তিক হয়। কোন সেক্টরে শ্রমিকের বেতন, কর্মসময়, কর্মপরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ডায়ালগই দ্বিপাক্ষিক সোশ্যাল ডায়ালগ।

ত্রি-পাক্ষিক সোশ্যাল ডায়ালগঃ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ব্যর্থ হলে তখন ত্রিপাক্ষিক সোশ্যাল ডায়ালগের প্রয়োজন হয়। এটা কোন নির্দিষ্ট সেক্টরে বা কয়েকটা সেক্টরকে একসাথে করে নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে অনুষ্ঠিত সামাজিক সংলাপ।

ত্রি-পাক্ষিক প্লাস সোশ্যাল মিডিয়াঃ তিন পক্ষের বেশী স্টেক হোল্ডার যখন নির্দিষ্ট কোন ইস্যুতে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেটা ত্রি-পক্ষীয় প্লাস সোশ্যাল ডায়ালগ।

সোশ্যাল ডায়ালগ ও দঃ এশিয়াঃ

বর্তমানে ও সামনের দিনগুলোতে বিশ্বায়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে নেয়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবচেয়ে প্রয়োজন স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে সামাজিক সংলাপ। কিন্তু ইহা প্রমানিত সত্ত্বেও দঃ এশিয়া সামাজিক সংলাপ থেকে অনেক দূরে। কিছু দেশে সংগঠনের স্বাধীনতা নেই, কিছু দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যা কমে গেছে আবার কিছু দেশে শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানগুলো দূর্বল হয়ে গেছে।

আই.এল.ও এর দৃষ্টিতে Decent work এর অখন্ড উপাদান হলো সোশ্যাল ডায়ালগ। ILO এর ডাইরেক্টর জেনারেলের মতে Cohesive tripartism & Social dailogue is the ILO's bedrock. সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক সংলাপ কিছু দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে। যেমনঃ শ্রীলংকা এবং নেপাল। আই.এল.ও এর South Asia & Vietravn Project (SAVPOT) কারখানা লেভেলে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমাদের দেশেও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিদ্যমান।

সোশ্যাল ডায়ালগ ঃ জার্মানী প্রেক্ষাপট-

উপরোক্ত কাঠামোর মাধ্যমে জার্মানীতে সামাজি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সংলাপ এর মাধ্যমে কর্মঘন্টা, কর্মপরিবেশ, প্রতিঘন্টায় সর্বনিম্ন মজুরি, বিপর্যয়, আদর্শগত সংঘাত, রাজনৈতিক সমস্যাসহ উদ্ভূত সকল সমস্যা নিরসনে কাজ করে।

সোশ্যাল ডায়ালগ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহঃ

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে কেন্দ্রীয়ভাবে সুসংগঠিত শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠন বিদ্যমান। এসব দেশে তৃতীয় পক্ষের mediation ব্যতীত শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে চুক্তিতে উপনীত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানের প্রচলন বেশী।

জাপানে সোশ্যাল ডায়ালগঃ

জাপানে মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারন করে। জাপানীজ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (Rengo), জাপান বিজনেস ফেডারেশন (Nippon Keidanren) এবং জাপানের Ministry of Health, Labour & Welfare এর মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক সামাজিক সংলাপের প্রচলন রয়েছে।

সোশ্যাল ডায়ালগ এবং সিঙ্গাপুরঃ

ত্রি-পাক্ষিক সামাজিক সংলাপে শিল্প সম্পর্ক ইস্যুসমূহ সমাধানের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে শিল্প উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় অর্থনীতিতে বেতন কাঠামো নির্ধারনে সামাজিক সংলাপের অবদান সেখানে সবচেয়ে বেশী। স্বাধীনতার পূর্বে ইহার অর্থনীতি ছিল মূলত: সম্পূর্ণ বন্দর কেন্দ্রিক, যেখানে ছিল কম বেতন, উদ্বৃত্ত শ্রমিক ও কর্মসংস্থান সংকট। ১৯৬০ এর পরে ইহা আমদানি নির্ভর দেশ হতে রপ্তানি নির্ভর এবং কম দক্ষ শ্রমিকগণ কম বেতনে কর্মসংস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনিয়ন্ত্রিত বেতন বৃদ্ধি এক সময় শিল্প বিরোধে রূপ নেয়। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬০, শিল্প সম্পর্ক এ্যাক্ট ১৯৬৮ এবঙ ১৯৭২ সালে ত্রিপক্ষীয় জাতীয় বেতন কাউন্সিল (NWC) গঠন করে Labour Cost নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে Tripartite National Wages Council (NWC) হচ্ছে সোশ্যাল ডায়ালগের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমসাময়িক সিঙ্গাপুরে বেতন নির্ধারনে তাদের ভূমিকা অপরিসীম।

সোশ্যাল ডায়ালগ এবং ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোঃ

সমস্যা দূর করে সামাজিক সমঝোতা স্থাপনে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোতে সামাজিক সংলাপ এক শক্তিশালী মাধ্যম। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর শুরুতে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো সরকার অর্থনীতি পুর্নগঠনে মুক্তবাজার অর্থনীতির সূচনা করলে শ্রম বাজার এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ঐ সংকটকালীন সময় ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তখন সোশ্যাল ডায়ালগ আলোর পথ দেখায়।

ইউরোপে সোশ্যাল ডায়ালগঃ

বর্তমানে ইউরোপে সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধিক Decission making process হলো Social Dialogue. ২০০১ পর অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়াল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। এ প্রবৃদ্ধি ইউরোপের গড় প্রবৃদ্ধি হতে বেশি ছিল, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র থেকেও বেশী। কিন্তু ১৯৭০ এর পরে এবং ১৯৮০ এর শুরুতে অপর্যাপ্ত সোশ্যাল ডায়ালগের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীতে সেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাপকভাবে সোশ্যাল ডায়ালগের বিস্তৃতি ঘটানো হয়। ফলস্বরূপ, ইউরোপের এই ছোট দেশগুলো এহেন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়।

ইউরোপে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে কৃষিক্ষেত্রে বেতনভুক্ত কর্মসংস্থানের উন্নয়নে সোশ্যাল ডায়ালগ হয়। দ্বিপাক্ষিক এ ডায়ালগে মালিক পক্ষে Committee of Agricultural Organization in Europe (GEOPA/ COPA) এবং শ্রমিক পক্ষে The European Federation of Agricultural Workers Trade Unions of the European Trade Union Confederation (EFA/ETUC). এটাই ছিল ইউরোপ সোশ্যাল পার্টনারদের মধ্যে প্রথম Recommendation Frame Work agreement. এ চুক্তির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল কোন বাঁধা ছাড়াই জাতীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকলেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করে পারস্পরিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে শ্রমিক মালিক সরকার প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে শিল্পের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

সামাজিক সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য হ'লঃ

"বাড়তে দিলে দ্বন্দ্ব
কর্মস্থল হবে লন্ডভন্ড"

"দশে মিলে ভাবি আজ
কোন পথে হবে কাজ"

"যে কোন সমস্যা
আলোচনাতেই সমাধান"

মালিক-শ্রমিক পারস্পরিক বিভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলস কাজ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে এমনি একটি প্রত্যাশা আজকের এ মহান দিবসে।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবস ও বাংলাদেশ

রাজেকুজ্জামান রতন
সাধারণ সম্পাদক
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

গতিময় এই বস্তু ও সমাজ জীবনে কখনো আবর্তন কখনো বিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে অবিরাম । বস্তুজগত, মানবসমাজ ও চিন্তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। পাল্টে যাচ্ছে সবকিছু। হেরাক্লিতাস বলেছিলেন এক নদীতে দু'বার গোছল করা যায় না। ফলে একই রকম দেখতে মনে হলেও সব এক রকম থাকে না । পৃথিবী তার আপন অক্ষের উপর ঘুরে এলেও প্রতিদিনের সকাল এক নয়, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এলেও প্রতিবছর এক নয়। তাই মে দিবস প্রতিবছর এলেও একই তাৎপর্য নিয়ে আসে না। কিন্তু প্রতিবছর মে দিবসে আমরা পুরনো সেই সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করি নতুন সমস্যা সমাধানে যুক্তি, প্রেরনা ও শক্তি পাবার জন্য। এবছর মে দিবস এসেছে প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্যের এক জটিল পরিস্থিতিতে।

প্রকৃতির বস্তুসম্ভারে শ্রমের প্রয়োগ ঘটিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করেছে, জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে। আদিম মানুষ কঠিন পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়েছে, পাথরকে সুচালো করে হাতিয়ার বানিয়েছে, গুহাকে বাসগৃহ বানিয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে । আজকের রাস্তা ঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন, কলকারখানা সবইতো মানুষের শ্রম আর সংগ্রামের ফল। উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ শ্রম প্রয়োগ করেছে, শ্রম প্রয়োগ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছে, বস্তুকে পাল্টাতে গিয়ে নিজের চিন্তাকে পরিবর্তন করেছে, সমাজ সম্পর্ক গুলো ও পাল্টে গেছে প্রয়োজন অনুসারে। সমাজ কাঠামো গুলো পাল্টে গেছে, উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটেছে এভাবেই ।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে ১৭৮৯ সালে যে ফরাসি বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করলো, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁরা তাদের অঙ্গীকার ভুলে গেল। মালিক শ্রমিকে বিভক্ত সমাজে শ্রমিকের অধিকার বলে কিছু থাকলোনা। সম্পদ তৈরি হয় শ্রমিকের শ্রমে তাহলে শ্রমিকের জীবন কেন এত দুঃখময়? এ প্রশ্ন ভাবিয়েছে সকল চিন্তাশীল মানুষকেই। অ্যাডাম স্মিথ দেখালেন মুল্যতত্ত্ব, ডেভিড রিকাড়ডো দেখালেন শ্রমের মূল্যতত্ত্বের ফলে মানুষ বুঝলো শ্রমের ফলেই মুল্য তৈরি হয়। তাহলে এই মুল্যে শ্রমিকের অংশ কত এবং তার প্রাপ্য কতটুকু এ প্রশ্ন সঙ্গত কারনেই উত্থাপিত হতে থাকলো। শ্রমিক কতক্ষণ কাজ করবে এবং বিনিময়ে কি পাবে তা আলোচনা এবং আন্দোলনের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। নিজেদের সমস্যা উত্থাপন করা ও দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে শুরু করলো। ১৮২৭ সালে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে মেকানিক্স ইউনিয়ন অফ ফিলাদেলফিয়া ১০ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে । দাবিটা যৌক্তিক হলেও কাজটা এত সহজ ছিল না। কর্মঘণ্টা কমানোর দাবী যে মালিকদের মুনাফার উপর আঘাত হানবে সে সম্পর্কে মালিকরা সচেতন ছিল। ফলে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবী আপাত অর্থে নিরীহ দাবী হলেও মালিকরা নিষ্ঠুর হতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করেও আন্দোলন দিন দিন দানা বেঁধে উঠতে থাকলো। ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কে বেকারি শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় । এ সম্বন্ধে Workingmen's Advocate Report লিখেছিল, " Journeymen employed in a loaf bread business have for years been suffering worse than Egyptian bondage. They have had to labor on an average of eighteen to twenty hours out of the twenty-four ." ১৮৩৭ সালে ১০ ঘন্টা কর্মদিবস এর দাবী একটি আন্দোলনের দাবী হিসেবে শ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে । আমেরিকার বাইরেও এ দাবী উঠতে থাকে শুধু তাই নয় কেউ কেউ আরও অগ্রসর দাবী তুলতে থাকে। ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা " 8 hours work, 8 hours recreation, 8 hours rest" এ দাবী তোলে । ক্রমান্বয়ে এ দাবীতে শ্রমিকরা দেশে দেশে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে।

১৮৪৮ সালে লিখিত মেনিফেস্টো অফ দা কমিউনিস্ট পার্টি, ১৮৬৪ সালে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস এসোসিয়েশন যা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন , ১৮৭৫ সালে আমেরিকার খনি শ্রমিকদের আন্দোলন শ্রমিকদেরকে দাবী আদায়ে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সাহসী হয়ে উঠতে থাকে । ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটের যে রক্তাক্ত আন্দোলন মে দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেল তার ইতিহাস সবার জানা । শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ এবং মালিকরা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, প্রহসনমুলক বিচারে পার্সনস, স্পাইজ, এঙ্গেল, ফিশার এই চারজন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দিয়েছিল তা বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকদের সংহতি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল । ৮ ঘন্টা কাজের দাবী শুধু কর্মঘন্টা কমানোর দাবী নয় এর অন্তরালে ছিল ন্যায্য মজুরি পাওয়া ও সম্মানজনক জীবন যাপনের আকুতি । ১৮৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২য় ইন্টারন্যাশনালে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস এর প্রস্তাবনায় ১ মে কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

আজ আমরা যদি ইতিহাসের সেই দিনগুলোর কথা আবার একটু মনে করতে চাই তাহলে দেখবো শ্রম শোষণ ও অমানবিক কর্মপরিবেশের পরিবর্তে মানুষের জন্য উন্নততর সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিনের শ্রমিক নেতারা। ৭ আগস্ট ১৯৮৭ আদালতে অগাস্ট স্পাইজ আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আপনারা প্রতিবাদীর বিচার চান, আমি প্রতিবাদী। বিচার করুন। সম্মানিত বিচারক, আপনার রায় ঘোষণা করুন। বিশ্ববাসী জানুক ১৮৮৬ সালে ৮ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হলো, কারণ তারা স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য তাদের বিশ্বাস অটুট রেখেছিল।

....এবার আমার সাথে চলুন! এ শহরে যারা সম্পদ সৃষ্টি করেছে তাদের দেখবেন। হকিং উপত্যকার আধাপেট খেয়ে কাজ করে যাওয়া শ্রমিকদের দেখবেন, চলুন । মঙ্গাহেলা উপত্যকাসহ দেশের আরো অনেক এলাকায় নিম্নবর্গের মানুষগুলোকে দেখবেন চলুন। রেলের রাস্তা ধরে একবার হাঁটবেন, চলুন। আর তারপর আমাকে বলুন, যে নির্দেশ আজ আপনি উচ্চারণ করেছেন তা কার জন্য বা কিসের জন্য? এ নির্দেশ মানা হচ্ছে হাজার হাজার শিশু ও নারীকে কারখানার মধ্যে মেরে ফেলবার এক পদ্ধতিগত উদ্যোগ গ্রহন। এর মানেই হচ্ছে অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয়া, একটি গোষ্ঠীর লোভকে আরও উস্কে দেয়া, এর মানেই হচ্ছে এক হাতে দু:খ দুর্দশা অভাব ও অক্ষমতা এবং অন্য হাতে ধ্বংস, আলস্য, লোভ- লালসা এবং আগ্রাসন তুলে দেয়া।"

এ কথার প্রতিধ্বনি আজ সারা বিশ্বেই ঘটছে। সারা বিশ্বে এত প্রাচুর্য্য আর এত বৈষম্য আর কখনো দেখা যায়নি। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজার দখলের জন্য দুটো বিশ্বযুদ্ধ , আঞ্চলিক যুদ্ধ এসব দৃশ্যমান কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ যে শোষণ এবং তার ফলে মালিকের সম্পদ বৃদ্ধি আর শ্রমিকের দারিদ্র তা অদৃশ্য থেকে যায়। ৮ জন ধনীর কাছে বিশ্বের ৩৬৫ কোটি মানুষের সম্পদের সমপরিমান সম্পদ আজ জমা হয়ে পড়েছে। ৯৯ জন বনাম ১ জন এভাবে বিভাজিত হয়ে পড়ছে মানুষ । শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত সম্পদে শ্রমিকের অধিকার নেই, শ্রমিক বিচ্ছিন্ন তার উৎপাদন থেকে। এ বিচ্ছিন্নতা আজ সর্বব্যাপক । সমাজে কেন এত বৈষম্য ? কেন অল্পকিছু মানুষের হাতে এত সম্পদ আর বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে অভাব অনটন আর অপমান নিত্য সঙ্গী? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বার বার আমাদের তাই যেতে হয় মে দিবসের সংগ্রামী চেতনার কাছে।

বাংলাদেশের ৬ কোটি ৭০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ যারা দেশের রপ্তানী আয়কে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছেন, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন, জিডিপি বাড়াচ্ছেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্ফীত করছেন তাদের জীবন কিভাবে কাটছে? ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক, ৩০ লাখ নির্মাণ শ্রমিক, ৫০ লাখ পরিবহন শ্রমিক, রি-রোলিং শ্রমিক, তাত, চা , মেকানিকস, গৃহকর্মী, হোটেল রেস্টুরেন্ট, দোকান কর্মচারী সহ বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক এবং ২ কোটি ৬০ লাখ কৃষি শ্রমিকদের জীবনে গণতন্ত্র সমমর্যাদা কথাগুলোর প্রয়োগ কোথায়? দেশে প্রতিষ্ঠানিক খাত ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ছে । প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মাত্র ৭৩ লাখ শ্রমজীবী মানুষ যেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫ কোটি ৯৭ লাখ। শ্রমিকের শ্রমে তৈরী সম্পদ সবাই ব্যবহার করে কিন্তু শ্রমিক ন্যায্য মজুরি ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের দাবী তুললে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয় বিশৃংখলা হচ্ছে।

৮ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবীতে জীবন দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু আজও তা সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বিশেষ বিধানের নামে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো আইন সঙ্গত করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা আর পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে । চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধির কারনে শ্রমিকদের জীবন প্রতিনিয়ত নেমে যাচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। ফলে তারা পরিনত হচ্ছে "কর্মরত দরিদ্র" নামক এক জনগোষ্ঠিতে। অসংগঠিত শ্রমিক মানে অসহায় শ্রমিক।

শ্রমিকের জীবনের দুর্দশা কোন অদৃস্ট নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার নয়। এর কারন আছে, তাহল শোষণ। এর ফলে একদল মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে আর বিপুল সংখ্যক মানুষ নেমে যায় দারিদ্র্যের অতল সীমায়। যা শুধু শ্রমিকের জীবনেই দুর্দশা আনে না বরং গোটা সমাজের ভারসাম্য নস্ট করে দেয়। অসাম্যের এ সমাজ পরিবর্তনের আকুতি ছিল মে দিবসের অন্তর্নিহিত চেতনা ।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৭ তম বৃহত্তম শ্রমশক্তির দেশ । দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ১৫৯ টি দেশে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমিক কাজ করে। তারা পৃথিবীর সম্পদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে, দেশে রেমিটেন্স পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল পুর্ণ করছে। শোষণ মুক্ত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপুরণ - পুনর্বাসন আর সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মে দিবস তাই প্রেরণার উৎস হয়ে থাকুক।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে' দিবসের উৎস

কামরুল আহসান
কার্যনির্বাহী সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

সময়ের পরিক্রমায় আরেকটি মে দিবস সমাগত, এবছর মে দিবসের ১৩১তম বার্ষিকী। ১ মে মহান মে' দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস; একান্তই শ্রমিকদের দিন। শ্রমিকদের একান্ত দিন একারণে, যে এটি শ্রমিকদের আন্দোলনে রচিত রক্তে লেখা ইতিহাসের অধ্যায়। কাজের সময় কমাবার আন্দোলনের সঙ্গে মে দিবসের জন্ম কাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে স্টিম ইঞ্জিন চালু হলে উৎপাদন ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সমাজে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে। ঘর কেন্দ্রিক ছোট ছোট কুটির শিল্প ব্যবস্থার উৎপাদনের পরিবর্তে বড় শিল্প কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। সভ্যতার এ পরিবর্তনের যুগে সমাজ ব্যবস্থায় দু'টি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। একটি হলো উৎপাদন উপকরণের অধিকারী মালিক শ্রেণি, অন্যদিকে উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম হাতিয়ার শ্রমের মালিক-শ্রমিক শ্রেণী।

১৮৪০ সালে ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা দশ ঘন্টা শ্রমের সময় নির্ধারণের দাবীকে মূল দাবী পরিণত করে। এর প্রেক্ষাপটে 'লওয়েল' কারখানা কর্তপক্ষ ১৮৪৫ সালের ১৯ নভেম্বর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্রম ঘন্টা পনের থেকে কমিয়ে ১০ ঘন্টা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে তারা উল্লেখ করেন, আমরা উপলব্ধি করছি দীর্ঘকায়িক শ্রম শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও আনন্দময় জীবন রক্ষায় এ কর্মঘন্টার ঘোষণা দেয়া হলো।

সপ্তাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই সেখানে কাজের সময় কমাবার এ আন্দোলনের উদ্ভব হয়। 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' এ ছিল তখন কাজের রীতি। ১৮২০ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত কাজের ঘন্টা কমানোর দাবীতে ঘর্মঘটের পর ধর্মঘট চলতে থাকে। প্রথম দিকে দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজের সময় চালুর জন্য সুনির্দিষ্ট দাবী বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তোলা হয়।

১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কে রুটি কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট চলাকালে 'ওয়ার্কিংম্যান এ্যাডভোকেট' নামের একটি পত্রিকা এ দাবীকে জনগণের সামনে নিয়ে আসে। ফলে মার্কিন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে দশ ঘন্টা কাজের আওয়াজ দ্রুত বেগে একটা আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্যান ব্যুরেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য দশ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করতে বাধ্য হন, এবং একে আইনে পরিণত করেন। এ আইনের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন অন্যান্য শিল্পে শ্রমিকদের দশ ঘন্টা শ্রম আইন বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানে দশঘন্টা শ্রম ব্যবস্থা চালু হয়। এ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরপরই দিনের ২৪ ঘন্টা সময়কে হিসাবে নিয়ে আট ঘন্টা শ্রম, আট ঘন্টা বিনোদন ও আট ঘন্টা বিশ্রামের দাবী সামনে আসে। এ দাবী শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, শিল্পযুগের উদ্ভব যেখানে ঘটছিল সেখানেই শ্রমিকরা এ দাবীতে সোচ্চার হচ্ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশকালে যেখানে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছিল, সেখানেই আন্দোলন দানা বাঁধছিল।

অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৮ সালে নির্মাণ শ্রমিকরা অত্যন্ত সোচ্চারভাবে এ দাবী তোলেন। তারা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এ আন্দোলনকে বেগবান করেন এবং দাবী আদায়ে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন চুক্তি করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটঘন্টা কাজের দাবীর সূচনা হয় ১৮৬৬ সালে। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন নামে একটি জাতীয় শ্রমিক সংগঠন কাজের সময় কমানোর দাবী উত্থাপন করে এবং এ দাবীর সমর্থনে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব করে। ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের ষাটটি ট্রেড ইউনিয়ন বাল্টিমোরে মিলিত হয়ে একটি জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠন-আন্দোলনের নেতা হিসেবে মোল্ডার ইউনিয়নের তরুণ নেতা উইলিয়াম এইচ সিলভিস প্রাধান্যে আসেন। এ সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়, "এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির জন্য এ মুহূর্তে প্রথম এবং প্রধান

কাজ হলো এমন একটি আইন পাশ করা, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে আট ঘন্টা। এ মহালক্ষ্য অর্জনে সমগ্র শক্তি নিয়োগের সংকল্প গ্রহণ আমরা করেছি"। 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের' আন্দোলনের ফলে অনেক স্থানে 'আট ঘন্টা শ্রম সমিতি' গঠিত হয়। এ আন্দোলনের আরেক সক্রিয় নেতা ছিলেন বোস্টনের মেশিন কর্মি ইরা স্টুয়ার্ড।

১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে যখন "ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন" আট ঘন্টা কাজের সময় প্রস্তাব করে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (সম্মেলন) ঐ দাবীর সমর্থনে বিবৃতি প্রদান করে: "কাজের দিন আইন করে সীমাবদ্ধ করে দেয়া একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ও মুক্তির পরবর্তী সব প্রচেষ্টাই নির্মুল হতে বাধ্য। কাজের দিন আট ঘন্টার আইন করে বেঁধে দেয়ার প্রস্তাব কংগ্রেস উত্থাপন করছে।" কংগ্রেসের প্রস্তাবে আরো বলা হয়, "কাজের ঘন্টাকে সীমাবদ্ধ করার দাবী উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের সাধারণ দাবীতে পরিণত হয়েছে, সেহেতু জেনেভা কংগ্রেস এ দাবীকে সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ দাবী হিসেবে গ্রহণ করছে।"

১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সংগঠিত ট্রেড ও লেবার ফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক আট ঘন্টাকেই কাজের দিন হিসেবে গণ্য করা হবে। আমরা সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি যে, তারা যেন উল্লেখিত তারিখের মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। কিন্তু দাবীটি কি প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন হবে তার কোন নির্দেশনা দেননি। ১৮৮৫ সালে অনুষ্ঠিত 'ফেডারেশনের' সম্মেলন থেকে প্রস্তাব করা হয় ১৮৮৬ সালের ১ মে সকল শিল্প কারখানায় আটঘন্টা শ্রম বাস্তাবায়নে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসার। এ প্রস্তাবে সাড়া ছিল ব্যাপক, পাঁচ লক্ষের মত শ্রমিক 'আটঘন্টা শ্রম' আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়।

ধর্মঘটের মূল কেন্দ্র ছিল শিকাগো। ধর্মঘটের আন্দোলন সেখানে ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু অন্যান্য শহরের শ্রমিকরাও এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১ মে তারিখে ধর্মঘট করেন নিউইয়র্ক, বালটিমোর, ওয়াশিংটন, মিলওয়াকি, সিনসিন্নাটি, সেন্টলুই, পিটার্সবাগ, ডেট্রয়সহ বহু শহরের শ্রমিকরা। এ ধর্মঘটের বৈশিষ্ট ছিল যে, আন্দোলনের প্রবাহে অদক্ষ ও অসংগঠিত খাতের শ্রমিকরাও যুক্ত হয়েছিলেন। শিকাগো শহরে ১ মে ধর্মঘটের আন্দোলন অত্যন্ত তীব্রতা লাভ করে। সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনগুলোর ব্যাপক অংশ গ্রহণে শিকাগোর শ্রমিক ধর্মঘট বিরাট আকার ধারণ করে। ১ মে তারিখে শিকাগোতে শ্রমিকদের একটি বিশাল সমাবেশ হয়, সমস্ত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে 'আট ঘন্টা শ্রম সমিতির' আহ্বানে সাড়া দিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর আগে শ্রেষ্ঠ সংহতির এত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর ঘটেনি।

১৮৮৬ সালের ১ মে ধর্মঘট 'আট ঘন্টা' আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। আমেরিকার ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণির এ আন্দোলন রচনা করে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্ত এ অধ্যায় শান্তিপূর্ণ ছিল না। ১ মে'র ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো ৩ ও ৪ মে'র ঘটনাবলী। যা 'হে মার্কেটের' ঘটনা বলে পরিচিত। ৩ মে তারিখে 'ম্যাক কর্মকারিপার' কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর পুলিশ হামলা চালায়। এতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ ৭ জন পুলিশ ও ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। হে মার্কেট রক্তাক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়। এর দায়ে শিকাগোর আদালত শ্রমিক নেতা আলবার্ট পার্সনস, আগষ্টস্পাইজ, এডলফ ফিসার, সামফিলড্রেন, মাইকেল স্কোয়াব, জর্জ এঙ্গেলকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেয় এবং অস্কার নীবকে ১৫ বছরের জেল দেয়।

শিকাগোর শ্রমিক নেতাদের ফাঁসির এক বছর পর ১৮৮৮ সালে আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার সেন্ট লুই সম্মেলনে আট ঘন্টা কাজের আন্দোলন আবার শুরু করে। শ্রমিক শ্রেণীর দাবীর উপর সংগঠিত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুর ভূমিকা তারিখটির স্বীয় ঐতিহ্য রচনা করেছে, সেই ১ মে তারিখটিকেই বেছে নেয়া হলো আটঘন্টা শ্রমের আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের দিন হিসেবে। ১৮৮৯ সালে ১ মে উত্তর আমেরিকার দেশ জুড়ে ধর্মঘটে ঢেউ বয়ে গেল। ধর্মঘটের সূত্রপাত করেছিল "কার্পেন্টার্স ইউনিয়ন"।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের শত বার্ষিকীতে নানা দেশের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্যারিসে এক সম্মেলনে জড়ো হন। তাদের লক্ষ্য ছিল ২৫ বছর পূর্বে তাদের শিক্ষাগুরু কালমার্কস ও ফেডরিক এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের আদলে আরেকটি সংগঠনের ভিত্তি দেয়া। পরবর্তী সময়ের যার নাম হয় 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'। প্যারিসের এ সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যাতে করে একটি নির্দিষ্ট দিবসে বিশ্বের সকল দেশের সকল শহরের মেহনতী মানুষ তাদের নিজ নিজ সরকারের কাছে আট ঘন্টা কাজের সময় আইন করে বেধে দেয়ার দাবী উত্থাপন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এ সম্মেলন একটি বিশাল আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করছে। যেহেতু ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরের সম্মেলনে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' ১৮৯০ সালের ১ মে তারিখে অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেহেতু উক্ত তারিখেই আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের এ কর্মসূচি পালন আবশ্যিক কর্তব্য। ১৮৯০ সালে ১ মে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক সংগঠন 'আটঘন্টা শ্রমের' দাবীতে ধর্মঘটে অংশ নেয়। জার্মানীর বিভিন্ন শহরেও একই দাবীতে ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটের সমাপ্তি হয় বিভিন্ন শহরের নির্দিষ্ট কোন উন্মুক্ত স্থানে বিশাল বিশাল শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে।

১৮৯১ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আরেকটি সম্মেলনে মে' দিবসের মূল দাবীর সাথে 'কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের' দাবী যুক্ত করা করা হয়। একই সাথে জাতিসমূহের মধ্যকার আন্ত: সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি নিশ্চিত করার প্রস্তাব নেয়া হয়। এরপর থেকে দুনিয়াব্যাপী ১ মে তারিখে শ্রমিকরা মে দিবস পালন করে আসছে। বিশ্বের আশিটি দেশে মে দিবস সরকারি ছুটি হিসেবে কার্যকর হয়েছে। তবে ১৯৫৮ সালে মে দিবসের উৎসস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইজেইন হাওয়ার চাতুর্যের সাথে মে দিবসের সংহতি প্রকাশের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারকে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা জারি করেন।

ভারতের মাদ্রাজে 'কিষাণ পার্টি অব হিন্দুস্থান' ১৯২৩ সালে প্রথম মে দিবস উদযাপনের কর্মসূচি নেয়। এ প্রথম অবিভক্ত ভারতে শ্রমিকের লাল পতাকা ব্যবহার হয়। বৃটিশ শাসন আমলে ১৯৪৭ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠার সাথে মে দিবসের কর্মসূচিও ব্যাপকভাবে পালিত হতো। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের শিল্পাঞ্চলগুলোতে গোপনে মে'দিবস পালিত হতো। ঐ সকল গোপন সভায় শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মে'দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। তবে' ৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে এদেশের শ্রমিকরা সক্রিয় অংশ নেয়। ঐ বছর তেজগাঁও, টঙ্গি, আদমজী শিল্পাঞ্চলে মে দিবসে বিক্ষোভ সমাবেশে শ্রমিকরা ব্যাপক অংশ নেয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালের ১ মে তারিখে ঢাকার পূর্বতন 'রেসকোর্স ময়দানে' এক শ্রমিক সমাবেশে তিনি পরবর্তী সালের মে' দিবস থেকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাস্রোত

কেদার নাথ ভট্টাচার্য

১ মে, ১৮৮৬ সাল। বসন্তের আমেজ কাটিয়ে প্রখর সূর্য উঠেছে শিকাগোরে আকাশে। সেদিন ছিল শনিবার, স্বাভাবিক কাজের দিন। কিন্তু কল-কারখানায় সব কাজ বন্ধ, চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ আজ আচ্ছন্ন নয়। ধর্মঘট, অথচ ছুটির আমেজ। হাসি-ঠাট্টা-তামাসায় মশগুল গুচ্ছ গুচ্ছ শ্রমিকেরা সবচেয়ে সেরা সাজসজ্জা করে ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে বেরিয়েছে পথে মিচিগান এভিন্যুর মিছিলে যোগদান করতে বাড়ির সবাই বেরিয়েছে।

তাদের অজ্ঞাতসারেই অলি-গলিতে আর বিশেষ বাড়ির ছাদে জড়ো হয়েছে পুলিশ ও পিংকার্টন ঠ্যাঙ্গাড়ে বহিনী "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার অজুহাতে। আর তাদের পরামর্শ দেবার জন্য নাগরিক কমিটির সভ্যরা একটি কেন্দ্রীয় অফিসে বসে সারাদিন অধিবেশন চালিয়েছেন শিকাগোকে আট-ঘন্টা আন্দোলনের হাত থেকে বাঁচানোর আশায়।

অন্যদের মতো অ্যালবার্ট পার্সনসও বেরিয়েছেন বৌ লুসি ও দুই ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে। বাবার হাত ধরে চলেছে সাত বছরের মেয়ে লুলু আর মেয়ের হাত ধরেছে আট বছরের ছেলে অ্যালবার্ট। জনস্রোতের আনন্দে তারা মাতোয়ারা।

এমন সময় পার্সনসের সেরা বন্ধু আগস্ট স্পাইজ একখানা "শিকাগো মেল" পত্রিকা হাতে নিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছুটে এলেন আর জানালেন, সারা দেশে তিন লাখ চল্লিশ হাজার শ্রমিক মিছিল করছে, এক লাখ নব্বই হাজার ধর্মঘট করেছে এবং শিকাগোতেই আশি হাজার বেরিয়েছে মিছিল করার জন্য- তারা এখানেই জড়ো হচ্ছে। তারপর দেখালেন পত্রিকাটির সম্পাদকীয়ের একাংশঃ "এ শহরে দুটি ভয়ঙ্কর দুবৃত্ত অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় দুটি মিটমিটে কাপুরুষ। তাদের একজনের নাম পার্সনস; অন্যটির নাম স্পাইজ...।

আজ তাদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। চোখে চোখে রাখুন। কোন অশান্তি ঘটলেই তাদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করুন। কোন অশান্তি ঘটলে তাদের নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।" এর আগেও খবরের কাগজগুলি দিনের পরদিন রটিয়েছে, ১ মে প্রচন্ড গন্ডগোল হবে। শিকাগো ডেইলি নিউজের কর্তা মেলভিল ই স্টোনের (Melville E. Stone) ভাষায়, "প্যারি কমিউন দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল অবাধে।"

সবকিছুকে উপেক্ষা ক'রে হাসি মুখে শুরু হলো মিছিল, মনে হলো যেন শেষ নেই তার। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রোমাঞ্চিত মুখ আর দৃপ্ত পদক্ষেপ। সব মতের, সব পথের লোকেরা জড়ো হয়েছে মিছিলে-নাইটস অব লেবার ও আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের সদস্যরা, জার্মান, পোল, রুশ, আইরিশ, ইতালীয়, মোহমীয় নিগ্রো, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, ইহুদি, অ্যানর্কিস্ট প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী, সোশ্যালিষ্ট ইত্যাদি-জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার প্রাচীর চূর্ণ করে চলছে খেটে খাওয়া মানুষের বিশ্বজয়ী মিছিল। মিছিল শেষ হলো লেক ফ্রন্টে গিয়ে। সেখানে নানা ভাষায় শুরু হলো বক্তৃতা-ইংরেজি, মোহেমীয়, জার্মান ও পোলিশ। শ্রমিক শ্রেণির অপরাজেয় মিলিত শক্তির কথা বললেন পার্সনস। জার্মান শ্রমিক পত্রিকার সম্পাদক স্পাইজ ছিলেন জার্মান ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই পারদর্শী এবং শ্রোতাদের অতি প্রিয় বক্তা। ঘনঘন করতালির মধ্যে তাঁর বক্তৃতা হলো শেষ।

এভাবেই কেটে গেল মে দিবস। কোন রক্তপাত নেই, "প্যারি কমিউনের পুনরাবৃত্তি" ও নেই। পুলিশকে ফিরে যেতে হলো ব্যারাকে। পরের দিন ২ মে ছিল রবিবার, ছুটির দিন। পার্সনস চলে গেলেন সিনসিন্নাটিতে একটা সভায় বক্তৃতা দিতে। সোমবার ৩ মে ধর্মঘট আরো বিস্তার লাভ করলো। শিকাগোর হাজার হাজার খেটে খাওয়া মানুষ সত্যিই অর্জন করলো আট ঘন্টা কাজের দিন। তখনও নাগরিক কমিটি ঘোষণা করে চলেছেন- একটা কিছু করা দরকার।

এদিকে পুলিশের মনেও শান্তি নেই, এত তোড়জোড় করেও ১ মে তারিখে তারা হতাশ হয়েছিল। তাই তারা আশা মেটাল ম্যাককর্মিকে হার্ভেস্টার ওয়ার্কস নামে এক কারখানায়। সেখানে শ্রমিকেরা প্রথমে মুখোমুখি হলো দালালদের। চলল ডান্ডাবাজি। তারপর সহসা পুলিশ শুরু করলো গুলি। শ্রমিকেরা ছুটে পালানোর সময় আহত হলো দলে দলে আর তাদের মধ্যে দু'জন খুন হলো সেখানেই।

ঘটনাস্থলের অনতিদূরেই কাঠ-চেরাই শ্রমিকদের এক সভায় তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন স্পাইজ। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন পুলিশের সেই বীভৎস হত্যালীলা। সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে পরের দিনই সন্ধায় হে-মার্কেট স্কোয়ারে ডাকলেন প্রতিবাদ সভা।

৪ মে মঙ্গলবার পার্সনস ফিরে এলেন শিকাগোতে- সারাদেশ জুড়ে আট-ঘন্টা লড়াই আর বিজয়ের খবরে মন তাঁর ভরে আছে। দুপুরে খাবার সময়ে লুসি শুনলেন সেসব কাহিনী আর জানালেন হে-মার্কেটে জনসভার আয়োজনের কথা। নারী সেলাই- শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য সেদিনই একটা সভার আয়োজন করেছিলেন লুসি। উজ্জ্বল সম্ভাবনার আনন্দে পার্সনস স্থির করে ফেললেন যে, নারী শ্রমিকদের সভাতেই তিনি যাবেন, হে-মার্কেটে নয়। নারী শ্রমিক সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য তখনই লুসিকে নিয়ে পার্সনস চলে গেলেন শ্রমজীবী সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে। সাথে অবশ্য বাচ্চা দুটো আর 'অ্যালার্ম' (Alarm) - এর সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতি হোমস (Mrs Holmes) -ও ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছে সেই সলাপরামর্শ। এমন সময় আর্বিভূত হলো এক বার্তাসহ ঃ "হে-মার্কেটে এক বিরাট সভা হচ্ছে। স্পাইজই একমাত্র বক্তা। তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন এবং ফিলডেন আপনাকেও।"

পার্সনস যখন তাঁর স্ত্রী ও দু'টি সন্তানকে নিয়ে সভাস্থলে পৌছুলেন, তখনো স্পাইজ বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তাঁরা কেউ জানতেন না যে অদূরেই প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে। স্পাইজ অগোচরেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন শিকাগোর মেয়র কার্টার হ্যারিসন (Cartar Harrison)।

বক্তৃতার মঞ্চটি ছিল একটি খালি চারপায়া বগি। আরেকটা খালি বগির উপর বৌকে ও বাচ্চাদের বসিয়ে রেখে পার্সনস এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। স্পাইজের বক্তৃতা শেষ হবার পরেই তুমুল করধ্বনির মধ্যে পার্সনস শুরু করে দিলেন ঃ "আমি কাউকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি, যা ঘটছে তাই মন খুলে বলতে এসেছি।" কথাটি শুনেই শিকাগোর মেয়র সভা থেকে চলে গেলেন থানায় এবং জানালেন, অশান্তির কোন আশংকা নেই, পুলিশ মোতায়েন রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

পার্সনসের বক্তৃতা শেষ হলো রাত দশটায়। তখন লেকে মৃদু ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। সভার শেষ বক্তা সাম ফিলডেন (Sam Fielden) উঠলেন মঞ্চে। ইতোমধ্যে বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে পার্সনস গিয়ে বসলেন পাশেই একটা ভোজনালয়ে। ফিলডেনের কণ্ঠস্বর তখনো ভেসে আসছে বাতাসে। এমন সময় সহসা শোনা গেল "পুলিশ, পুলিশ" বলে চিৎকার। ক্যাপটেন ওয়ার্ড এসে থামলেন বগিটির কাছে আর বিস্মিত ফিলডেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "ইলিনয় রাজ্যের জনগণের নামে আমি অবিলম্বে ও শান্তিপূর্ণভাবেই এ সভা বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি।" "কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবেই আছি", বললেন হতবাক ফিলডেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিকট আওয়াজে ফাটল একটা বোমা।

রাতের অন্ধকারে শুরু হ'ল পুলিশী তাণ্ডব। চারিদিকে চলেছে পুলিশের গুলি আর উন্মত্ত ডান্ডাবাজি। অসংখ্য লোক হলো আহত কিন্তু পুলিশও রেহাই পেল না- একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেল আর সাতজন হলো মারাত্মকভাবে আহত। ঘটনার গতি অন্য খাতে বইছে, তা আন্দাজ করতে দেরি হলোনা পার্সনসের, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চলে গেলেন শিকাগোর বাইরে-শান্ত উইস্কননসিন গ্রামাঞ্চলের একটি পাহাড়ে।

পরের দিন সরাদেশের বড় বড় পত্রিকা সমস্বরে জেহাদ ঘোষণা করল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে-কুৎসা, ঘৃণা ও ক্রোধের বন্যা বয়ে গেল। শিকাগো ট্রিবিউন লিখল ঃ

"এটা সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি যে ইউরোপীয় আততায়ী অগাষ্ট স্পাইজ, মাইকেল স্কোয়াব ও স্যাম ফিলডেনকে

ধরতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের জন্য ফাঁসি দিতে হবে। ... এটা সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি যে, এদেশে জন্ম নিয়ে দেশকে কলঙ্কিত করেছ যে আততায়ী, সেই এ. আর. পার্সনসকে বন্দী করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের জন্য ফাঁসি দিতে হবে।"

আর.এইচ.বাফ (R.H.Baugh) 'স্পেক্টেটরে' লিখলেন, যদি অভাবনীয়ভাবে অপরাধীরা আইনের দণ্ড থেকে রেহাই পায়, তা'হলেও তাদের মৃত্যু অবধারিত, জনতাই তাদের ফাঁসিতে ঝোলাবে। তিনি লিখলেন, "তিন দিনের জন্য সভ্যতাকে বিদায় দিয়ে একটি প্রহরী কমিটি (Vigilance Committee) নিজেদের হাতেই আইন তুলে নেবে এবং সামাজিক শৃংখলাকে ফিরিয়ে আনবে।"

শিকাগো রাজ্যের অ্যাটর্নি জুলিয়াস এস. গ্রিনেল (Julius S. Grinnell) বললেন, "আগে হানা দাও, তারপর খুঁজে দেখো আইন" (Make the raids first and look up the law afterwards)
গ্রেপ্তার করা হলো সাতজনকে-অগাষ্ট স্পাইজ, স্যাম ফিরডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জর্জ এঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিশার, লুই লিংগ ও অস্কারনীবে। তাঁদের মধ্যে স্পাইজ ও ফিলডেন ছিলেন ঘটনাস্থলে। অ্যালবার্ট পার্সনসকে পুলিশ খুঁজে পায়নি।

অফিসার ডেগানকে খুন করার অভিযোগে আরো দু'জনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল-উইলিয়াম সেলিগার ও রুডলফ শ্নবেল্ট। সেলিগার অবশ্য রাজসাক্ষী হয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন আর শ্নবেল্ট পালিয়ে গিয়ে ছদ্মনামে বাকি জীবনটা কাটান ও গ্রেপ্তার এড়িয়ে যেতে সমর্থ হন। অন্য আটজনই ছিলেন স্থানীয় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কর্ণধার। অবশ্য তাঁরা কেউই প্রকৃত অর্থে শিল্প শ্রমিক ছিলেন না-পার্সনস ও ফিশার ছিলেন মুদ্রাকর, স্পাইজ আসবাবপত্র বিক্রেতা থেকে হয়েছিলেন সম্পাদক, স্কোয়ার ছিলেন একজন প্রাক্তন দফতরি, ফিলডেন ছিলেন স্বনিযুক্ত পশুবাহিত গাড়ির চালক, লিংগ একজন সূত্রধর বা ছুতোর, এঞ্জেল একটা খেলনার দোকানের মালিক ছিলেন।

শুরু হল বিচারের প্রহসন।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

কাস্তে হাতুড় লাল-পতাকা

...লিমা সুলতানা লিপু।

পহেলা মে'র দাবী ছিলো
আট ঘন্টা কাজ অধিকার
লক্ষ শ্রমিক কণ্ঠ রোধে
মালিক করে অবিচার।

শিকাগোর নদ নদী রাজপথ
রক্তে হলো রঞ্জিত
আকাশ ছোঁয়া হুংকার দিলো
শ্রমিক মজুর বঞ্চিত।

অন্যায় জুলুম বন্ধ করো
মালিক তুমি হুঁশিয়ার
ন্যায্য পাওনা আদায় করবো
রুখে দিবো হাতিয়ার।

এগারো জনের আত্মদান
দাবী আদায়ের আশে
ছয় শ্রমিকের জীবন নিলো
ফাঁসির কাষ্ঠও হাসে।

কাস্তে হাতুড় লাল-পতাকা
মে দিবসের সাজ
শ্রমিক-মালিক কাঁধ মিলিয়ে
করো সবে কাজ।

মালিক বণিক চালাও যারা
কল-কারখানা ফ্যাক্টরি
আট ঘন্টা কাজ গুনে দিবে
রক্তে ভেজা মজুরি।

বন্দুক হাতে মালিক তুমি
যেও না কোথাও তেড়ে
মে দিবস যে বেঁচে আছে
দিবে না তোমায় ছেড়ে।

শ্রমিক-মালিক চলো সবে
সাম্যের গান গাই
মিলেমিশে ছন্দ লয়ে
দেশটা গড়ে যাই।

অভিবাসী শ্রমিক: স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয়

মোঃ ওমর ফারুক
এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার- ট্রেনিং
অ্যালায়ান্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি

'উন্নয়ন' এবং 'অভিবাসন' অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত দুইটি প্রপঞ্চ। সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ উন্নয়নের একটি চালিকা শক্তি হিসেবে অভিবাসন বিষয়টি বিবেচিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী সংযুক্ত হচ্ছে অভিবাসী তালিকায়। সেই সাথে প্রগাঢ় আন্তরিকতা, কঠোর পরিশ্রম, নিবেদিত মনোভাব- এর সমন্বিত রুপরেখা একবিংশ শতাব্দীর অভিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচিতিতে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। আর এ অভিবাসীদের হাত ধরেই বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, স্থানীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে বিস্ময়কর গতিতে। বলা হয় বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনে অভিবাসীদের অবদান ৯.৪ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংক এর হিসাব অনুযায়ী, অভিবাসীদের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশী রেমিটেন্স প্রেরিত হয়েছে। তাইতো বৈশ্বিক দারিদ্র বিমোচন, কর্মসৃজন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিরব অনুঘটক হচ্ছে- অভিবাসী শ্রমিকেরা।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি জনগোষ্ঠী জীবিকার তাগিদে ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়, কখনও বা অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অভিবাসী জীবন-যাপন করছে। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সাল থেকে সীমিত পরিসরে শ্রমিক অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হলেও বর্তমানে এটি অভিবাসনের উৎস দেশ হিসেবে পঞ্চম স্থানে অধিষ্ঠিত (প্রায় ৭০ লক্ষাধিক বাংলাদেশী নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত)। এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন বাংলদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে অতিরিক্ত চাপ হ্রাসকরণ সম্ভব হয়েছে, তেমনি জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন খাতে উন্নয়ন তথা সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন সহজতর হয়েছে।

উৎস কিংবা গন্তব্য উভয় দেশেই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও বাংলাদেশী অভিবাসীরা বিশেষতঃ শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নমূখী চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীণ হচ্ছে। এসবের সধ্যে অভিবাসীদের অগ্রগতির ধারাকে প্রতিহত করতে মৌলিক ও সাধারণ যে প্রতিবন্ধকটির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে- স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিহত করার অক্ষমতা তথা স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভূক্ত হতে না পারা । আর এ ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, মানবেতর জীবন-যাপন, ত্রুটি ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশাগত কর্ম পরিবেশ ও কর্ম প্রকৃতি, পুষ্টিস্বল্পতা, বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব, অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত অনুপ্রবেশ বা অনুপ্রবেশহীনতা তথা ভিন্ন ভাষায় লিখিত স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বা ব্যবস্থাপত্র বুঝতে না পারা অন্যতম। উইলিয়াম লেছি সুইং (ডিজি, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা) তাই যথার্থই বলেছেন "linguistic or cultural differences, a lack of affordable health services or health insurance, ... were among their key barriers" যদিও ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার বিশ্বব্যাপি শ্রম অধিকারগুলোর একটি। তথাপি এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় উদ্যোগের পর্যাপ্ত অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মিত হালনাগাদকৃত কোন ডেটাবেইজ না থাকার কারণে তাদের মৌল-মানবিক অন্যান্য ইস্যুর ন্যায় স্বাস্থ্য ইস্যুও অগোচরেই থেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আইওএম এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আঞ্চলিক পরামর্শ সভার তথ্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে ২১ শতাংশ পেশাগত কারণে নানা ধরণের শারীরিক সমস্যায় ভুগছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে আরও লক্ষ্যণীয় তথ্য হচ্ছে, তাদের ১৩.৪৯ শতাংশ কোন না কোন মানসিক সমস্যায় ভুগছে। উল্লেখ্য, তাদের প্রায় অর্ধেকেরই (৪৯%) সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজসাধ্য ছিলোনা। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহজেই স্বাস্থ্যসেবা পাবে- এমন প্রত্যাশা ছিলো তাদের ২৮ শতাংশের।

তবে যারা স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে তাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই ভাষাগত দুর্বোধ্যতার কারণে স্বাস্থ্য সরঞ্জাম ব্যবহারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখিত তথ্য দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও অনেক দেশেই এক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ সীমিত- যা বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই হোক বা শ্রমিকদের অজ্ঞতার কারণেই হোক।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্য একটি লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে, তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম কারণ পেশাগত দুর্ঘটনা- যার প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত শ্রমিকেরা কখনও অস্থায়ী, কখনও বা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও দৈবাৎ নয়। দেখা গেছে,বিদেশে অবস্থানকালে অভিবাসী শ্রমিকদের ৬০ শতাংশেরই কোন না কোন পেশাগত দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (৪৬%) কোন প্রকার চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এ দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে তাদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক (৩৪%) শারীরিক পঙ্গুত্ব বরণ করেছে- এমনই সবতথ্য উঠে এসেছে আইসিডিডিআরবি এর এক সমীক্ষায়। পেশাগত দুর্ঘটনা ছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নি দুর্ঘটনায়ও প্রচুর শ্রমিক প্রতি বছর শারীরিক- মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। এছাড়া নিম্ন জীবনমান, পুষ্টিহীনতা, অবাধ জীবনযাপন প্রভৃতি কারণে তারা প্রায়শঃই বিভিন্ন রোগব্যাধি বিশেষতঃ ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে, বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস্ সংক্রমনে অভিবাসীরা অন্যতম হোস্ট হিসেবে কাজ করছে। ২০১১ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঐ বছর বাংলাদেশে ৩১ শতাংশের অধিক এইচআইভি আক্রান্তরা ছিলো বিদেশ প্রত্যাবর্তিত। এছাড়াও নানামুখী শারীরিক- মানসিক নির্যাতন অনেকাংশে তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

সমস্যা যত চিরন্তন বা সুগভীরই হোক না কেন সমাধান সাধ্যাতীত নয়। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা ও একটু সুনজর। তাই আজ সময় এসেছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে অগ্রধিকার প্রদান করার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য উৎস বা গন্তব্য কোন দেশেই যথার্থ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা, নীতি বা বীমা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই আজ সময় এসেছে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে:

- - দ্রুততার সাথে 'কার্যকরী, সময়োপযোগি ও যথাসম্ভব টেকসই' আন্তর্জাতিক মানের অভিবাসী শ্রমিক স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন;
- অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য বীমা বা ভাতার আওতায় অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভূক্তকরণ;
- উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশেই যথার্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশেই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং হেল্প লাইন চালুকরণ;
- বিদেশী ভাষায় লিখিত স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বা ব্যবস্থাপত্র বুঝতে বিকল্প অথচ সহজবোধ্য পন্থা নিশ্চিতকরণ;
- শারীরিক সুস্থ্যতাসহ মানসিক সুস্থ্যতা অর্জনে মানসিক চাপ, নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি সুস্থ্য ও নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন পরিহার করে আদর্শ ও নৈতিক জীবন গঠনে উৎসাহিতকরণ;
- গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি) এর মাধ্যমে 'অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যঝুঁকি' বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উপস্থাপন;
- সর্বোপরি স্বাস্থ্য অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক সম্প্রীতিসহ সুশাসন নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক।

অটিস্টিক শিশুঃ
মনোজগতের এক অন্তর্মুখী মহাসন্ত কিংবা ক্ষ্যাপা বাউল

ডাঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ রিয়াজী
মেডিকেল অফিসার
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,সরিষাবাড়ী,
জামালপুর।

করোটির ভিতর এক মহাবিশ্ব
ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হয়
সেখানেও ফুল ফোটে তারা জ্বলে
আকাশের কোলে
নিজের অন্তরীক্ষে বিমোহিত যে শিশুটি
মাথা তার দোলে
করোটির বাহিরে যে বিশ্ব
যা কিছু মৃন্ময়
চিরতরে তিরোহিত হলেও
কিছু আসে যায় না তার
শুধু চারপাশে ঘিরে থাকে কল্পনার
সোনালী আধার
যেন অভেদ্য রেশমের গুটি
কবে যেন হবে তার ছুটি?

অটিজম আক্রান্ত শিশুই অটিস্টিক শিশু। অটিজম (Autism) অথবা Autism Spectrum Disorder শিশুর এক মনোবিকাশগত জটিলতা যা শিশুকে বহির্বিমুখ, অস্বাভাবিক কল্পণাশ্রয়ী অন্তর্মুখী ও আত্মমগ্ন করে তোলে। এটি শিশুর বাচনিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক চরম প্রতিবন্ধকতা।

এক্ষেত্রে শিশুর দৈহিক বিকাশ স্বভাবিক থাকতে পারে। কিন্তু তার সামাজিক ও বাচনিক দক্ষতা চরমভাবে অবিকশিত থাকে। অটিস্টিক শিশুদের বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকও থাকতে পারে। কিছু কিছু অটিস্টিক শিশু গণিত, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় পারদর্শী হয়।

অটিজম স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যা হলেও অটিজম মানসিক রোগ নয়। তবে অটিস্টিক শিশুদের মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য শিশুদের চেয়ে বেশি। প্রতি দশ হাজার শিশুর মধ্যে ৫ জনের এই রোগ হওয়ার আশংকা আছে।

কিভাবে বুঝবেন শিশুটির অটিজম থাকতে পারে ?

১। যদি আপনার শিশুটি ৬ মাসের ভিতর স্বতঃস্ফুর্তভাবে না হাসে।
২। যদি ৯ মাসের ভিতর তার চারপাশের স্বজনদের হাসি শব্দ ও ভাবভঙ্গির সাথে সহজ ও সঙ্গত প্রতিক্রিয়ামূলক আচরন না করে।
৩। যদি ১ বছরের ভিতর মুখে কোন একটি শব্দ না বলে, আঙুল দিয়ে কোন জিনিস বা দেয়ালে আঁকা কোন ছবি না দেখায়।
৪। যদি ২ বছরে দুই শব্দ সহযোগে কোন বাক্য না বলে।
৫। যদি চোখে চোখ রেখে না তাকায়।
৬। যদি অন্যদের কথাবার্তায় অংশগ্রহণ না করে উদাসীন থাকে।

৭। যদি নাম ডাকলে সাড়া না দেয়।

৮। যদি শিশুর অর্জিত বাচনিক দক্ষতা ও সামাজিক সমন্বিত সংযোগ দক্ষতা হঠাৎ করে হ্রাস পায়।

৯। যদি সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে না পারে ও আলাদা থাকতে পছন্দ করে।

১০। যদি স্পর্শ করা বা জড়িয়ে ধরা পছন্দ না করে।

১১। যদি বিভিন্ন জিনিস ঘুরাতে পছন্দ করে বা একই লাইনে সাজাতে পছন্দ করে।

১২। যদি অতিমাত্রায় অস্থির, চঞ্চল অথবা একেবারেই নিষ্ক্রিয় চুপচাপ থাকে।

১৩। যদি অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে যেমন অযথাই শরীর দোলানো হাত নাড়ানো বা লাফানো।

১৪। যদি শারীরিক বিপদ ও যন্ত্রণার ব্যাপারে আপাতঃ অসংবেদনশীলতা থাকে।

১৫। যদি নিজেকে নিয়ে সারাদিন আত্মমগ্ন থাকে, অন্যদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ না থাকে।

১৬। যদি মা-বাবা ভাইবোন ও অন্যান্যদের সংগে সামাজিক ভাববিনিময়ে অনীহা ও অনাগ্রহ থাকে।

১৭। যদি শিশুটির মধ্যে ধ্বংসাত্মক, আক্রমনাত্মক বা আত্মঘাতী আচরণ থাকে।

১৮। যদি কোন খেলনা বা বিশেষ কিছু নিয়ে প্রচণ্ড জেদ করে।

১৯। যদি বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাটে।

অটিজমের কারণঃ

প্রকৃত কারণ অথবা কার্যকারণ সম্পর্কিত উপাদান সমূহ (Causative Factors) সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায়নি। অটিজমের সংগে জেনেটিক কারনের সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে Fragile X Syndrome, Down`s Syndrome Tuberous Sclerosis আক্রান্ত শিশুদের অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নিম্নোল্লেখিত বিষয় সমুহের সংগে অটিজমের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

১। খাদ্যাভাস

২। পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা

৩। ভিটামিনের অভাব

৪। পারদের বিষক্রিয়া

৫। গর্ভাবস্থায় মায়ের হাম হওয়া

৬। শিশুদের M M R ভ্যাকসিন

কোনটাই সু প্রমানিত নয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ঃ

অটিজমের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে আক্রান্তদের বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পিতামাতা ও আপনজনদের শ্রম ও যত্ন, সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতাপূর্ণ মানবিক আচরণ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সহায়ক কার্যক্রমে একজন অটিস্টিক শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও শিশুটিকে একটি স্বাধীন কার্যকর মোটামুটি সন্তোষজনক মান সম্পন্ন জীবন যাপন করার মত পর্যায়ে আনা যেতে পারে।

যা প্রয়োজনঃ

১। শিশুর সার্বক্ষণিক সহায়তার জন্য মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ;

২। শারীরিক সমস্যাসমূহ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা;

৩। ভাষা বিকাশ ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশের জন্য শিশুটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া; এবং

৪। সামাজিক সহযোগিতা ও সংবেদনশীল আচরণ এধরনের শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য জরুরী।

বাংলাদেশের চা-শিল্প ও চা-শ্রমিকের কল্যাণে আওয়ামীলীগ সরকার

মো. শফিকুর রহমান
সহকারী শ্রম পরিচালক
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট।

আওয়ামীলীগ সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সবসময় সক্রিয় ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ শোষিত শ্রেণিই সোনার বাংলা গড়ার হাতিয়ার। তাই তাদের যথাযথ মূল্যায়ন দরকার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্প ও চা শ্রমিকের অবদান অন্যতম। বিশ্বের মোট চা উৎপাদনের ২% বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। এ চা শিল্পের বিকাশ ও চা শ্রমিকের কল্যাণে বর্তমান সরকারের রয়েছে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্থ এদেশের চা শিল্পকে কোনক্রমেই নষ্ট হতে দেননি। তিনি যখন ১৯৫৭ সালের ৪ জুন হতে ১৯৫৮ সালে ২৩ অক্টেবর পর্যন্ত চা বোর্ডের তৃতীয় চেয়ারম্যান ছিলেন তখন ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন এদেশের উন্নয়নে চা শিল্প কতটুকু ভূমিকা পালন করবে। চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে এ শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদেরকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। শুধু বাঁচিয়ে রাখলেই হবে না তিনি চেয়েছিলেন শ্রমিকদের মর্যাদার সাথে ন্যায্য অধিকার দিয়ে টিকিয়ে রাখতে। তিনি বুঝেছিলেন শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার দিতে হলে চা-শিল্পকেও উন্নত করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কারখানাগুলোর উন্নয়নে ভারতের অর্থ সহায়তায় ৩০ লক্ষ রুপির চা যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। চা শিল্পে নগদ ভর্তুকি দেন এবং ভতুর্কি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। চা বাগানের মালিকদের ১০০ বিঘা পর্যন্ত মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি দেন। বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্রকে আধুনিকায়ন করে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে রুপান্তরিত করেন। চা-শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি চা-শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এর মধ্যে রয়েছে:-

১। চা শ্রমিকদের নাগরিকত্ব প্রদান ও ভোটাধিকার এর ব্যবস্থা করেন। কারন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ হতে আগত উপজাতি গোষ্ঠিকে যথাযথ মূল্যায়ন করে আপন করে নিতে হবে। তাদের শিল্প সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে।
২। তিনি চা শ্রমিকদের খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।
৩। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সময়ের দাবি-দাওয়া সমাধানে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা পালন করেন।
৪। চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।
৫। চা শ্রমিকদের পোষ্যদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌছাতে বাগানে বাগানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেন।

শ্রমিকদের জন্য ও চা-শিল্পের জন্য বঙ্গবন্ধুর গৃহীত উদ্যোগ পরবর্তীতে তার যোগ্য উত্তরসুরী জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নতির পথে চলমান রয়েছে। চা বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপের পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলোকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করে আইনী অধিকার রুপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করেছেন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রনয়ন করা হয়েছে এতে চা শ্রমিকের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত তফসিল-৫ সংযোজন করা হয়েছে।

শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালায় অন্যান্য সকল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য সুবিধার ন্যায় চা-শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান করেছেন। সকলের ন্যায় প্রাপ্য সুবিধার তুলনায় চা বাগানের শ্রমিকদের বিশেষ কিছু সুবিধা রয়েছে। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় চা বাগানের শ্রমিকরা নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বহি, চাকুরী স্থায়ীকরণ, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ৮ ঘন্টা কর্ম, বিশ্রাম, ওভার টাইম, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি সুবিধা

প্রাপ্য হবে। গ্রুপ বিমা চালু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। চা বাগানগুলোর উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ক্যাটাগরি অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন/মজুরি কিছুটা পাথর্ক্য রয়েছে। ক্যাটাগরি অনুযায়ী একজন চা শ্রমিক দৈনিক ২০ কেজি চা পাতা তুলতে পারলে হাজিরা হয়ে যায়। ৮৫ টাকা মজুরি প্রাপ্য হয়ে থাকে। অতিরিক্ত প্রতি কেজির জন্য ২.৫ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন বাগান দিয়ে থাকে। পাতা তোলার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ মহিলা শ্রমিকরাই কাজ করে থাকে। পাতা তোলা ছাড়াও শ্রমিকরা বাগান ছাটাই, বাগানের পরিচর্যা ও কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

চা বাগানের শ্রমিকরা বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ১ দিন মজুরিসহ সাপ্তাহিক ছুটি পাচ্ছে। উৎসব ছুটি পাচ্ছে ১১ দিন । অসুস্থতা জনিত ছুটি ২০ দিন, মজুরিসহ অর্জিত ছুটি প্রাপ্য হচ্ছে, বয়স্ক শ্রমিকের জন্য প্রতি ২২ দিনে ১ দিন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতি ১৮ দিনে ১ দিন হারে পাচ্ছে। অর্জিত ছুটি ৬০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে এবং অর্জিত জমা ছুটি যদি কোন শ্রমিক উপভোগ করতে চায় এবং মালিক যদি না দেয় তাহলে যত দিনের ছুটির আবেদন করবে তা ৬০ দিনের সাথে যোগ হবে।

মজুরির বাইরে ও দৈনিক হাজিরাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রতি সপ্তাহে ৬৫ টাকা ভাতা প্রাপ্য হয় এবং মাসিক বেতনধারী শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ভাতা ১০০ টাকা প্রাপ্য হয়। অন্যান্য শ্রমিকরা ৫৫ টাকা থেকে ৯৭ টাকা পর্যন্ত সাপ্তাহিক ভাতা প্রাপ্য হয়। কীটনাশক প্রয়োগ ও আগাছা নিধনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা মজুরির বাইরে দৈনিক ৪ টাকা হারে ঝুঁকি ভাতা প্রাপ্য হয়। এ বিষয় গুলোর প্রাপ্যতা নিয়ে প্রতি ২ বছর অন্তর শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে থাকে।

প্রত্যেক শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যের জন্য জনপ্রতি সাপ্তাহিক ৩.৫ কেজি চাল/আটা ২ টাকা প্রতি কেজি মূল্যে রেশন পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদানের বিধান রয়েছে। দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক আহত হ'লে এবং জখম প্রাপ্ত হলে বা পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লে মালিকের নিজ খরচে ও নিজ তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা সর্ম্পূণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যা করার বিধান রয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে।

চা বাগানের মালিক কর্তৃক প্রতিটি শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদান করা হবে। গৃহ উঁচু ভূমিতে স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে এবং বাসস্থানের পাশে বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগার এর ব্যবস্থা করবে। কোন শ্রমিক চাকুরি থেকে অবসর নিলে গৃহ প্রাপ্য হবে না কিন্তু যদি তার পরিবার এর কোন একজন বাগানে কাজ নেয় তবে সে তার ও তার পরিবার এর সদস্যগন আবাসন দখলে রাখতে পারবে।

চা-শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্কুলের ব্যবস্থা করবে এবং বিনোদনের জন্য প্রতি বাগানে বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন, ইনডোর ও আউটডোর খেলার ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা করবে। বাগানের অন্যূন ছয় বছরের শিশুর জন্য যথোপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত শিশু সদন এর ব্যবস্থা করবে এবং মালিক অনুরুপ শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ ও খাবার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত খেলনার ব্যবস্থা করবেন।

চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য মালিক ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং নির্ধারিত স্থানে ডিসপেন্সারী থাকবে এবং জরুরী প্রয়োজন শ্রমিকরা তাহার বাড়ীতে চিকিৎসার সুযোগ পাবে। নিযুক্ত চিকিৎসক বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করবেন। একাধিক বাগান মিলে গ্রুপ হাসপাতাল করার নির্দেশনা রয়েছে।

চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ১৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাচ্ছে এবং ছুটির সাথে সুবিধা হিসেবে পূর্ববর্তী তিন মাসে অর্জিত মোট মজুরির গড়ে সপ্তাহের যা আসে ঐ হারে প্রাপ্য হবে। চা বাগানের শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সক্ষম থাকলে ডাক্তার এর অনুমতি সাপেক্ষে যে ধরনের হালকা কাজ করলে ক্ষতি হবে না সে ঐরুপ হালকা ধরনের কাজ করলে মজুরি প্রাপ্য হবে যা মাতৃত্বকালীন সুবিধার অতিরিক্ত হবে। চা বাগানে শ্রমিকদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার নির্দেশনা রয়েছে এবং দীর্ঘ দিনের প্রচলিত সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ ও অব্যাহত রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

শ্রমিকদের দাবি দাওয়া অর্থাৎ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা শ্রমিকদের ২টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। যথা বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃনং-বি-৭৭) যার সদস্যরা হচ্ছে চা পাতা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সর্ম্পক যুক্ত শ্রমিক যেমন:- দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাজিরার শ্রমিক, পিয়ন, মেসেঞ্জার, চৌকিদার, মলি, ধোপা, সুইপার, পানিওয়ালা, রাখাল, ধাই, ড্রেসার, লেদ অপারেটর, সর্দার, মিস্ত্রি ও ইলেক্টিশিয়ান পর্যায়ের শ্রমিক। এ ধরনের শ্রমিক প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার। তারা প্রতি ২ বৎসর অন্তর শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে চুক্তি করেন। ২০১৭ সালে তাদের নতুন চুক্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ধরনের শ্রমিকরা কোম্পানির মুনাফার অংশ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে কিন্তু তারা এখনো পাচ্ছে না। এছাড়াও প্রতি বাগানে শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সমস্যা নিরসনে ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত বাগান পঞ্চায়েত কমিটি রয়েছে। তারা বর্তমান সরকার এর প্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি করেছে।

অপর সংগঠন টি হচ্ছে বাংলাদেশ টি স্টাফ এসোসিয়েন (রেজিঃ নং-বি-২৫১) এর সদস্য হচ্ছে মূলত বাগানের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত তারা সাধারণত মাসিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োজিত। এদের সদস্যগণ হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ের ক্লার্ক, কম্পাউন্ডার, স্কুল শিক্ষক, ফিটার, সার্ভেয়ার, মিডওয়াইফ, কম্পিউটার অপারেটর, বয়লার এটেন্ডেন্ড, মিস্ত্রি, ওয়েলডার, প্যাথলজিষ্ট নার্স- কাম মিড ওয়াইফারী, ও ধাত্রী শ্রেণীর কর্মচারী/শ্রমিক। তারা ও তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য মালিক পক্ষের সাথে আলোচনা ও যৌথ দরকষাকষি করে থাকে। এদের সংখ্যা প্রায় ২০০০-৩০০০ জন এর মধ্যে।

চা শ্রমিকের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দপ্তরগুলোর মধ্যে শ্রম পরিদপ্তরের অধীনে চা বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে একজন ডাক্তারসহ অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ সরবরাহ, বিনোদন, ও পরিবার কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয় । এছাড়াও শ্রমিক প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের শ্রম আইনসহ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিল্প সর্ম্পক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমিকদের সচেতন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বিরোধ হলে মধ্যস্থতা ও সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মিটানো হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যম প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়, যেমন:- দুর্ঘটনায় আহত, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ও অসুস্থ হলে চিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে। এ বছর ৭ জন চা বাগানের শ্রমিকের সন্তান যারা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে তাদের পড়াশুনার খরচ বাবদ প্রত্যেককে ৩০,০০০/- টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড বিভিন্ন সেক্টরের পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে থাকে। চা শ্রমিকদের জন্য সর্বশেষ ২০০৬ সালে মজুরি নির্ধারণ করা হয়। তারপর থেকে চা শ্রমিকরা তাদের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির মাধ্যমে ২ বছর অন্তর তাদের মজুরি ও অন্যান্য পাওনাধি চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করছে। শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে রয়েছে শ্রম আদালত।

আওয়ামীলীগ সরকারের যথাযথ বিভিন্ন পদক্ষেপে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মডেল সকল সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি চা-শিল্প ও চা-শ্রমিকের যথেষ্ট উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে ছিল মাত্র ১৫৩ টি চা বাগান, বর্তমানে রয়েছে ১৬৩ টি চা-বাগান। এছাড়াও রয়েছে অনেক ছোট ফাঁড়ি বাগান। উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণে শ্রমিকের কল্যাণ ও হয়েছে অনেক। শ্রমিকরা আজ আর শোষিত হচ্ছে না তারা বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

আমাদের সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জিবীত হয়ে সৎ, ন্যায়, নিষ্ঠার সাথে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে দিয়ে যেতে হবে এক আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক বঙ্গবন্ধুর আর্দশ যা নিয়ে তারা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

আমাদের গান

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ফিরোজ

রাত নেই দিন নেই
ঘড় ঘড় ঘড়
মেশিনের চাকাটিতে
তোলে শুধু ঝড়।
রেল বাস লঞ্চেতে
ঝড়ে শুধু ঘাম
ট্রাম ট্রেন ইঞ্জিনে
লেখা থাকে নাম
সভ্যতা-নেমপ্লেট
এ দু হাতে গড়ি
শাসন শোষণে থেকে
আমরা যে লড়ি।
পৃথিবীতে কত জাতি
দেশ কত নাম
আমরাতো এক জাতি
পাই না যে দাম
জনসভা টকশোতে
ঝড় তোলে জ্ঞানী,
ঘাম থেকে শরীরেতে
চোখে থাকে পানি।
না পাওয়ার অভিযোগ
কখনোই নেই
নিতে জানিনাতো কিছু
আমরা যে দেই।
এই দিনে চলে এসো
হাতে হাত রাখি
পৃথিবীর ব্যর্থতা
বুক দিয়ে ঢাকি।

মহান মে দিবস: শ্রমিকের অধিকার

আহসান হাবীব মোল্লা
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ।

মহান মে দিবস শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি দিন। শ্রমিকের ন্যায্য দাবির দিন। শ্রমিকদের প্রতি একত্মতা ও সহমর্মিতা প্রকাশের দিন। মে দিবস হলো শ্রমিকের গর্বের দিন। শ্রমিকের আত্মমর্যাদার দিন। শ্রমিকের প্রাপ্তির দিন। এ দিনটি সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জ্বলে ওঠার ও দাবি আদায়ের দিন। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছেন আমি তাঁদের চির অম্লান স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের "হে" মার্কেটে শ্রমিক শ্রেণীর রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের শোষণ, বঞ্চনা নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার বহিঃশিখা জ্বলে উঠেছে। দু'শত বছরের ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান মে দিবসের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শতশত শ্রমজীবী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাদের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তিনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পাকিস্তানী ও তাদের দোসরদের পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে চালু করে শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপরে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের দ্বিতীয় মেয়াদে ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ৩য় মেয়াদেও তিনি দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছেন। এরই মধ্যে তিনি শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। ইতোমধ্যে শ্রমিক কর্মচারিদের জন্য দুইবার জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছেন। প্রায় প্রতিটি শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছেন।

দেশের শিল্প সেক্টরে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরকে আরো গতিশীল করেছেন শ্রমিকদের স্বার্থে। জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আরো গতিশীল উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে একটি অমিত সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান শ্রমিকদরদী সরকার গার্মেন্টস সেক্টরের অস্থিরতা দুর করে কারখানা সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করেছেন। তিনি সকল সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি ন্যূনতম ৫৩০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। একইভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-মজুরি কয়েকগুন বৃদ্ধি করেছেন।

মহান মে দিবসের চেতনাকে বুকে ধারণ করে সত্যিকার অর্থে তা বাস্তবে রূপান্তরিত করে দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা সষ্ঠু ও কল্যাণমূখী করতে হবে। মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্কর মহান মে দিবসের চেতনা দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রয়াসকে আরো বেগবান করবে। শ্রমিক সমাজ ও শিল্পকে বাঁচাতে হবে। দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্গম পথকে অতিক্রম করাই হবে আমাদের আজকের দিনের প্রত্যাশা।

"দুনিয়ার মজদুর এক হও
জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু"

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অনুপ্রেরণা-

আনোয়ার হোসেন খোকন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশন- ২১৬২

মহান মে দিবস- শ্রমজীবী মানুষের বীরত্বগাঁথা আত্মত্যাগের ইতিহাস। শ্রমিকের শ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে সামাজিক সভ্যতা। সভ্যতার কারিগর শ্রমজীবী মানুষ। যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৮৬ সাল থেকে ২০১৭ একে একে কেটে গেছে ১৩১ বছর। ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ১৮৮৬ সালের মে মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরের রাজপথ শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। আর ঐদিনের সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল গোটা বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণি, অগনিত সকল সংগঠনের পাশে থেকে বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশন ও মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়ার দিন পহেলা মে, এ দিনটি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে। মালিক পক্ষ দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের সীমা ও ন্যায্য মুজুরি মেনে নিতে বাধ্য হয়। মে দিবসের দিকে খেয়াল করলেই বুঝা যায় অধিকার কেউ দেয়না আদায় করে নিতে হয়। পৃথিবীর সকল অধিকার আদায়ের ঘটনার দিকে খেয়াল দিলে প্রমান পাওয়া যায়। অধিকার কারো দয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, অধিকার সংগ্রামের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আর তাইতো জ্ঞানীরা লিখেছেন একতাই শক্তি শৃংখলাই মুক্তি, তাইতো সকল ট্রেডে শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ থেকে ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর পহেলা মে'র পথ ধরে শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকৃত হয়। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শিল্প ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক দরকষাকষি বৈধতা পায়, মালিক ও শ্রমিক পরে মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টিতে কালের বিবর্তনে অবদান রেখেছে মহান মে দিবসের চেতনা। ১৮৮৬ সালের রক্ত ক্ষরণের এ দিনটি শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে সারা দুনিয়ায়। আর তাইতো শ্লোগান ওঠেছে "দুনিয়ার মজদুর এক হও" আর ঐ দিনের বুলেটবিদ্ধ শ্রমিকদের রক্তে ভেজা আন্দোলন-সংগ্রামের লাল পতাকা হিসাবে স্বীকৃতি পায় শ্রমজীবী মানুষের নিকট। মহান মে দিবসের শিক্ষা শ্রমজীবীদের সামনে অপার সম্ভাবনার ধার খুলে দেয়। মে দিবস বিশ্বজুড়ে সমাজবাদী চেতনার ও বিকাশ ঘটায়। একই সঙ্গে পুজিবাদের মানবিক বিকাশে ও অবদান রাখে।

তাইতো বাংলাদেশের সর্বকালের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু-ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"। বঙ্গবন্ধুর ঐ ঐতিহাসিক উক্তি নিঃসন্দেহে শ্রমজীবী মানুষের প্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু এমনিতেই এ উক্তি করেননি উনি উপলব্ধি করেছেন এবং পরে তা প্রকাশ করেছেন।

আমি শ্রদ্ধাজানাই ১৮৮৬ সালের ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে মে আন্দোলনের জন্য যাদের ফাঁসি হয়েছিল, স্পাইস, অ্যাঙ্গেলস, ফিসার, পারসন্সসহ যারা জীবন দিয়েছিল। ফাঁসিতে ঝুলানোর ঠিক পূর্ব মুহুর্তে স্পাইস বলে গিয়েছিল, এমন একদিন আসবে, যেদিন আমাদের ফাঁসি দিয়ে যে কণ্ঠরোধ করা হলো, তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী কণ্ঠের বিস্ফোরণ ঘটবে শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক। বৃথা যায়নি শ্রমিক নেতা স্পাইসের সেই গর্জন, আজ গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবী।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

বাঙালির মুক্তির সনদ

উম্মে আছমা শিখা
সহ অধ্যক্ষ
সানফ্লাওয়ার স্কুল, খালিশপুর, খুলনা।

প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে এলেন তিনি
কালো কোটে আবৃত সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী
চোখে পাওয়ার ওয়ালা মোটা ফ্রেমের চশমা
স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় তিনি হেঁটে চললেন ...

তুলোট মেঘের আনাগোনা সেদিন আকাশ জুড়ে
সূর্যরশ্মিরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এলাকাময়
দুলেছিলো দুরন্ত পবন ঝিরঝির লাবণ্যে
অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো নির্মল প্রকৃতি
চারিদিক ঝরে যাওয়া পাতার শব্দে টইটুম্বুর
ফাগুনের নতুন পত্র পল্লবের মূর্হুমূর্হু ধ্বনি
কলকাকলীর মধুর গুঞ্জরীত ব্যঞ্জনাময়তা
লক্ষ লক্ষ জনতার আকাশ ভাঙা জয়োল্লাস
ঘোষিত হবে আজ মুক্তির সনদ, প্রাণের গান
কবির কণ্ঠে ঘোষিত হবে শ্রেষ্ঠ কবিতা খানি
জয়বাংলার সাগরে জেগে উঠবে নব চেতনা।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সেদিন নেমেছিল জনতার ঢল
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যেন নেমে আসে
বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার হৃদ্ধকণ্ঠ
কামার কুমার জেলে চাষী ঘরে ছিলনা কেউই
হোস্টেল থেকে ছাত্রছাত্রীর ঢল নেমেছিলো এদিন
কলকারখানা রেখে চলে আসে শ্রমিকের স্রোত
বন্ধ হয়ে যায় যন্ত্রযানের চাকা স্টিয়ারিং
লাল শালুতে ছেয়ে যায় উদ্যানের আকাশ।

পলাশী থেকে ফার্মগেট, পল্টন থেকে জিগাতলা
তিল ধারনের ঠাঁই নেই কোথাও একবিন্দুও
ধুবলো ঘাস, গাছের মগ ডাল, বাড়ির ছাদ
পীচঢালা কালো রাজপথ, অলিগলি খেলারমাঠ
উপছে পড়ছে সযত্নে লালিত স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশে
ধুতি লুঙ্গি প্যান্ট পাজামা সার্ট পাঞ্জাবী একাকার
চটি নাগরা পায়ে লক্ষ লক্ষ জনতার হৃদধ্বনি ....

কবির আগমনে কেঁপে ওঠে রাষ্ট্র যন্ত্রের কর্তারা
নড়ে চড়ে বসে ইয়াহিয়া টিক্কা খানের ছায়াত্মারা
আনন্দে দুলে ওঠে পোড় খাওয়া বাঙালি সমাজ
সুদৃশ্য মঞ্চে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি উঠলেন
করতালি হর্ষধ্বনি হৃদ কাঁপুনীতে তিনি দেখলেন
হাত দোলালেন, মাথা নাড়লেন, তর্জনী তুললেন
এবং
বজ্রকণ্ঠে ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন-
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
সেই থেকে আমরা পেলাম মুক্তির সনদ, মুক্তির গান।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

অংশগ্রহণকারী কমিটি এবং শ্রম পরিদপ্তর

মহববত হোসাইন
সহকারী শ্রম পরিচালক

অন্যূন পঞ্চাশ জন শ্রমিক সাধারণত: কর্মরত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে মালিক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষভাবে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবেন"। এটা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর ধারা ২০৫(১) এ উল্লেখ রয়েছে। এখানে এটা প্রতিয়মান যে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করার জন্য মালিককে আইনগতভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং এটা বাধ্যতামূলক। এ কমিটি মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হবে। আইন ও বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণকারী কমিটি হচ্ছে মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি ফোরাম যারা প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবেন এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি, শ্রম আইন বাস্তবায়ন, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা, উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা অর্জনসহ নানাবিধ বিষয়ে কাজ করবেন। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে সর্বনিম্ন ৬ এবং সর্বোচ্চ ৩০ জন। কমিটির কলেবর কারখানার মোট শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল।

সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা	কমিটির সদস্য সংখ্যা	
১-১০০	অনধিক	৬
১০১-৪০০	অনধিক	১০
৪০১-৮০০	অনধিক	১২
৮০১-১৫০০	অনধিক	১৪
১৫০১-৩০০০	অনধিক	১৮
৩০০১-৫০০০	অনধিক	২২
৫০০১-৭৫০০	অনধিক	২৪
৭৫০১-ততোধিক	অনধিক	৩০

শ্রমিক প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্থায়ী শ্রমিকের গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। তবে যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে সে প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মনোনয়নের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারিত হবে। শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা মালিকের প্রতিনিধির সংখ্যার চেয়ে কম হবে না।

শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মালিক পক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে শ্রম পরিচালককে অবহিত করবে। শ্রম পরিচালক নির্বাচন কার্যক্রম তদারকি করতে পারবেন। নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনায় কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মালিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্যূন ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করবে। শ্রম বিধিমালা অনুসারে মালিক পক্ষে ২ জন এবং শ্রমিক পক্ষে ৩ জন,

মোট ৫ জনের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি বিজ্ঞপ্তি আকারে নির্বাচনী তফসিল, ভোটার তালিকা, মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই-বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, চূড়ান্ত প্রার্থি তালিকা প্রকাশ ও নির্বাচনী প্রতিক বরাদ্দসহ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। উক্ত ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি প্রার্থিদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগ দেবেন। প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ কর্ম দিবসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। এরপর পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির তালিকা শ্রম পরিচালককে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

সদস্যদের নির্বাচনে প্রার্থি হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরির বয়স কমপক্ষে ৬ মাস হতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন নারী বা ১০ শতাংশ নারী শ্রমিক হলে তাদের মধ্য থেকে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তার মনোনীত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কমিটির সভাপতি হবে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে সহ-সভাপতি হবে। পার্সোনেল অফিসার বা ওয়েলফেয়ার অফিসার বা অনুরূপ কোন কর্মকর্তা মালিক পক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হবেন এবং কমিটিতে সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রতি দুই মাসে অন্তত: একবার অংশপ্রহণকারী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার কার্যবিবরণী সাত দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালক ও সালিসকারীর কাছে পাঠাতে হবে। কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মালিক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন।

শ্রম পরিদপ্তর তথা শ্রম পরিচালক বা তার প্রতিনিধি আইন অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ-কর্ম তত্ত্বাবধান করে থাকে [বা:শ্র:আ: ধারা-৩১৭(৪)(চ)] শ্রম পরিদপ্তর অত্যন্ত কার্যকরী টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে অন্যান্য কাজের সাথে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান করছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুনামও ইতোমধ্যে অর্জন করছে শ্রম পরিদপ্তরের টিম। গোপন ব্যালটে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শতভাগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হচ্ছে। শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে শ্রম পরিদপ্তরের অধীন চারটি বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের নেতৃত্বে এ পর্যন্ত (১৫.০৩.২০১৭) গোপন ব্যালটে নির্বাচনের মাধ্যমে যতগুলো অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হয়েছে তার বিভাগওয়ারী তথ্য নিচে প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	অংশগ্রহণকারী কমিটির সংখ্যা
০১	ঢাকা	৪৮১
০২	চট্টগ্রাম	২০৩
০৩	খুলনা	৫৭
০৪	রাজশাহী	০৬

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কমিটি গুলো মূলত গত ০১ বছরে গঠিত হয়েছে শ্রম পরিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে। এছাড়া কিছু অংশগ্রহণকারী কমিটির সভার কার্যবিবরণী শ্রম দপ্তরে বিচ্ছিন্নভাবে জমা হচ্ছে। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বিভিন্ন কারখানায় বিশেষত পোশাক কারখানায় আগামী ২/৩ বছরে শতভাগ অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হবে বলে আশা করা যায়। অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনে পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক এ সাফল্যের জন্য শ্রম দপ্তরের পাশাপাশি বায়ার,বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ, ই.টি.আই ইত্যাদি সংগঠনের ভূমিকা ও প্রশংসার দাবীদার।

অতঃপর আবারও সন্ধ্যা

নাফিজা খানম
প্রভাষক
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী, গাজীপুর।

বিকেলের সোনালী রোদটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। অর্ধঅস্তমিত সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায়। মেঘেদের আগমনে সূর্যটা ডুবলো কি না ভালভাবে খেয়াল করা গেল না। তবে সন্ধ্যাকালীন অন্ধকারটা জানান দিয়ে যায় যে সূর্য ডুবে গেছে। এক্ষনি মাগরিবের আযান পড়বে। জেবুর মনটা ছটফট করছে। কখন ছুটি হবে, কখন বাসায় ফিরবে।

১৬ জানুয়ারী, সোমবার, ২০১৭। জেবু পাঁচ মাসের অন্ত:সত্ত্বা। জীবনের প্রথম অতিথির আগমন উপলক্ষ্যে তার মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তোত্তেজনা কাজ করছে। একই সাথে চিন্তার বলিরেখা দোল দিয়ে যায় মনের এপাড় ওপাড়। রিকশা চালক স্বামীর সংসারে একে অন্যের। দ্বিতীয় কোন সদস্য নেই। যে আসার অপেক্ষায়, সেই হবে তাদের পরবর্তী সদস্য। অজপাড়া থেকে উঠে আসা জেবুর শহুরে জীবন পোশাক কারখানাতেই সীমাবদ্ধ। স্বামীর সংগে ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরা তার কোন দিনও হয়নি। ১৯ বছর পার হওয়া জেবুর ২৮ বছরের স্বামী। ৯ বছরের তফাতটা যতটা-না বুঝে, তার চেয়ে বেশি বুঝে সংসার। সময়ের জলঘরিতে সংসারই তার একমাত্র বিনোদন। সারাদিন রিকশা টেনে রাতে বাসায় ফিরে ঘুমটাই যেখানে মস্ত বিনোদন, সেখানে অন্য বিনোদন শুধু দূর থেকে ভেসে আসা গানের আবছা সুর । যেটা মেঘে ঢাকা সূর্যের মতই মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের শব্দে ঢেকে যায়। সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে কাজের ক্ষেত্রে নেমে পড়ে দুজন। সারাদিন আর দেখা হয় না। শুধু দুপুরের খাবার সময় ফোনে একটু কথা হয়, এই যা। তাতেও ভালবাসার কমতি নেই। একের প্রতি অন্যের টানের কমতি নেই। রাতে বাসায় ফেরার সময় বউয়ের জন্য হাতে করে কিছু নিয়ে যাওয়া রিকশাচালক স্বামীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারী, বুধবার, ২০১৭। জেবু ৬ মাসের অন্ত:সত্ত্বা। দিনকে দিন জেবুর শরীর দুর্বল হয়ে আসছে। হাটা চলা করতে হচ্ছে একটু সাবধানে। দুপুর বারটা বেজে ত্রিশ মিনিট। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ জেবু তার কর্মস্থলে অনুপস্থিত। তার টেবিলে কাজ জমছে। সুপারভাইজার কয়েকবার ডাকাডাকি করে না পেয়ে কিছু অকথ্য এবং অশ্রাব্য গালাগাল পাড়লো। পাঠকদের জন্য সেসব গালি উল্লেখ যোগ্য নয় বলে দেয়া গেল না। তার টেবিলের কিছু কাজ আরেকজনকে দেয়ার জন্য সুফিয়াকে দায়িত্ব দেয়া হ'ল। সুফিয়া যাওয়ার সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে ফেরার সময় আবারও একই শব্দ শুনলো। তৎক্ষণাৎ সে দাড়িঁয়ে গেল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, কোথা থেকে আসছে। আন্দাজ করে টয়লেটের দরজা ধাক্কা দিতেই দেখে জেবু টয়লেটের ফ্লোরে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ চিৎকার চেচামেচি করে সবাইকে জড়ো করলো। জেবুকে কয়েকজন ধরে মাথায় পানি ঢাললো। একটু বিশ্রাম নেয়ার পর সুস্থবোধ করলে সুপারভাইজার তাকে কাজে যেতে নির্দেশ দিল। দরদর করে তার চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে টেবিলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না পেরে আবারও ফ্লোরে পরে গেল। কয়েকজন তাকে ধরে ফ্লোরে শুইয়ে দিল। শুরু হলো হট্টগোল। শ্রমিকরা হৈ হৈ করে নিচে নেমে গেল। কিন্তু ততক্ষণে প্রধান গেটের তালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একজন শ্রমিকও বের হতে পারলো না। সবাই যে যার মত করে চিৎকার, চেচামেচি করছে। মালিককে দেখে নেয়ার হুমকি আর দারোয়ানকে কচুকাটা করে ফেলার ভয়ানক প্রস্তাব।

দুপুর একটা বেজে পয়তাল্লিশ মিনিট। ফ্লোরে কাতরাচ্ছে অসুস্থ জেবু। সুফিয়া সাধ্যমতো শুশ্রুষা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হাসপাতালে নেয়া জরুরি। কিন্তু প্রধান গেট বন্ধ থাকায় সে সুযোগ হচ্ছে না।

ইতোমধ্যে শ্রমিকরা ভাংচুর শুরু করেছে। কয়েকজন হন্যে হয়ে সুপারভাইজারকে খুঁজছে, কোথাও খুঁজে পায়নি। এদিকে শ্রমিকরা ভাংচুরের সাথে সমস্বরে শ্লোগান দিচ্ছে-

একদফা এক দাবি, ভেঙ্গে ফেলো তালাচাবি
শ্রমিক মেরে মালিক ধনী, মালিকের এক শয়তানি।

বিকেল চারটা। প্রধান গেট ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম। মালিক পক্ষের কয়েকজন লোক সমঝোতার জন্য এসে মার খেয়ে গেছে। মালিক পক্ষ উপায়ান্তর না দেখে শ্রম দপ্তর এর দারস্থ হ'ল। ঘটনার তদন্ত এবং সুরাহার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি চৌকস তদন্ত দল কারখানায় পাঠানো হলো। তাদের হস্তক্ষেপে জেবুকে হাসপাতালে নেয়া হলো। তদন্ত দল খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের দূরত্ব দূরীকরনে মালিক পক্ষ অতীতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তদন্ত দল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসে তাদের দাবি শুনল। তাদের দাবির প্রেক্ষিত এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ এক সাথে আলোচনায় বসার এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের নানাবিধ বিষয় জানানোর জন্য সন্ধ্যা ছয়টায় কারখানার ফ্লোরেই আয়োজন করা হলো। দুই পক্ষের দাবি ও প্রস্তাব আলোচনা করে তদন্ত দল দুই পক্ষকেই স্বাভাবিকভাবে সবকিছু মেনে নেয়ার প্রস্তাব পেশ করলো। দুই পক্ষ সব কিছু মেনে নিল। গেটের সামনে তখনও আন্দোলন পুরোপুরি থামেনি। শ্রমিক মালিকের সফল আলোচনার পর নিচে গিয়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল সবাইকে আন্দোলন থামানোর অনুরোধ জানায়। মালিক পক্ষ তাদের দাবি দাওয়া মেনে নেয়ার বিষয়টি জানালে সবাই হর্ষোল্লাসে মেতে উঠলো।

পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার. ২০১৭। সবাই কাজে যোগদান করলো। জেবু তার কাজ শেষে সন্ধ্যা ছয়টায় বের হয়ে গেল।

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

সরকারের ভূমিকা- শ্রমিকদের অধিকার

মো. আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সম্পাদক
ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)

মহান মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ও শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রাপ্তির দিন। সারাবিশ্বের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আজও শ্রমিক শ্রেণি এবং শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। মে দিবস শুধুমাত্র শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের দিনই নয়- এ দিনটি বিশ্বের সকল উন্নয়নমনা মেহনতি মানুষের ঐক্যের দিন এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিন।

মহান মে দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মে দিবস অর্জনের একশত ত্রিশ বছর পরও এখনো শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি মেলেনি। এখনো শ্রমিক শোষণ বন্ধ হয়নি। বিশেষত নির্মাণ শ্রমিকরা এখনো নানাভাবে শোষিত ও বঞ্চিত। নির্মাণ শিল্প যাদের হাত ধরে ব্যাপকতর হচ্ছে, যারা গড়ে তুলেছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা ও সুরম্য প্রাসাদ, নিরাপদ ও আরামদায়ক আবাসন তাদের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। কর্মস্থলে এখনো তাদের জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নির্মাণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সেখানে নেই শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ কর্মপরিবেশ। এর ফলে প্রতিদিন কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। অঙ্গহানী থেকে আজীবন পঙ্গু অথবা মৃত্যু হচ্ছে। তাদের এখনো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। আহত-নিহত হলে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এখনো তারা পায় না। বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে জীবনের নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্ম পরিবেশ আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদানে মালিকের অনীহা, ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাজের জন্য কারিগরি জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করাও মালিকদের ইমারত নির্মাণ আইন না মানার কারণে দূর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। অন্যদিকে বিদেশে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। বিদেশে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের নামে একটি কুচক্রীমহল দেশের গ্রামগঞ্জের সহজ-সরল মানুষের নিকট হতে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে নির্মাণ শ্রমিক পাঠায়। ঐ শ্রমিকদের বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসে অথবা জেলও খাটতে হয়। অনেকে সেখানে মারাও যায়। উদ্ভুত পরিস্থিতি উত্তরণে সরকারিভাবে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণ জরুরী।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) দীর্ঘ দুই যুগের উর্ধ্বে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু নির্মাণ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার একান্ত ইচ্ছায় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজকে নির্মাণ শিল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার কিছু কিছু সুফল নির্মাণ শ্রমিকেরা পেতে শুরু করেছে। যেমন নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠি বীমার আওতায় আনা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আহত, কর্মস্থলে দূর্ঘটনায় নিহত, অসহায়, অসুস্থ নির্মাণ শ্রমিকদের, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান। এসব কর্মসূচিতে নির্মাণ শ্রমিকরা উপকৃত হচ্ছে। যার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভা যথারীতি দুই মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য অনুমোদিত অর্থ দ্রুত অসহায় শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা প্রয়োজন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যে জনবল কর্মরত রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের কর্মস্থল নিরাপদ কর্ম পরিবেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে জনবল বৃদ্ধি করা, জেলা-উপজেলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দপ্তর স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য অতি দ্রুত নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

(১) সরকারি উদ্যোগে রাজধানী ঢাকা শহরে থানা ও ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং সারাদেশে জেলা নির্মাণ কলোনী স্থাপন করে সুলভমূল্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করা। (২) নির্মাণ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। (৩) শ্রম আইনের আওতায় নির্মাণ শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পেনশন স্কীম চালু, দূর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক- এর ১০ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিক- এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। (৪) নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার বাস্তবায়নে যাতে সহজে আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা/উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন করা ৪২ দিনের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করা। (৫) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমুখী আরো কর্মসূচি গ্রহণ করা। (৬) শ্রম আইনের ৩২৩ ধারা মোতাবেক জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠনে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা। (৭) নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সস্তা ও সুলভমূল্যে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা। (৮) কর্মস্থলে নির্মাণ শ্রমিকরা যাতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা। (৯) সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শুধু সার্ভিস চার্জ নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বর্তমানে বিদেশে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকদের হয়রানি ও দূর্ভোগ বন্ধ করা। (১০) সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় শহরে থানা ভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলায় শ্রম ছাউনি নির্মাণ করা। (১১) নারী নির্মাণ শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করা। (১২) নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক রেজিষ্ট্রার খাতা রাখার বিধান সকল নির্মাণাধীন ভবনে বাস্তবায়ন করা।

শ্রমিকদের অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনতে সরকারের আরো ভূমিকা প্রয়োজন। তাহলেই দেশের শিল্পায়নের উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

**"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"**

মহান মে দিবসের ডাক

নুরুল ইসলাম
সাধারন সম্পাদক
ইউনাইটেড ফেডারেশন অব
গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স (UFGW)

নির্ধারিত কর্মঘন্টার দাবিতে আঠার শত ষাটের দশকে প্রথম ভারত বর্ষে এবং আঠার শত সত্তর দশকে অস্ট্রলিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আন্দোলন বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেনি। একই দাবিতে ১৯৮৬ সনের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটের রুটি কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাও আন্দোলনে অংশ নেয়। শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ঠেকানোর জন্য মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডা বাহিনীর আক্রমনে ২,৩ ও ৪ মে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং অনেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে বিচারের নামে প্রহসন করে আগস্ট স্পাইজ, আরবাড্ পারশন, লুইস লিঙ্গে, জর্জ এ্যাঞ্জেল, এডলফ ফিসারকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

হে মার্কেটের নিহত শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে ১৮৮৯ সনে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রথম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে মে মাসের প্রথম দিবসটি আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হে মার্কেটের নিহত শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১ মে বাংলাদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

মহান মে দিবস বিশ্বের মেহনতি মানুষের ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপ্ত হওয়ার একটি দিন। সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এ দিবসটি নিজ অধিকার আদায়ের প্রেরনার চিরন্তন উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ ও নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদায় মহান মে দিবস পালন করে। এ দিনে বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান মে দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য "শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি"। অভিষ্ঠ্য লক্ষ্যে পৌছাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের জন্য শ্রমিক-মালিক ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক মালিকের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের পাশাপাশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিক মালিক সু-সর্ম্পক এবং একে অন্যের প্রতি অবিচল আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষ জনগোষ্ঠি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। একই সাথে শ্রমিকদের ন্যায়ানুগ মজুরি প্রদানসহ পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এ সকল অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেই প্রতীয়মান হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রমিদের অধিকার ও মর্যাদা সুমুন্নত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শ্রমিক বান্ধব উন্নয়নের রোল মডেল ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অকান্ত পরিশ্রমের ফসল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা এখনও বাঁচার মতো মজুরি, আই এল ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ অন্যান্য ন্যায়সংগত অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে গার্মেন্টস শ্রমিকরা শারীরিক, মানসিকভাবে নির্যাতিত ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নেই। মুক্ত

বাজার অর্থনীতির দাপটে নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্যের কারনে গার্মেন্টস শ্রমিক সহ স্বল্প ও সীমিত আয়ের শ্রমিকদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। ভাত, কাপড়, মাথা গোজার ঠাঁই, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও আমাদের দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজনীয় মানসম্মত খাবার খেতে না পারায় ক্যালরী ও পুষ্টির অভাবে শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, আক্রান্ত হচ্ছে নানা রোগ ব্যাধিতে। শহর উপশহরগুলোতে বাড়ী ভাড়া দফায় দফায় বাড়ানোর ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের আয়ের বড় অংশ চলে যায় বাড়ী ভাড়া দিতেই। বাড়ী ভাড়া মিটিয়ে খাদ্যসহ জীবন ধারনের অন্যসব প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন্য হাতে টাকা থাকে খুব কমই।

তারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্ন পূরণের পথ খুঁজে পায়না। ব্যাক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নানাভাবে বাধাগ্রস্থ করা হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শ্রমিকই মূলত অসংগঠিত। নির্মান, চাতাল, পরিবহন, রিক্সা, দর্জি, হোটেল, সেবা খাতসহ অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি। এসব অসংগঠিত খাতের শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে কাজ কারানো হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। চাকুরির সময়সীমা কিংবা ছুটির বিধান অনেক ক্ষেত্রে নেই। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সাথে সংগঠিত না হওয়ায় অ-প্রাাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে কোন ধরনের দরকষাকষির ও সুযোগ পায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শ্রমিকদের মজুরি নির্ভর করে মালিকদের মর্জির উপর। এদের মূলত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। ওভারটাইম ভাতা না দিয়ে এসব শ্রমিকদের ৮ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের কার্যত কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় দরকষাকষির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নামমাত্র মজুরিতেই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবসের চেতনায় জীবন গড়ি, জঙ্গীবাদ নির্মূল করি

সুলতান আহম্মদ
অর্থ বিষয়ক সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক লীগ

আজ ১ মে ২০১৭। মহান মে দিবস। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস হিসেবে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও পালিত হয়ে আসছে। আজ থেকে প্রায় ১৩১ বছর আগে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে জুতায় কারখানায় ধর্মঘট পালনকারী শ্রমিকদের আত্মাহুতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবসের বাস্তব ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছিল মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের ইতিহাস। বিরতিহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে নির্ধারিত হয়েছিল কর্মঘন্টা অর্থৎ কাজের সময়সীমা। কলে-কারখানায় শ্রমিকদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিষয় উপলব্ধি করে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মহান মে দিবসে শ্রমিক শ্রেণি তার নেতৃত্বে উদ্ধেলিত হয়। সারা বিশ্বের উৎসবমূখর পরিবেশে এ দিবসটি পালিত হয়। বাংলাদেশও সরকারিভাবে যথাযথ ভাবগাম্বীর্যের সাথে এ দিবসটি পালন করে আসছে। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে উৎসবমূখর পরিবেশে মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবার সরকারিভাবে মহান মে দিবসের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"। বাস্তবসম্মত মে দিবসের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। পূর্বের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মালিক বা শ্রমিক আলাদা কোন দল বা গোষ্ঠী নয়। এ হচ্ছে সমন্বিত গোষ্ঠী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পরিবেশে সমন্বিত গোষ্ঠীর উপর অধিতর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কেবল দেশের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, পণ্যের গুণগতমান অন্য সব দেশের পণ্যের গুণগতমানের তুলনায় কোক্রমেই কম না হয় সে সম্পর্কে প্রতিযোগিতা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা অত্যাবশ্যক। কারণ, এ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে উৎপাদিত পণ্য কেবল গুদামজাত হয়ে থাকবে। এ বিষয়গুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। মালিকদের বিশ্বায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যথাযথ কামর্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এছাড়া, প্রতি বছর বহু মানুষ বিশ্ব শ্রম বাজারে যুক্ত যচ্ছেন। বর্তমানে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা কম। বার্ষিক জিডিপি হার ৭.০৫%। মাথাপিছু আয় ১৪৬৭ ডলার। ফলে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক ভাল। তবে জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এসব সমস্যার বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং লাগামহীন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শ্রমিক এবং মালিকপক্ষ পূর্বের তুলনায় নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সারকারের ২০২১ সালের ভিশন এর দিকে বাংলাদেশ অর্থনীতি উন্নীত হয়ে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে মথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালার আলোকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, কন-ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই সেখানে পার্টিসিপেশন কমিটি বা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের মাধ্যমে শ্রম অসন্তোষ নিরসন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় ৭৬০০ এর অধিক ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। উক্ত ট্রেড ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রয়েছে। পূর্বে গার্মেন্টস সেক্টরে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বিষয়টি বেশ জটিলতার ছিল। কিন্তু বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকার তা সহজীকরণ করেছেন।

বর্তমানে সার্গেন্টস সেক্টরে প্রায় ৬০০ এর মত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। সরকার গার্মেন্টস সেক্টরের সমস্যাদি দ্রুত নিরসনের লক্ষ্যে ট্রাস্কফোর্স কমিটিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিক-অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার, মালিক-শ্রমিক এর ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসনের নিমিত্ত যুগোপযোগি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ইতোমধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকদের মুজুরি নির্ধারণ হয়েছে। মজুরি নির্ধারণের পর গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, তাদের পোষ্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন হওয়ার পর শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে, ইপিজেড শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সৃষ্টিসহ কতগুলো নতুন বিষয় এ আইনে স্থান পেয়েছে। চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ, ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন হওয়ায় শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ সাধানের জন্য বিধান নিশ্চিত করা, মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, নারী-পুরুষ সমান বেতন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, শিল্পে-মান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থায় মালিক-শ্রমিকদের বিশ্বাসকে অর্থবহ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্যদের ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা), গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে আহত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা) এবং চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফন বাবদ তার পরিবার ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে চলমান সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থাগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নদী ভাঙ্গন রোধ করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, রেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, সেই মূহুর্তে বর্ণিত বোর্ডকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এক শ্রেণির উচ্চবিলাসী কর্মকর্তা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সৃষ্ট খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের এই প্রতিষ্ঠনকে ভাঙ্গাসহ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন তথা যোগ্য দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর কার্যক্রম ধ্বংস করার পায়তারা করছে। এহেন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রমিক-কর্মচারী সিবিএ নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাওয়ায় ঈর্শ্বান্বিতে হয়ে বিএনপি-জামাত জোট দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যেকোন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর শ্রমিক-কর্মচারী তথা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রেণি আজ এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে অত্যন্ত সফলভাবে বর্তমান সরকার জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করছে। মেহনতি শ্রমিক শ্রেণি এ জঙ্গিবাদে জড়িত নয়। মহান মে দিবসের আত্ম চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে দেশ বিরোধী তথা শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিহত করার মাধ্যমে নিপীড়িত শ্রমিকদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলব এ হোক মহান মে দিবস-২০১৭ এর অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক মেহনতি মানুষের

মহান মে দিবস ও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্তি

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর

আমেরিকার ইতিহাসে ১৮৮৬ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের পুলিশি হামলায় নিহত ও পরবর্তীতে প্রহসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত শ্রমিকদের আত্মার মাগফেরাত কমনা করি এবং তাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। যুগে যুগে শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে আসছে। কখনো মালিক শ্রেণীর কর্তৃক আবার কখনো সরকার ও তার বাহিনী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণি নিগৃহীত ।

পাকিস্তান সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকল ভেঙ্গে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি যে বিজয় অর্জন করেছিল, তার মাধ্যমেই বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একটি দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি চেয়েছিলেন উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে। তাই তিনি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তপ থেকে তুলে এনে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

বাঙালি জাতির দূর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে দেশি ও বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রে এদেশের ভিতরে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতা বিরোধীচক্ররা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতির আশা আকাঙ্খা চিরতরে ধূলিস্যাৎ করে দেয়।

বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ইতোমধ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংশোধন করে আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধন করেছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পে-স্কেল প্রদান করে তাদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা না চাইতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই প্রথম বৈশাখী ভাতা প্রদান করেছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর করেছেন। দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের কাজ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ৩৮টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রয়াত্ব খাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করেছেন। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সরাসরি কৃষকদের সার-ডিজেল-বীজে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং প্রবাসে গমন ইচ্ছুক শ্রমিকদের অধিক আয়ের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর জন্য ইতিমধ্যে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যেসকল সেক্টরে বিদেশে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে সেসকল সেক্টরে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য ট্রেড কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার জন্য প্রতিটি জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে।

এমনকি প্রতিটি উপজেলা ও থানা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে বেকার যুব/যুব মহিলাদের চাকরির ব্যাবস্থা করে যাচ্ছে। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বার্গেনিং এজেন্ট হয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ১৬৬২.৫০ থেকে ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল ও পুঁজিবাদী শ্রেণির। এদেশের মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বিশাল অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশের চরিত্র প্রায় অভিন্ন। জননেত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শি নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। অচিরেই উন্নত দেশে পরিণত হবে। তাই সময় এসেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষদের এক কাতারে এসে এক দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার– 'অসম বিশ্বব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেল–বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়'।

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মে দিবস ও গৃহকর্মীর স্বার্থ সুরক্ষায় আমাদের করণীয়

লিপি দাস
কণ্ঠশিল্পী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
প্রশিক্ষক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতির পাশাপাশি অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। মহান মে দিবস আর্ন্তজাতিক সংহতি দিবস। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর পহেলা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" এই দিনের আন্তর্জাতিক শ্লোগান। শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রামেরই স্মারক এই মে দিবস। শ্রমিকের নিরন্তর শ্রম ও প্রচেষ্টায় জাতীয় অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয় প্রাণ প্রবাহ অথচ এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশী শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। মে দিবস আমাদের সকল প্রকার সামাজিক বিভেদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানব সাম্য প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক অঙ্গীকার ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান মে দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের গৃহকর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে সকলের সচেতনতা ও মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গৃহকর্মে নিযুক্ত। নানাবিধ কারণে গৃহকর্ম শ্রম হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে গৃহকর্মে নিযুক্তদের মানবাধিকার, মর্যাদা ও আইনী সুরক্ষা ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করতে হলে গৃহকর্মে নিযুক্ত এ বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মকে শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান, গৃহকর্মীদের জন্য শোভন কাজ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্রাম-বিনোদন-ছুটিসহ নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমুহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার অভিপ্রায়ে সরকার "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" প্রণয়ন করেছে।

সাম্প্রতিককালে গৃহকর্মীদের প্রতি বর্বরোচিত ও অমানবিক নির্যাতনের কিছু কিছু ঘটনা সমগ্র জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে গৃহকর্মীদের প্রতি আইনানুগ ও মানবিক আচরণ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হচ্ছে। দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চল-সর্বত্র গৃহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি। এ ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণিভূক্ত নিয়োগকারীর গৃহে কর্মরত গৃহকর্মীর জন্য শোভন কাজ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে মজুরি নির্ধারণ,খণ্ডকালীন গৃহকর্মীর মজুরি এবং মজুরি পরিশোধ বিষয়ে সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। গৃহকর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুসরণ করতে হবে। গৃহকর্মী নিয়োগের চুক্তিনামা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ১৪ বছর পূর্ণ করেছে তবে ১৮ বছরের কম এরূপ বয়সে গৃহকর্মে নিয়োজিত কিশোর বা কিশোরী কিংবা হালকা কাজের ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত শিশু নিয়োগ করতে হলে আইনানুগ অভিভাবকের সাথে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নিয়োগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়োগ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত, তবে মৌখিক চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐক্যমত্য সম্পন্ন হলে তা গৃহকর্মী ও নিয়োগকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত আলোচনাকালে কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐক্যমত্য (ক) নিয়োগের ধরন,(খ) নিয়োগের তারিখ (গ) মজুরি (ঘ) বিশ্রামের সময় ও ছুটি (ঙ) কাজের ধরণ (চ) গৃহকর্মীর থাকা খাওয়া (ছ) গৃহকর্মীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এবং (জ) গৃহকর্মীর বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। নিয়োগপত্র কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐক্যমত্যে উল্লেখিত শর্তসমুহ উভয়পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে উক্ত শর্তাবলী যাতে দেশের প্রচলিত আইন ও নীতির পরিপন্থি না হয়।

১২ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত কোন শিশুকে হালকা কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে তার স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য বিপদজ্জনক নয় অথবা শিক্ষাগ্রহণকে বিঘ্নিত করবেনা তা বিবেচনায় নিতে হবে, তবে ১২ বছরের নীচে কোন শিশুকে কোন কাজেই নিয়োগ দেয়া যাবে না । প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘন্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন। সন্তান-সম্ভবা গৃহকর্মীকে তার প্রসুতিকালীন ছুটি হিসেবে মোট ১৬ সপ্তাহ (প্রসবের পূর্বে ৪ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ১২ সপ্তাহ অথবা গৃহকর্মীর সুবিধা অনুসারে) স্ববেতনে মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত ভারী কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মাতৃস্বাস্থ্যের পরিচর্যায় সরকারি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করতে গৃহকর্তা সহায়তা করবেন।

গৃহকর্মীর চিকিৎসা ঃ অসুস্থ্য গৃহকর্মীকে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিয়োগকারী নিজ ব্যয়ে তার যথাযথ চিকাৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ধর্ম পালনের সুযোগ ঃ গৃহকর্মীকে স্বীয় ধর্ম পালনের সুযোগ করে দিতে হবে।
দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণঃ কর্মরত অবস্থায় কোন গৃহকর্মী দূর্ঘটনার শিকার হলে যথাযথ চিকিৎসাসহ দূর্ঘটনা ও ক্ষতির ধরণ অনুযায়ী নিয়োগকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

গৃহকর্মী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ কোনক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর উপর কোনো রকম হয়রানী ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমুহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করবে। গৃহকর্মী কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন অশ্লীল আচরণ, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছবিসহ সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন। গৃহকর্মী নিয়োগকারীকে অবহিত না করে গৃহ ত্যাগ কিংবা চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করে সাধারণ ডায়েরীভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। গৃহকর্মী না জানিয়ে চলে যাওয়ার সময় যদি অর্থ বা মালামাল সাথে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী দেশের প্রচলিত আইনের ও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন।

গৃহকর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় সরকারের দায়িত্বের পাশাপাশি নিয়োগকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গৃহকর্মীর ও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। যা সকলের মেনে চলা উচিৎ। মহান মে দিবসের শিক্ষা আমাদের সকলের বিবেককে আরো বেশী সচেতন ও তা মেনে চলার গতিকে ত্বরান্বিত করুক এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

মহান মে দিবস
শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা

মোরশেদা হাই
সহকারী সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মহান মে দিবসে আমরা স্মরণ করি সে সব শ্রমিকদের যাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ইতিহাস যুগে যুগে অম্লান হয়ে থাকবে। তাই কবির ভাষায় বলা হয় "মে দিন, ফুলের দিন- ইউরোপ টিউলিপ থেকে আবিরে মাতাল দিকবিদিক"। শিশুদের আমরা সেই ফুলের সাথে তুলনা করতে পারি। সেই ফুলের মত শিশুদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে ব্যাথাতুর হৃদয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন "সবচেয়ে খেতে ভালো মানুষের রক্ত"। শিশু আনন্দের মধ্যে লেখাপড়া শিখবে। শিশুদের হাতে থাকবে বই-খাতা, কলম, খেলনা কিন্তু, তার পরিবর্তে যদি শ্রমের কঠিন হাতুরি তার জীবন এবং সমাজের জন্য সুন্দর জাতিগঠনের অন্তরায়, সৃষ্টিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একটি দেশের সকল সুখ-সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে লেখক ক্রিস্টিনা রসেটি এদেরই কথা কল্পনা করে তার করুণ আর্তি ব্যক্ত করেছেন তার লেখা "Cry of The Children" এ। আজকের শিশু অদূর ভবিষ্যতের কর্ণধার। একটি সুস্থ্য সবল শিশুই আগামী দিনে একটি সুস্থ্য-সুন্দর জাতি বিনির্মানের প্রতিশুতি বহন করে। শিশু ভ্রুণ থেকে বিকশিত অঙ্গুর সে অঙ্কুর কে পূণ্য বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। যে জাতি তার বর্তমান প্রজন্মকে যেভাবে লালন করবে সে জাতির ভবিষ্যত ঠিক সেভাবেই নির্মিত হবে।

বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতিঃ

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। শ্রম মানুষের জীবন জীবিকার মাধ্যম, এ শ্রম কখনো কাঙ্খিত আবার কখনো অনাকাঙ্খিত। এ অনাকাঙ্খিত শ্রমকে বলা হয় শিশুশ্রম। জীবিকার সন্ধানে যাদের হাতে যে বয়সে বই, খাতা- পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধূলা করার কথা সে বয়সে ওই শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। বাংলাদেশের অপরিণত বয়সের অসংখ্য শিশু-কিশোর বাস-ট্রাকের হেলপার. কাঠমিস্ত্রির হেলপার, ইট-পাথর ভাঙ্গার কাজ করে। আবার অনেকে রিকশা-ভ্যান, ঠেলা গাড়ি চালায়, কেউ বাসা-বাড়িতে কাজ করে, কেউ বাদাম, চানাচুর, চা বিক্রি করে, কেউ বা হোটেলের বয়, কুলি, কেউ গার্মেন্টস কারখানায় এবং ফুটপাতে কাগজ কুড়িয়ে (টোকাই) বিক্রি করার কাজে নিয়োজিত আছে। এসব শিশু-কিশোর শ্রমিকদের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। তাছাড়া সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে অস্ত্র পরিবহনে, মাদকদ্রব্য সরবরাহে এবং মেয়ে কিশোরিদের পতিতাবৃত্তিতে। পৃথিবী হয়ে উঠছে একটা বিশাল যন্ত্রণার কারখানা। উলেখিত বিষয়গুলো কাল্পনিক নয়, যথেষ্ট সত্য নির্ভর ও বাস্তব। এতদসত্বেও দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের শিশুরা অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক?

শিশু শ্রমের কারণঃ

নবাগত শিশু মায়ের কোল থেকে যখন কথা বলতে শেখে তখন থেকে শুরু হয় শিশুর শিক্ষা জীবন। পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর জীবন গঠনের জন্য আবশ্যিক, কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এ সব পারিবারের শিশুরা নিয়মিত পায়না আহার, পায়না পুষ্টি। অপুষ্টি তাদের দেহ গঠনের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। যে সময় একটি শিশু সুন্দরভাবে, মহৎভাবে, বিচিত্র সুখ-দুঃখের আড়ম্বরভাবে মাঝে ক্রমশ বেড়ে ওঠার কথা সে সময় সে অন্ন- বস্ত্র- আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুড়ে বেড়ায় রাস্তা-ঘাটে। এভাবেই সে হয়ে ওঠে শ্রমিক, শিশু শ্রমিক। নান কারণে আমাদের দেশে শিশু শ্রমিকের হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে বণ্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দেশে সার্বিক অবক্ষয়রূপী সমাজ কাঠামো ইত্যাদি কারণগুলো শিশু শ্রমিকের হার বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

এ সব শিশু-কিশোর শ্রমিকের বয়স ৬-১৪ বছরের মধ্যে। কেবল বাংলাদেশেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল যে কোন দেশে যে কোন সময় তারা বেড়ে ওঠে একটা সুস্থ জীবনবোধের আশ্বাসে। অনেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেবে এবং নিজেকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলে। কিন্তু বাংলাদেশে এ পরিস্থিতে, বয়সের কথা বিবেচনা না করে পিতার পেশায় বা অন্যকোন পেশায় সন্তান নিয়োজিত হয়ে আয়-রোজগার করলে পিতামাতা একে লাভজনক মনে করেন। অন্যদিকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বা ঝরে পড়া শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। শিশুদের স্বল্প মূল্যে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তা, মালিক, ম্যানেজার, কর্তৃপক্ষও শিশুদের কাজে নিয়োগ করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী থাকে। আমাদের দেশের শতকরা ৩০% শিশু ৫/৬ বছর বয়স থেকেই শ্রমকে পেশা হিসেবে বেছে নেয় এবং নিতে বাধ্য হয়। বঞ্চিত, নিপীড়িত, গৃহহীন এ শিশু-কিশোরদের পর্যাপ্ত জীবন ব্যবস্থা তথা বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করতে না পারলে বিশ্বের কোন আইনই নিষ্ঠুর শ্রমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

শিশু শ্রমের প্রতিরোধের উপায়ঃ

শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রদেশগুলোতে আজ প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সমাজের বিত্তবান মানুষদের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। অবশ্য সরকারী পর্যায়ে শিশু শ্রম নিরোধকল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিভিন্ন এনজিও শিশুদের হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পূণর্বাসনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনসংখ্যার চাপ কমানো জরুরী প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে চাইলে সর্বপ্রথম বর্তমান প্রজন্মের স্বীকৃতি ও পরিচর্যা একান্ত অপরিহার্য। এ জন্য সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। দেশে নৈতিকতা ও সচেতনতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। দেশের অন্যান্য জটিল সমস্যার সঙ্গে শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতনের ব্যাপারটি অত্যন্ত যত্নসহকারে বিবেচনা করতে হবে। এই শিশুশ্রম থেকে উত্তরণের বহু উপায় রয়েছে। সকলের সচেতনা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজনে দরিদ্রপরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বৃত্তি চালু করা যেতে পারে। তাদেরকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

"শ্রমিক–মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

Toward Disability Inclusion in the Factories and Establishments

Md. Anwar Ullah
FCMA, Ph.D
Additional Inspector General (Joint Secretary), DIFE

1. Introduction:

Employment and decent work are the most effective means to contribute to the social inclusion of people with disabilities by breaking the vicious cycle of poverty and marginalization (WHO).There are between 785 to 975 million persons with disabilities of working aged (15 years or older). Most of them are living in Developing countries where informal sector economy is widespread (World Report on Disability & ILO 2013). In Asia and the Pacific region, there are 370 million persons with disabilities, 238 million of them of working age. Their unemployment rate is 80% or more. (World Report on Disability & ILO 2013). Recent analysis of the World Health Survey results of 51 countries gives employment rates of 52.8% for men with disability and 19.6% for women with disability, compared with 64.9% for non-disabled men, and 29.9% for non-disabled women.Average employment rate is found to be at 44% which is over half than that of their non-disabled counterparts (75%). Inactivity rate among non-disabled people was about 49%, 2.5 times higher than those without disabilities. Marginalization of people with disabilities is even more serious in the developing world.

Persons with disabilities make up one tenth of our population who are closely linked to poverty and can contribute in a significantway to the GDP of the country if their right to decent work is promoted and protected. Fortunately,the Government of Bangladesh has shown strong commitment towards the inclusion of personswith disabilities. Bangladesh ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesin 2007, making it pledge bound to ensure the rights of persons with disabilities in the country.To support this commitment, the government has made the inclusion of persons with disabilities in skills training and employment a key priority and set a 5% admission quota for students withdisabilities in all technical vocational training institutes.

Businesses have been slow in taking up this cause, however recently a shift is taking place.Employers are starting to recognize the benefits of disability inclusion in the workplace. Thosebusinesses with employees with disabilities say they tend to be more productive, more focusedon work and more loyal to the organization. Thus employing persons with disabilities is seen as awise business choice rather than charity or 'CSR.

Bangladesh is now well placed to enjoy the demographic dividend. According to the PopulationCensus 2011, 18.8 per cent of the country's population now belongs to age group 15-24 years and37.6 per cent to age group 25-54 years. Analyst suggest such demographic dividend will continue to next 20th year and then our industry will

encounter labor crisis. In this context, Persons with disabilities who are considered as untapped resources can contribute significantly to full fill the gap. The current status of employment of Persons with Disabilities is shown in Figure 1 and Figure 2.

2. Understanding disability

Disability is a complex phenomenon reflecting the interaction between features of a person's mind & body and characteristics of the society in which he or she lives. Overcoming the difficulties faced by people with disabilities requires interventions to remove environmental and social barriers (WHO). It is also said that Disability is based on a person's impairment to some basic life function (such as walking, seeing, remembering, etc.)and the interaction of that impairment with the environment. If the environment has many barriers and obstacles, the person will be more disabled, more disadvantaged and less about to participate in society and perform on the job. If the environment is barrier-free, the impact of the impairment is minimal or non-existent.This way of looking at disability is referred to as the social model of disability. It recognizes that persons with disabilities have rights, are not objects of charity and are limited by barriers that need to be removed. This social model forms the basis of legal definitions of disability. According to the types of disability a picture of current picture of persons with disabilities is shown in Figure 2.

Figure 1: Employment Status of Persons with Disabilities in Bangladesh

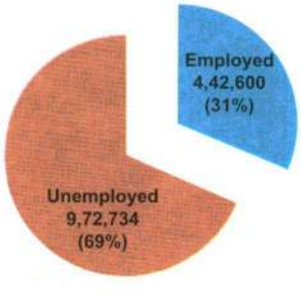

Source: Disability Detection Survey (DDS), 2015

Figure 2:Employment by Profession of Persons with Disabilities in Bangladesh

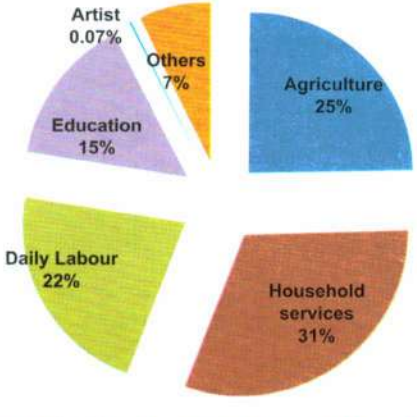

Source: Disability Detection Survey (DDS), 2015

Figure 2: Composition by Types of Persons with Disabilities in Bangladesh

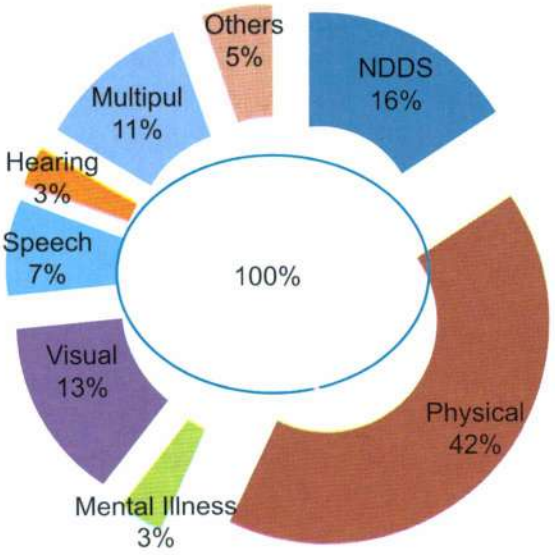

Source: Disability Detection Survey (DDS), 2015

3. TheCost of Exclusion

The exclusion of people with disabilities from work imposes a financial burden on the family, the community and other individuals or organizations that provide support and care, including major costs to social welfare and social security systems. Exclusion from work represents the loss of a significant amount of productivity and income and therefore investments to offset exclusion are required. Global evidence suggests that these factors translate into forgone GDP of about 5-7 percent. According to a paper commissioned by the World Bank, the cost of exclusion based on disability is found to be between US$1.37 trillion to $1.94 trillion of the global GDP. These economic costs to society are shared by all, including business.Based on the abovementioned estimation results, a back-of-the-envelope calculation reveals that the total cost of exclusion based on disability might be between US$137 billion to $194 billion of the OIC total GDP which is more than thetotal GDP size of Morocco alone.

According to the estimate in Bangladesh 16.29 million (BBS Census 2011) people are counted as Persons with Disabilities. If they earn at least $0.5 per day, Monthly total income will be $244 million and yearly total income of $2931 million would have been added with our GDP.

4.Legal, Economic and Social Framework on Disability Inclusion

Legal: The Constitution of the People's Republic of Bangladesh guarantees human rights and equal opportunities in all aspects of human life such as socio-political, education, and employment irrespective of race, caste, sex, ethnicity and disability. Article 29 of the constitution assures that there shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the republic.

The United Nations adopted the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) in 2006 and it was ratified by the Government of Bangladesh in 2007. More than 160 countries have ratified the UNCRPD, making it the accepted global standard for human rights for persons with disabilities.

Section 10 of the Rights and Protection of Persons with Disabilities Act 2013 calls for nondiscrimination andreasonable accommodation in the workplace, a quota, and for taxexemptions for private companies that hire.The National Skills Development Policy 2012 which requires that a minimum 5 percentenrollment of persons with disabilities in TVET institutions.

The UNCRPD includes employment rights provisions, including: 'the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others...(in) work that is freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities." (Article 27)

Economic: Efficiency and effectiveness of individual businesses; Stay in the job and can reduce the costsof job turnover; Empowers PWD and encourages social equality and self-reliance; Resource of skills and talents with strong skills & developed in daily life.

Social: Benefits of an inclusive society;Corporate citizenshipDignified and productive life; and Opportunities for social participation.

5.Barriers to Employment
Common Barriers are:

- Lack of information on employment opportunities and employers needs
- Employer's unawareness about PwDs for their ability to meet the needs
- Physical barriers to the workplace
- Limited education and experience opportunities, especially for women
- Women with disabilities encounter worse working conditions, lower pay
- Lack of accessible public transportation
- Work times, especially for women and risk if working night hours
- Failing to match the skills of the employee and the skills needed

Some Specific Barriers to Entry into the Labor Market: Study Findings(Nuri et. al., (2012):
Perceived low productivity: Employer's view "From my experience, I never find disabled people productive, Most of the time, disable people are sick and have a tendency to take sick leave. When I give them a few tasks, they always need extra support" Employer's misconceptions on ability and disability: Employee's view"I have seen working here as swing helper for more than 3 years, and I have not received any promotion. On the other hand, an able-bodied person gets promoted to sewing operator after 1 year's experience as helper."

- Traditional training programs
- Lack of alternative forms of training
- Fitness for a job
- Self-employment and micro finance
- No Incentives to employers
- Limited Supported employments
- No Sheltered employment
- No separate Employment agencies

6. The business case

The business case for hiring and retaining persons with disabilities recognizes that persons with disabilities can have a positive impact on a company's bottom line because persons with disabilities:

- Make good, dependable employees, who have often been found to perform on par with nondisabled co-workers.
- Represent an untapped source of employees who have many skills and traits employers desire
- Have comparable or better safety records than their non-disabled peers
- Have better retention rates reducing costs related to recruitment and retraining of replacements
- Have comparable to better attendance records as compared to person without disabilities
- Represent an overlooked market segment. Persons with disabilities and their families and friends buy products and need services and their value as customers is often overlooked. Accessible and disability inclusive stores venues may mean gaining multiple clients, not just the customer with a disability.

7. Challenges and Mandate of Government:

Challenges:

- Job placement
- Convincing employer
- Sensitize micro -finance institution for self-reliance programs
- Addressing Skills gaps
- Ensuring reasonable accommodation
- Breaking Deep rooted attitudinal barrier

Some specific Challenges

- Strengthening Inclusive Job Centre in providing retention support to the employees with disabilities after recruitment.
- Conduct Disability Employment Survey
- Make workstations more accessible and to include Persons with Disabilities in the production process.

- Work with RMG and textile factories to include Persons with Disabilities into their workforce and apply an inclusive human resources policy.
- Introduce measures to make the government, the private sector and civil society more aware to include Persons with Disabilities in the labor market.
- Provide assistance to participating training institutions to make their facilities more accessible to Persons with Disabilities
- Develop inclusive and targeted training programs in cooperation with the private sector.
- Provide inclusive skills training to persons with disabilities in an inclusive setting.
- Arrange employment in the textile and garment sector or in other sectors for at least 70% of the workers with disabilities who were provided inclusive skills training (maximum six months after training has been completed).

8. Mandate of Government and DIFE

Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) is a department under the Ministry of Labour and Employment. DIFE is implementing labour laws and its regulations in factories and establishments. The department has been playing a crucial role in ensuring compliance especially in garments factory. Inspection on RMG factories has been given emphasis as the compliance. An Inspection Checklist on RMG factories has been formulated by DIFE covering the building safety, workplace safety and worker's welfare. Issues related to disability inclusion such as accessibility, reasonable accommodation, inclusive emergency exit planning is to be incorporated in the check list.

9. An example of Private sector: CDD'sInitiatives

The Centre for Disability in Development (CDD) is resource organization in Disability Inclusion. CDD has long been advocating promoting and protectingemployment rights of persons with disabilities. Recently CDD in collaboration with GIZ provided advisory services to 200 RMG factories in Bangladesh aiming to promote inclusive environment. Advisory service include factory assessment, capacity building, awareness create to remove attritional barriers. Some of the major achievements being made by CDD are:

- Skill training to 40,451 entrepreneurs
- Formed 160 Self-help group (SHG)
- 707 group leaders trained on micro enterprises development
- Developed 23 training module on different trade
- 41,286 person with disabilities developed micro enterprises
- 60 factory's modified infrastructure to improve accessibility
- 1340 person with disability have been working in 160 RMG factory's where CDD provided advisory services.

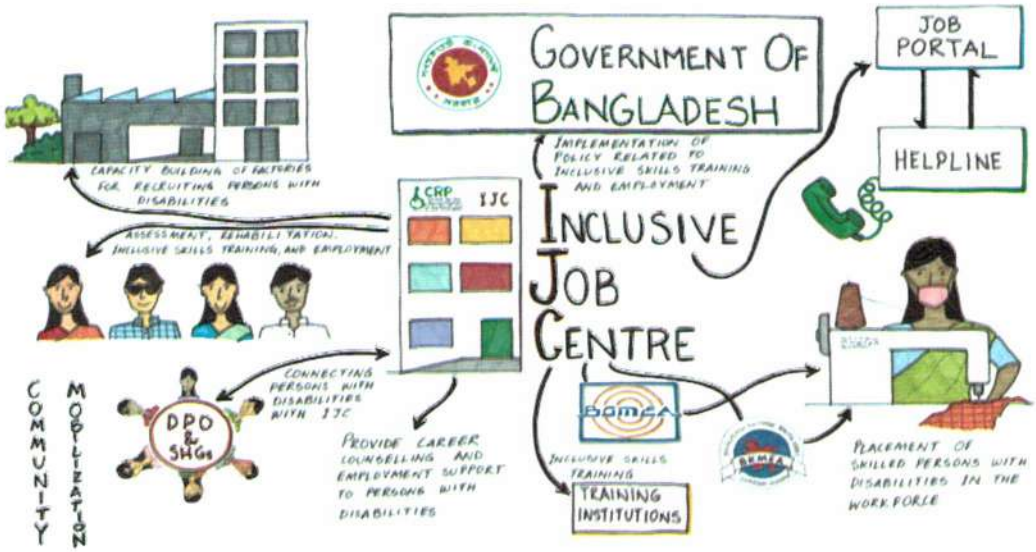

Formal Sector	Opportunities	Informal Sector
# RMG	# Big labor market for both skilled and unskilled persons	# Informal sector in the economy of Bangladesh is growing that creates opportunities both for self employment and livelihood # Beef fattening # Bamboo made handicrafts # Vermin compost # Barber shop # Grocery shop # Dry fish selling # Shoe making/Cobbler # Home made tailoring # Vegetable cultivation and seed production
# ICT	# Big labor market and huge potential for outsourcing	
# Service Sector	# There are rooms for accessible work place including educated unemployed PwDs # Where PwDs need to get service ,PwDs can understand better to serve their customers with disabilities.	
# Selected Industries (cosmetics, plastic, pharmaceuticals etc,)	# Keya Cosmetics, Beximco Fashion & Plastic Industries recruited around 3000 PwDs who have set examples in creating opportunities for PwDs	
# Professional (Lawyer, Teacher, Sign Language, Artist, etc.)	# Demand exists for educated people for professional practices inside & outside the country	

11. Meeting Challenge
Targeting Policy Commitments

- Awareness building
- Advocacy and promote business case for persons with disabilities .
- Building partnership and linkage with service providers and Employers.
- Initiatives to make inclusive training methodology and accessible training place.
- Ensure employment of educated unemployed PwDs by 2030 under SDGs.
- Proper implementation ofGoB and NGOs collaborative initiatives.
- Establishment of Job placement Cell at NFDDP (JPUF).
- Exempt tax for Private companies' employment (in special cases)

Institutional Arrangements

- Ensured reserved 5% Quota for admission in all vocational and polytechnic institutions.
- Ensured reserved 10% Quota for 3rd& 4th Class and 1% quota for 1st Class employees in GoB employment.
- Implementation of 05 years Action Plan to ensure employment of Persons with NDDs.
- Implementation of ICT Training program for 80,000 Persons with Disability by 2017.
- Under MTBF budget, 15 relevant Ministries need formulating their strategies for employment and training.
- Set out National Social Security Strategy for social protection

12. Some Recommendations

- Advocacy with the private sector
- Document learning and good practice.
- Develop resources material on inclusive livelihood option
- Piloting to identify viable livelihood option for Persons with Disabilities
- Let employees identify their needs
- Continual reinforcement that building employment experience is key to ongoing success
- Community Engagement is key: Organize employee & family events
- Strengthen self-help groups

13. Concluding Remarks

Hiring workers with disabilities makes good business sense and it meets human rights commitments. A creative, innovative employer and business make the difference and are the ones who make diversity in the workplace happen. The professional potential of people with disabilities often remains untapped due to misconceptions about their working capacity, negative societal attitudes and non-accessible physical and informational environments which should be addressed by the state.

Work with hearing aid Reasonable Accommodation

"শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ"

Alternative Dispute Resolution: A Need for Labour Matters

Uttam Kumar Das
Programme Officer
Social Dialogue and Industrial Relations (SDIR)
International Labour Organization (ILO)

Introduction:

The effective access to justice is one of the fundamental conditions for ensuring rule of law in a society.

The narrow definition of access to justice means access to litigation or access to courts of law by a justice seeker. However, in wider context, it contains more than that, i.e., more than access to courts or guaranteeing legal representation. It contains both formal and informal approach of justice-seeking. In the broader meaning of access to justice, it contains the following:

i. Meaningful access or right of every people to seek remedy;
ii. Remedy may be sought either from a formal or informal institutions;
iii. Process of resolution of dispute either from formal or informal mechanisms must be fair, cost effective, accountable and must not take more than reasonabl time to disposition;
iv. Remedy given must be adequate and satisfactory in the given circumstances.

Emergence of the Alternative Dispute Resolution (ADR):

From various jurisdictions of laws, it has been evident that formal dispute resolution processes have been taking long time and there are so many procedural steps to follow in getting justice, which are sometime 'too much,' contributed by complex procedures and backlogs of cases registered.

The approaches of ADR has been emerged as tools to address the burden and backlog of litigation. It could be at the pre-litigation stages, and within the litigation stagesand afterwards as well.

The concept of the ADR has been present in our society for centuries, like Salish (which include conciliation, mediation or arbitration) of disputes at community levels. In the context of Bangladesh, this has now been formalized as well, e.g., the framework of the Village Court Act.

Dispute Resolution and ADR:

Disputes are natural and inevitable in human relations. Conflicts may occur at various levels of human-interactions, i.e., interpersonal, social, industrial relations etc.

Given that context, the approaches for disputes resolution may be divide mainly into two board categories: (i) Informal approaches (community initiative), (ii) Formal approaches or legal process.

Position of ADR in dispute resolution process:

Dispute Resolution: (i) Formal approaches (adjudication), and (ii) Informal approaches (community initiatives). Formal approaches again may include- (i) ADR, to be followed by (ii) Litigation.

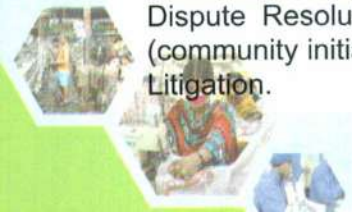

Informal approaches contains- (i) Salish/negotiation/mediation/conciliation, may be followed by (ii) Litigation. In the line of the formal approaches, ADR is followed by litigation and vice versa and end with disposal; again litigation is followed by ADR and vice versa, and disposal.

Challenges with the legal processes:

The legal process of disputes resolution is taken place in the courts of law. In this case, one party resort to the competent legal authority, e.g., court (depending on the subject matter in hand) with an aim to get verdict favorable for him or her. However, this approaches result in a win-loss situation; victory for one party and loss for another after a long-waiting legal processes (presumably after exhaustion of related appeal stages). It has been found in study that for a litigation of civil nature would take on an average almost six years for the first decision.

The challenges in the legal process are summarized as following :

i. Time-consuming and lengthy processes required to follow;
ii. Requires significant amount of spending and often holds disputes, leaves permanen scars
in minds of the 'losing party' rather than resolving the problem in hand, and it may end in making the disputes endemic and long lasting;
iii. Procedures are very complex and cumbersome;
iv. Win-loss situation and sometimes stimulates further conflicts, while the losing party gets a chance they look for a revenge;
v. Chances of deception in the processes;
vi. One has to depend on lawyers from beginning to end of the processes;
vii. In many jurisdictions, formal legal process may be politically motivated, corrupt, biased to particular section of the society and finally not accessible by the poor (marginalized and vulnerable sections of population).

Effectiveness of ADR :

Given the challenges and setbacks in the formal litigation processes, ADR has been emerged and viewed as an alternate and rainbow of hope. The significance of ADR can be categorized in following three levels for serving the: (i) Interest of the state, (ii) Interests of the stakeholders concerned (i.e., judges, lawyers, mediators, litigants, litigants etc.), (iii) Public perceptions.

ADR process has been able to find its place through the drawbacks and challenges remained within the formal litigation-systems. It (ADR) promotes and supports not only legal objectives, but also development objectives of a society, like economic and social objectives, by facilitating resolution of disputes the approached as impeding progress of the society. Advantages of ADR as following:

i. Win-win outcome
ii. Cost effective or no cost facility
iii. Takes reasonably minimum time
iv. Less complicated; free from technicalities as required in the formal litigation processes
v. Indigenous style

vi. Promotes social bindings
vii. Reduces work-load of the judiciary
viii. Generates reconciliation among disputants- i.e., parties are fee to discuss their differences of opinion without any fear or disclosure of facts before any court of law
ix. Positive outcomes help to build confidence in the community or society concerned
x. Positive outcomes encourage others to resolve disputes in their community concerned

Relevance of ADR in labour disputes:

The backlog of cases in the formal justice system has been one of the challenges for delivering and ensuring justice in Bangladesh. There has been reported number of about three million pending cases (in the formal justice systems). The number of pending cases in the labour courts is about 16,000 (as of 2016).

The government has already attempted to introduce ADR in the mainstream judiciary-through adoption of the Arbitration Act, 2001; amendment in the Civil Procedure Code [incorporation of Section 89(a)] etc. ADR has been introduced in the family courts, and in matters involving money suits and taxes etc. Though the outcomes of those initiatives are yet to be assessed how effective are those functioning, however, introduction is a welcome move indeed.

ADR in existing labour laws:

There is no formal inclusion of the Alternative Dispute Resolution (ADR) as such in the existing labour laws of Bangladesh, i.e., the Labour Act, 2006; the Bangladesh Labour (Amendment) Act, 2013; and the Bangladesh Labour Rules, 2015. However, few of the presiding judges in the labour courts, e.g., Chairman, are reportedly encouraging parties involved in litigation, through their counsels, to exhaust the options of ADR-mediation of the disputed matters and report the same to the courts accordingly. These are seemingly welcomes move.

The Bangladesh Labour Act, 2006 (the 2006 Act thereafter), has incorporated provisions for conciliation of industrial disputes (Section 210).Those are mainly administrative process to be carried out by the designated officials from the Department of Labour. Though arbitration is included (in case conciliation is failed), however, there is no elaboration on how to implement the related processes.

Scope of the ADR for labour disputes:

Given the number of pending cases in the labour courts and corresponding challenges, there is a wider-scope to introduce ADR for resolving labour disputes (both involving individual worker and related to a group of workers). This shall include introduction of mediation along with existing conciliation and arbitration. Especially, mediation could be effective for small matters like non-payment of wages, illegal separation from jobs (like dismissal, retrench, and termination etc.).

Under the existing labour laws, the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) has mandate to 'conciliate' certain matters involving non-payment of wages or back-wages [Section 124(a) of the Labour Act].

However, those mandates are apparently not bringing expected outcomes challengedby inadequacies which include lack of infrastructure and required human

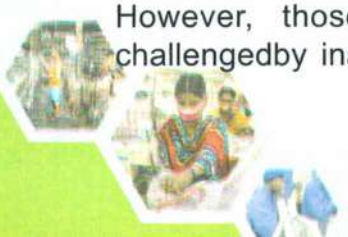

resources, inadequate or no training for existing manpower, lack of related procedural guidelines and standard operating procedures (SOP), lack of awareness on the existing systems or confidence towards the systems among the beneficiaries etc.

Also, absence of effective grievance mechanisms at plant-levels contributing to big number of labour disputes.

Way Forward:

Every system has its dimensions and standards. The benchmark for an effective dispute resolution system is as following :

- Preventive emphasis
- Range of services and interventions
- Free services
- Voluntarism
- Informality
- Innovation
- Professionalism
- Independence
- Resource support
- Confidence and trust of users.

With an aim to introduce effective ADR systems for labour dispute resolution (which would include mediation, conciliation and arbitration) the approaches have to be multi-dimensional: (i) Required capacity building and training supports for brining effectiveness in existing systems, (ii) Amendment of the related provisions in the laws as required, (iii) Development and introduction of operational guidelines, (iv) Awareness on the available services, (v) Independent evaluation of service-delivery.

According to related practitioners, incorporation of provisions of mediation for labour disputes shall be in place. It shall be under the track of informal process which will include standard training for the mediator-candidate (would-be-mediator), adoption of professional code of conduct, and regulation of activities thereof.

Also, to bring a life to the provision related to arbitration in the labour laws, it requires bit of further explanation through amendment of the law- how to do the same- and likely through to adoption of related Rules.

Good news is that the International Labour Organization (ILO) through its Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready Made Garment (SDIR) Project has initiated to contribute to establish a sustainable mechanism for effective conciliation and arbitration of labour disputes in the country. Under the initiatives, a pool of estimated 15 Officials form the Department of Labour will get substantial capacity building supports on conciliation processes. Also, a pool of 15 to 20 independent arbitrators (to include retired judges) will be in place following a process of extensive training, certification, and endorsement through a tripartite processes.

To make the existing systems effective, it is required to look into the ongoing challenges. These include assessment of existing situation, identifying the performance gap, advocating and convincing other of the need for change, prepare a change strategy, implement and monitor the change strategy, and evaluate the new outcomes.

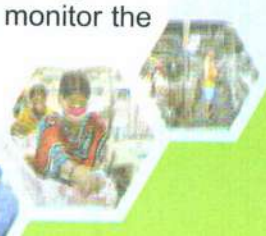

মে দিবস - ২০১৭

স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

জনাব এ,বি,এম, সিরাজুল হক উপ সচিব (সংস্থাপন)	আহবায়ক
বেগম জাহানারা বেগম উপ সচিব (বাজেট)	সদস্য
বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ উপ সচিব (মজুরী বোর্ড ও শ্রমিক কল্যাণ)	সদস্য
জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম উপ সচিব (শ্রম)	সদস্য
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির উপ-প্রধান	সদস্য
জনাব এস, এম, এনামুল হক যুগ্ম শ্রম পরিচালক	সদস্য
জনাব মঞ্জুর কাদের খান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)	সদস্য
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া উপ-মহাপরিদর্শক	সদস্য
জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম উপ শ্রম পরিচালক	সদস্য

সিটিজেন চার্টার

শ্রম পরিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরসহ তার অধীন ৪৯টি দপ্তরে ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন নিষ্পত্তি করা;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শ্রম আইন তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সরাসরি যোগযোগ করে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শ্রম পরিদপ্তর প্রদত্ত নিম্নোক্ত সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেন ঃ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
১।	ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশন ঃ (ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন	☐ কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহপ্রতি পালন সাপেক্ষে রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট দরখাস্ত করবেন (শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক) ☐ যদি শ্রম পরিচালক উক্তদরখাস্তে অত্যাবশ্যক কোন তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখতে পান তাহলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আপত্তি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিত ভাবে জানাবেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন তা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি জবাব দিবে। ☐ শ্রম পরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সন্তোষজনক ভাবে মিটানো হলে নির্ধারিত রেজিষ্টারে তা রেজিষ্ট্রি করা হবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে। ☐ যদি আপত্তি বা আপত্তিসমূহ সন্তোষজনক/আইনানুগভাবে মিটানো না হয়, তাহলে রেজিষ্ট্রিকরণের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হবে। ☐ যে ক্ষেত্রে শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক কোন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন অথবা আপত্তি মিটানোর পরেও আইনে উলিণ্ঢখিত ৬০ (ষাট) দিন সময়সীমার মধ্যে রেজিষ্ট্রি প্রদান না করেন সে ক্ষেত্রে সংশিণ্ঢষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন উক্তরুপ প্রত্যাখ্যানের তারিখ অথবা উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখের পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপীল করতে পারে। ☐ শ্রম আদালতে আপীলটি শুনানীর পর তা উপযুক্ত বিবেচনা করলে রায়ের কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রমপরিচালক/সংশ্লিষ্ট যুগ্ম শ্রম পরিচালককে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে অথবা আইনানুগ অসম্পূর্ণতার কারণে আপীলটি খারিজ করতে পারবে। ☐ শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আদালতের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবে এবং এ বিষয়ে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	শ্রম পরিচালক ও যুগ্ম শ্রম পরিচালকের কার্যালয় সমূহ (শেষ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)
	(খ) ফেডারেশন	☐ একাধিক বিভাগের একই প্রকৃতির পাঁচ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়।	
	(গ) জাতীয় ফেডারেশন	☐ বিভিন্ন প্রকৃতির বিশ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি জাতীয় ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হয়।	
	(ঘ) কন-ফেডারেশন	☐ জাতীয় ভিত্তিক দশটি ফেডারেশন নিয়ে কন-ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়।	
	(ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন	☐ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানসমূহ যেরূপ প্রযোজ্য হয় ফেডারেশনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ৬০ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে হয়।	

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
		(১) একক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০/- টাকা (২) শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন ফি ১০০০/- টাকা মাত্র (৩) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০০০/- টাকা (৪) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০০/- টাকা।	
২।	অংশগ্রহণ কমিটি গঠন	☐ যে সকল প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ☐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং শ্রমিক কর্মচারী/সিবিএ ইউনিয়নের মধ্যে হতে প্রতিনিধির সমন্বয়ে (উক্ত কমিটিতে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি সংখ্যা মালিকের সংখ্যার কম হবে না) গঠিত হবে। ☐ যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ নেই সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শ্রম পরিচালককে অবহিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারণ করিতে হবে। ☐ অংশগ্রহণ কমিটি কর্তৃক ০২ মাস অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠান করা এবং সভার সিদ্ধান্ত ০৭ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালককে অবহিত করতে হবে।	শ্রম পরিদপ্তর
৩।	সিবিএ নির্ধারণ	☐ কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তাদের মধ্যে থেকে একটি ইউনিয়নকে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সর্বোচ্চ ১২০ দিনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) ঘোষণা করা হয়।	শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক আইনের বিধান মোতাবেক স্ব স্ব আওতাভুক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিবিএ নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ
৪।	শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	☐ কোন মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক (একে অপরের বরাবরে) শিল্প বিরোধ উত্থাপন করতে পারে। ☐ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ইচ্ছুক দু'পক্ষের (মালিক ও শ্রমিক) মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে উত্থাপিত শিল্প বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য ১৫ দিনের মধ্যে সালিস (কনসিলিয়েটর) এর নিকট আবেদন প্রেরণ করতে হবে। ☐ সালিস (কনসিলিয়েটর) কর্তৃক বিরোধটি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে বিরোধের পক্ষগণকে নিয়ে সালিস বৈঠক করবেন ১৫ দিনের মধ্যে এবং আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিরোধটির নিষ্পত্তি হবে। ☐ সালিস নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে এবং উভয় পক্ষ সম্মত হলে কোন মধ্যস্থতাকারীর নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। উভয় পক্ষ সম্মত না হলে সালিস ব্যর্থতার ৩ দিনের মধ্যে ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। ☐ মধ্যস্থতাকারীর প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং রোয়েদাদ প্রদানের কপি উভয় পক্ষ ও সরকারকে প্রদান করতে হবে। সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রম আদালতে যেতে পারে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর
৫।	শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা	☐ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে।	সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
		☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। ☐ শ্রমিক পরিবারকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবার পরকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা হয়। ☐ কেন্দ্রের শ্রম কল্যাণ সংগঠকগণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং শ্রমিক কলোনীগুলো পরিদর্শন করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন প্রকার চিত্ত বিনোদন সামগ্রী (সংবাদপত্র, টিভি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম) থাকে। শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কোন কোন সময় শ্রমিক জন্য "শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স" শীর্ষক ১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকরা দেশের শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব, উৎপাদনশীলতা, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।	
৬।	প্রশিক্ষণ প্রদান	☐ দেশের ৪টি পুরাতন বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রয়েছে। এসব শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালতি হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কোর্স অন্যতমঃ- **(ক) চার সপ্তাহব্যাপী শিল্প সম্পর্ক কোর্সঃ** ☐ শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রম কনভেনশন এবং চলমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকে। **(খ) শ্রমিক শিক্ষা কোর্সঃ** ☐ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহে এবং বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য এক সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। ☐ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স অংশগ্রহণকারীগণ জন প্রতি দৈনিক টাকা ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়ে থাকেন।	শিল্প সম্পর্ক (IRI) শিক্ষায়তন সমূহ।
৭।	কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে শ্রম সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ	☐ প্রতি বছর দেশের কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শ্রম আইনের আওতায় নির্ধারিত ফরমে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ☐ প্রতিবছর সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত একটি লেবার জার্ণাল' শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। ☐ নির্ধারিত মূল্যে যে কেউ শ্রম পরিদপ্তর থেকে লেবার জার্ণাল" সংগ্রহ করতে পারেন।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
৮।	অন-লাইন সেবা প্রদান	☐ শ্রম পরিদপ্তর ইতোমধ্যে অন-লাইনে ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশন/ কন-ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও অসদশ্রম আচরণের বিষয়ে অন-লাইনে অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dol.gov.bd তে প্রবেশ করতে হবে। ☐ ০১টি সুরক্ষিত ডাটাবেজের মাধ্যমে শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।
৯।	এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন	☐ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রাপ্তির ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর।
১০।	ওয়েব-সাইট	☐ শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dol.gov.bd তে শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসহ অন্যান্য তথ্যাদি আপ-লোড করা আছে। প্রয়োজনে যে কেউ বর্ণিত আইন ও বিধি-বিধানসমূহ ডাউন-লোড করতে পারবে।	শ্রম পরিদপ্তর
১১।	হট লাইন	☐ পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ০৮০০-৪৪৫০০০।	শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম পরিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

১. শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ভবন, ৪ রাজউক এভিনিউ,ঢাকা-১০০০।
২. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, শ্রম ভবন (৯ম তলা), ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
৩. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, বয়রা, খুলনা।
৫. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৬. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
৭. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৮. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, সোনালী জুট মিলস, মীরের ডাংগা, খুলনা।
৯. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ক্যান্টনমেন্ট, তেরখাদা, রাজশাহী।
১০. উপ শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।
১১. উপ শ্রম পরিচালক, চা-শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১২. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
১৩. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মন্নুনগর, টুংগী, গাজীপুর।
১৪. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।
১৫. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভবন নং ২, কক্ষ নং ২০৫, সিলেট।
১৬. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, হোল্ডিং নং ১০৩, বণ্টক এ, কলাবাগান হাউজিং, ধর্মপুর, কুমিল্লা।
১৭. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, পুরাণবাজার, চাঁদপুর।
১৮. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৫ মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

১৯ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মংলা, বাগেরহাট।

২০ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মুলাটোলা, রংপুর।

২১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকা।

২২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মুন্নুনগর, টংগী গাজীপুর।

২৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শিমলা বাজার, সরিষাবাড়ী,জামালপুর।

২৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

২৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

২৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।

২৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পলাশ, ঘোড়াশাল।

২৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া।

২৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।

৩০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

৩২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খান জাহান আলী রোড, রুপসা, খুলনা।

৩৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা।

৩৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট।

৩৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ৫, মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

৩৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

৩৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী।

৩৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফজলুল হক রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।

৩৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।

৪০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৪১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গোডাউন রোড, গাইবান্ধা।

৪২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকরী খেজুরী ছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

৪৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শমশেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা চা বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া চা বাগান, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

৪৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড় চা বাগান, জুরি, মৌলভীবাজার।

৪৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লুয়াইউনী চা বাগান, কাজলধারা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৪৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, খান চা বাগান, সিলেট।

৪৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কলেজ রোড, লালমনিরহাট।

সিটিজেন চার্টার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা ২০১৫ বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় প্রয়োগের জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা- বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা;
- শ্রমিকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ তদন্ত করে আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি করা;
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা;
- কারখানা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ এর জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্লান ইত্যাদি অনুমোদন করা;
- কারখানা রেজিস্ট্রেশন, সনদপত্র ইস্যু ও নবায়ন প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও) সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধির সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা;
- করাখানা কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা হতে অব্যাহতি প্রদান করা;
- শ্রম আইন বা পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- আই,এল, ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই,এল, ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

প্রতিশ্রুত নাগরিক সেবাঃ

ক্র নং	প্রদত্ত সেবা	সেবা প্রদান প্রদ্ধতি ও বিবরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবাদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মধ্যসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে যার নিকট আবেদ করতে হবে।
১.	কারখানা মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন	কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই কপি নক্সা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে উপমহাপরিদর্শকগণ নক্সা অনুমোদন করবেন।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)। ৫। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশলী সংস্থা লোড বিয়ারিং ক্যাপসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নক্সা।	বিনামুল্যে	৯০দিন	উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, বি.এফ.ডি.সি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫। ফোনঃ ৫৫০১৩৬২৬ E-mail: chiefdife@gmail.com
২.	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। কারখানা লে-আউট প্লান অনুমোদনের কপি	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি(২.২ ক্রমিক বিস্তারিত বর্ণিত) কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-	৯০দিন	উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, বি.এফ.ডি.সি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫। ফোনঃ ৫৫০১৩৬২৬ E-mail: chiefdife@gmail.com

		উপমহাপরিদশকগণ কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন করবেন।	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নক্সার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মুল কপি। ৯। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১০। কারকানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন।			
৩.	ঠিকাদার সংস্থার (Oustourcing) রেজিষ্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান নবায়ন।	ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন পত্র দাখিল করবেন। ২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পতের তথ্যাবলি সঠিকতা যাচাই করবেন এবং প্রথিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্সে আবেদন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত লাইসেন্স ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে উক্ত মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করতে হবে। ৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	১। আবেদনকারী পাসপোর্ট সাইজের ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি। ২। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি। ৫। TIN সনদ। ৬। মূল্য সংযোজন কর রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। ৭। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ স্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র। ৮। কোম্পানির সংঘ অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হলে অংশীদারী দলিল বা মেমোরেন্ডাম অফ এসোসিয়েশন। ৯। মহাপরিদর্শকের অনুকূলে জামানত হিসেবে তফসীল নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ। ১১। ঠিকানাসহ অবস্থান ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিবরণ। ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র। ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র (যদি থাকে)। ১৪। কর্মী নিয়োগ বিধিমালা। ১৫। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৬। বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নক্সার কপি ও অনুমোদনপত্র				

ক্র নং	প্রদত্ত সেবা	সেবা প্রদান প্রদ্ধতি ও বিবরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবাদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে যার নিকট আবেদন করতে হবে।
৪.	আপোষ ও মীমাংসার মাধ্যমে মজুরীসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ।	অভিযোগকারী মহাপরিদর্শক/উপ-মহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন।		বিনামূল্যে	অভিযোগ আবেদন প্রাপ্তির সর্বোর্চ্চ ২০ দিনের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।	মহাপরিদর্শক বা মহাপরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	-ঐ-
৫	টোল ফ্রি হেল্প লাইন সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি।	শ্রমিক/সংশ্লিষ্ট কেউ ০৮০০- ৪৪৫৫০০ নাম্বারে কল করে অভিযোগ দায়ে করবেন। দায়কৃত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।		বিনামূল্যে	৩০ দিন	মহাপরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	-ঐ-
৬.	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ ফরম-১, ফরম-২ ও ফরম-২ (ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া চাকুরী বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণ পূর্বক চাকুরী বিধি অনুমোদন করবেন।		বিনামূল্যে	৯০ দিন	মহাপরিদর্শক	-ঐ-
৭.	অন-লাইন সেবা প্রদান সমূহ: ১। কারখানা লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/ সংশোধন লে-আউট প্লান অনুমোদনের আবেদন। ২। কারখান লে-আউট প্লান অনুমোদন সহ কারখানার	১। www.dife.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। কারখানা/প্রতিষ্ঠান এর রেজিস্ট্রিকরণ / লাইসেন্স ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আবেদন করবেন। ২। www.dife.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। অভিযোগ দায়ের করবেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় তদন্ত করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।		বিনামূল্যে		মহাপরিদর্শক এবং উপ-মহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, বি.এফ.ডি.সি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫ ফোন: ৫৫০১৩৬২৬ E-mail: chiefdife@gmail.com

	লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন। ৩। কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন। ৪। কারখানার লাইসেন্স নবায়ন এর আবেদন। ৫। কারখানা লাইসেন্স সংশোধন এর আবেদন। ৬। কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রাসরণ/ সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ লাইসেন্স সংশোধনের জন্য আবেদন। ৭। কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন। ৮। কাজ শুরু করার পূর্বের নোটিশ। ৯। অনলাইন কারখান রেজিস্ট্রেশনকরণ।						
৮.	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন		বিনামূল্যে	আইনানুগ সময়সীমা	মহাপরিদর্শক এবং উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	-ঐ-

কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বানিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি

১। কারাখানার জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	৫-৩০	৫০০	৩০০
বি	৩১-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদুর্ধ	১৮,০০০	১২,০০০

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (কারখানা ও ঠিকাদার সংস্থা ব্যতীত) জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
মিনি	০-৫	৩০০	১৫০
এ	৫-২৫	৫০০	৩০০
বি	২৬-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদুর্ধ	১৮,০০০	১২,০০০

৩। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরা, ব্যাংক, বীমা ব্যতীত) জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-১০	৫০০	৩০০
বি	১১-৩০	১,০০০	৭০০
সি	৩১-৫০	১,৫০০	১,০০০
ডি	৫১-১০০	২,৫০০	১,৫০০
ই	১০১-৩০০	৩,৫০০	২,০০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	২,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৩,০০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৭,৫০০	৪,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৫,০০০

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-৩০	৫০০০	৩,০০০
বি	৩১-৫০	৭,০০০	৪,০০০
সি	৫১-১০০	১০,০০০	৭,০০০
ডি	১০১-৩০০	১২,০০০	৯,০০০
ই	৩০১-৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
এফ	৫০১-৭৫০	১৭,০০০	১২,০০০
জি	৭৫১-১০০০	১৬,০০০	১৫,০০০
এইচ	১০০১-তদুর্ধ	২০,০০০	১৭,০০০

৫। দোকান, সুপার স্টোর, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এবং কারখানা নয় এমন ধরনের উৎপাদনশীল শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	০-০১	১০০	৫০
বি	০২-০৩	২০০	৭০
সি	০৪-০৬	৪০০	১০০
ডি	০৭-১০	৫০০	২০০
ই	১১-১৫	১,০০০	৩০০
এফ	১৬-২০	১,৫০০	৫০০
জি	২১-২৫	২,০০০	৭০০
এইচ	২৬-৩০	৩,০০০	১,০০০
আই	৩১-৩৫	৩,৫০০	১,৫০০
জে	৩৬-৪০	৪,০০০	২,০০০
কে	৪১-তদুর্ধ	৫,০০০	৩,০০০

৬। ঠিকাদার সংস্থার শ্রেণি বিভাগ, লাইসেন্স, নবায়ন ফি ও জামানত হিসাবে বন্ড :

ক্র:নং	কর্মীর সংখ্যা	শ্রেণি বিভাগ	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	জামানত হিসাবে বন্ড
১।	১-২০০	এ	২০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০,০০০
২।	২০১-৫০০	বি	৩০,০০০/-	৭,০০০/-	৩,০০,০০০
৩।	৫০১-৭০০	সি	৪০,০০০/-	১০,০০০/-	৪,০০,০০০
৪।	৭০১-১০০০	ডি	৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০,০০০
৫।	১০০১-২০০০	ই	৬০,০০০/-	১৮,০০০/-	৬,০০,০০০
৬।	২০০১-৪০০০	এফ	৭৫,০০০/-	২০,০০০/-	৭,৫০,০০০
৭।	৪০০১-তদুর্ধ	জি	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-	১০,০০,০০০/-

ওয়েবসাইটে তথ্য সেবা সমূহ

ওয়েবসাইটে তথ্য সেবা সমূহ (www.dife.gov.bd)

- অর্গানোগ্রামসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য;
- প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা;
- সেবা প্রদানের পদ্ধতিসহ সেবা গ্রহণের তালিকা;
- ডাউনলোড সুবিধাসহ শ্রম আইন ও নীতিমালা সমূহ;
- গার্মেন্টস সেক্টরের ডাটাবেজ;
- ডাউনলোড সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ফরম সমূহ;
- দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত নোটিশ ও নিউজ ফ্ল্যাশ।

অনলাইন সেবা সমূহ

অনলাইন সেবা সমূহ (www.dife.gov.bd/apps)

- কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনের আবেদন;
- কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন সহ কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স নবায়ন এর আবেদন;
- কারখানার লাইসেন্স সংশোধন এর আবেদন;
- কারখানার লে-আউট প্লান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্লান অনুমোদনসহ লাইসেন্স সংশোধনের জন্য আবেদন;
- কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন;
- কাজ শুরু করার পূর্বের নোটিশ;
- কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরিসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করণ;
- আবেদন পত্রের স্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে তথ্য।

অনলাইন কারখানা রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

১। অনলাইন কারখানা রেজিস্ট্রেশন আবেদন করার জন্য প্রথমে www.dife.gov.bd/apps এ যেতে হবে।
২। এরপর ওয়েবসাইটের যে সেবাটি নিতে চান, সেই সেবাটিতে ক্লিক করলে আবেদনের ফরম চলে আসবে।
৩। নির্ধারিত ফরমটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করলেই আবেদন সম্পূর্ণ হবে।
৪। আবেদন সেন্ড হওয়ার ফিরতি মেইলে আপনার নিকট একটি Tracking ID Number চলে আসবে।
৫। Tracking ID Number টি মূল কাগজপত্র সহ সংশিণ্টষ্ট জেলার উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

শ্রমিকের অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

১। অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রথমে www.dife.gov.bd/apps এ যেতে হবে।
২। এরপর ওয়েবসাইটের অভিযোগের জন্য নির্ধারিত আবেদন পত্রে ক্লিক করলে আপনার ফরমটি চলে আসবে।
৩। নির্ধারিত ফরমটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করলেই আবেদন সম্পূর্ণ হবে।
৪। টোল ফ্রি হেল্প লাইন -০৮০০-৪৪৫৫০০০।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

১ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, বি.এফ.ডি.সি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫।
২ উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা জেলা কার্যালয়, ২৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৩ উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর জেলা কার্যালয়, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
৪ উপমহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৫ উপমহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়, লামাপাড়া, আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার (২য় তলা), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
৬ উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়, ১৭০ কালি বাড়ী (৩য় তলা), ময়মনসিংহ।
৭ উপমহাপরিদর্শক, কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়, ৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কসাই খানা), কিশোরগঞ্জ।
৮ উপমহাপরিদর্শক, ফরিদপুর জেলা কার্যালয়, বাড়ি নং- ৫৬, ব্লক- বি, গঙ্গাধরপট্টি, ফরিদপুর।
৯ উপমহাপরিদর্শক, যশোর জেলা কার্যালয়, বাড়ি নং-২৩৬, প্লট- ০৮, সেকটর-০৯, যশোর হাউসিং এস্টেট, শেখ হাটি বাবলা , যশোর।
১০ উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী জেলা কার্যালয়, ২৬/২, তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
১১ উপমহাপরিদর্শক, কুমিল্লা জেলা কার্যালয়, ৭৭৫, দক্ষিণ চর্থা, সদর হাসপাতাল রোড, কুমিল্লা।
১২ উপমহাপরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়, সিরাজীবাড়ী, বানিকুঞ্জ, সিরাজী রোড (প্রধান ডাকঘরের উত্তর পার্শে), সিরাজগঞ্জ।
১৩ উপমহাপরিদর্শক, টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয়, বি/২৪/১০ প্রান্ত ভিলা (৩য় তলা), বিশ্বাস বেতকা, আট পুকুর পাড়, ঢাকা রোড, টাঙ্গাইল।
১৪ উপমহাপরিদর্শক, মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়, ভুঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।
১৫ উপমহাপরিদর্শক, বগুড়া জেলা কার্যালয়, বারি নং- জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া।
১৬ উপমহাপরিদর্শক, বরিশাল জেলা কার্যালয়, ১৬৯৪, অনামিকা ব্যাংকার্স হাউজ, (৩য় তলা) কাশীপুর বাজার, বরিশাল।
১৭ উপমহাপরিদর্শক, খুলনা জেলা কার্যালয়, শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা।
১৮ উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়, রাহাত ভিলা, ৫৪/১, ঝিনাইদহ রোড, উপজেলা মোড়, কুষ্টিয়া।
১৯ উপমহাপরিদর্শক, রাজশাহী জেলা কার্যালয়, ৬৯, আলম এপার্টমেন্ট, বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
২০ উপমহাপরিদর্শক, সিলেট জেলা কার্যালয়, মির্জা ভিলা (৩য় তলা), পশ্চিম পাঠান টুলা, ৯/বি, পপ্লবী আবাসিক এলাকা, সিলেট।
২১ উপমহাপরিদর্শক, রংপুর জেলা কার্যালয়, ১৩৭/৭, ঈশান চন্দ্র চক্রবর্তী রোড, আর, সি, সি, আই স্কুল এন্ড কলেজ মোড়, পূর্ব শালবন, রংপুর।
২২ উপমহাপরিদর্শক, পাবনা জেলা কার্যালয়, এ/১১৪, ব্লক-বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা।
২৩ উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর জেলা কার্যালয়, বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
২৪ উপমহাপরিদর্শক, মৌলভিবাজার জেলা কার্যালয়, মৌলভিবাজার।

মহান মে দিবস-২০১৭

উদযাপন উপলক্ষে গঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রধান সমন্বয়কারী	ঃ	মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুখ্য সমন্বয়ক	ঃ	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া মহা-পরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সমন্বয়ক	ঃ	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম পরিদপ্তর

অতিথি তালিকা প্রণয়ন/ আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ ও বিতরণঃ

১।	মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম-সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
৪।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	যুগ্ম-সচিব (আদালত ও সমন্বয়)
৫।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৬।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৮।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৯।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনবা সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
১২।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
১৩।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১৪।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহাপরিদর্শক
১৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
১৬।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ফকির	উপ শ্রম পরিচালক
১৭।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
১৮।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক

র‍্যালী ব্যবস্থাপনা ঃ

১।	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল	শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা)
৬।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৭।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	বেগম আছমা-উল-হোসনা	সহকারী সচিব
৯।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
১১।	জনাব আব্দুর রশিদ পাঠান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১২।	জনাব মোঃ গাজীউর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সেমিনার আয়োজন

১।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান ভূইয়া	মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব এস, এম, জাহেদুল করিম	যুগ্ম সচিব (বাজেট)
৪।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (আদালত ও সমন্বয়)
৫।	জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
৬।	বেগম সাবরিনা শারমিন জামান	উপ সচিব (নারী ও শিশু শ্রম)
৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৮।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ: দা:)
৯।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ: দা:)
১০।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৩।	জনাব জসিম উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৪।	জনাব মোহাম্মদ কেফাত আলী	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
২।	জনাব হুমায়ুন কবির	উপ প্রধান
৩।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ: দা:)
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ: দা:)
৫।	বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমীর প্রতিনিধি	
৬।	জনাব এস, এম এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৭।	বেগম মোরশেদা হাই	সহকারী সচিব (শ্রম ও আইন)
৮।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সচিব, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

মেইন গেইট ও সড়ক দ্বীপ সজ্জিতকরণ এবং ব্যানার স্থাপন

১।	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল	শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৩।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ নাজমুল রাশেদ	সহকারী মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব কবির উদ্দিন হওলাদার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১০।	জনাব শোভন দাশ	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

মূল প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা

১।	মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব এ, বি, এম খোরশেদ আলম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি
৩।	জনাম মোঃ সামসুজ্জামান ভূইয়া	মহা পরিদর্শক
৪।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
৫।	বেগম জাহানারা বেগম	উপ সচিব (বাজেট)
৬।	বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ	উপ সচিব (মজুরী বোর্ড ও শ্রমিক কল্যাণ)
৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৮।	জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ	সহকারী প্রধান

স্মরণিকা লেখা আহ্বান, প্রকাশনা ও সম্পাদনা ঃ

১।	জনাব এ, বি, এম, সিরাজুল হক	উপ সচিব (সংস্থাপন)
২।	বেগম জাহানারা বেগম	উপ সচিব (বাজেট)
৩।	বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ	উপ সচিব (মজুরি বোর্ড ও শ্রমিক কল্যাণ)
৪।	জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
৫।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	উপ প্রধান
৬।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৮।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহা পরিদর্শক

স্মরণিকা বিতরণ

১।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব মো: মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৫।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহা পরিদর্শক
৭।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব সাইকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
১০।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সচিব, নিম্নতম মজুরি বোর্ড
১১।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহা পরিদর্শক (সেফটি)
১২।	জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

আসন বিন্যাস ও স্টিকার তৈরি করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
২।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
৩।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	উপ প্রধান
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৫।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
৬।	বেগম আছমা-উল-হোসনা	সহকারী সচিব (নারী ও শিশু শ্রম)
৭।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৯।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
১১।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সচিব, নিম্নতম মজুরি বোর্ড
১২।	বেগম রোখসানা চৌধুরী	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক

আসন সংরক্ষণ

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
২।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
৩।	শাকিলা জেরিন আহমেদ	উপ সচিব (মজুরি বোর্ড ও শ্রমিক কল্যাণ)
৪।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী	উপ প্রধান (পরিকল্পনা)
৫।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৬।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৭।	বেগম দিল আফরোজ বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)
৮।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৯।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
১১।	জনাব সৌমেন বড়ুয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক
১২।	শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৩।	জনাব মোঃ মাহবুবুল হাসান	উপ মহাপরিদর্শক
১৪।	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক
১৫।	জনাব মোঃ হান্নান সরদার	প্রটোকল অফিসার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসনসহ ডায়াসে অন্যান্য আসন সংরক্ষণঃ

১।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
২।	জনাব মোঃ ইমাদাদুল হক	অফিস সহায়ক
৩।	জনাব মোঃ লিটন মাহমুদ	অফিস সহায়ক
৪।	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	অফিস সহায়ক

বহিরাঙ্গন অভ্যর্থনা

১।	জনাব এস এম জাহিদুল করিম	যুগ্ম সচিব (বাজেট)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
৩।	বেগম শাহীন আখতার	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)
৪।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলোচনা মঞ্চ সজ্জিতকরণ

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
২।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

পবিত্র কোরআন শরীফ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল ও সঞ্চালক আনা-নেওয়ার দায়িত্ব

১।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
২।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব সালাহউদ্দীন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান জনি	সহকারী মহাপরিদর্শক
৮।	জনাব শাহ মোফাখখারুল ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক
১০।	জনাব মোঃ নাইমুল আজিজ	শ্রম পরিদর্শক

এস,বি/ডিউটি পাসের ব্যবস্থা করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব শাহীন আখতার	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
৩।	জনাব মো: শামসুল আলম খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৪।	জনাম মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ জহিরুল হক	গবেষণা সহকারী
৭।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূঁইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
৮।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	হিসাব রক্ষক

রেডিও ও টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচার

১।	জনাব অমর চান বণিক	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব
২।	জনাব মোঃ আকতারুল ইসলাম	জনসংযোগ কর্মকর্তা
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব শিকদার মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক

মোবইল/ব্যাগ সংরক্ষণ

১।	জনাব শফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
২।	জনাব এনামুল হক রাকিব	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩।	জনাব মোঃ উজ্জল হোসেন	অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার মুদ্রাঃ
৪।	জনাব মোঃ জাহিদুল আলম	পরিসংখ্যান সহকারী
৫।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহায়ক

গেঞ্জি, টুপি বিতরণ

১।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
২।	শেখ আসাদুজ্জামান	উপ-মহাপরিদর্শক
৩।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ-শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চ: দা:)
৫।	ডাঃ নবীন কুমার	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
৬।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৭।	জনাব মোঃ আবদুস সামাস সিকদার	দপ্তরী

ফোকাল পয়েন্ট

১।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
২।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	উপ মহা পরিদর্শক (চ:দা:)

দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

১।	জনাব মো: আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)	সভাপতি
২।	ডা: সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)	সদস্য
৩।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ-মহাপরিদর্শক	সদস্য
৪।	জনাব অধীর চন্দ্র বালা	রেজিষ্টার, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	সদস্য
৫।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক	সদস্য সচিব

আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামন ভূঁইয়া	মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
৩।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৫।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	মিসেস রোখসানা চৌধুরী	সহকারী শ্রম পরিচালক

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী, সচিব মহোদয়ের বাণী, মহাপরিদর্শক, শ্রম পরিচালক এর বাণীর খসড়া তৈরী ও সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমেঃ

১।	জনাব এস.এম.এনামুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
২।	ডা: সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৪।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সচিব, নিম্নতম মজুরি বোর্ড
৫।	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	সহকারী মহাপরিদর্শক
৬।	জনাব মো: আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক

প্রচার সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
২।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৫।	বেগম জোবেদা খাতুন	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাঃ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের ভাষণের খসড়া প্রস্তুত কমিটি

১।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক (চ:দা:)
২।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)

বিজি প্রেসে দাওয়াত কার্ডের প্রুফ দেখা ছাপানোসহ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন ঃ

১।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ-শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক
৩।	শিকদার তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

অনুষ্ঠানসূচি

১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ /১৮ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

স্থানঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বিকাল

৩.৩০ মিঃ ঃ আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন গ্রহণ ।

৪.০০ মিঃ ঃ প্রধান অতিথির আগমন ।

৪.০১ মিঃ ঃ পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত/পাঠ ।

৪.০৯ মিঃ ঃ স্বাগত বক্তব্যঃ
জনাব মিকাইল শিপার
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।

৪.১৪ মিঃ ঃ শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্যঃ
জনাব শুক্কুর মাহামুদ
সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ ।

৪.১৯ মিঃ ঃ সেক্টর প্রতিনিধির বক্তব্যঃ
জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি, বিজিএমইএ ।

৪.২৪ মিঃ ঃ মালিক প্রতিনিধির বক্তব্যঃ
জনাব সালাহ্উদ্দীন কাসেম খান
সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ।

৪.২৯ মিঃ ঃ আইএলও প্রতিনিধির বক্তব্যঃ
Mr. Srinivas B. Reddy
ILO Country Director, Bangladesh .

৪.৩৪ মিঃ ঃ বিশেষ অতিথির বক্তব্যঃ
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি
সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ।

৪.৪১ মিঃ ঃ সভাপতির বক্তব্যঃ
জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।

৪.৫০ মিঃ ঃ প্রধান অতিথির ভাষণঃ
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

- ❖ অনুগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণপত্র সাথে আনবেন। এ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- ❖ ব্রীফকেস, মোবাইল ফোন, হাত ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ❖ অনুষ্ঠান শুরুর অন্তত ৩০ মিঃ পূর্বে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহান মে দিবস-২০১৭

র‍্যালী-সেমিনার
উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মসূচি

মে দিবস র‍্যালী

০১, মে সোমবার

সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় শ্রম ভবন থেকে আরম্ভ হয়ে দৈনিক বাংলার মোড় হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হবে।

মে দিবস সেমিনার

স্থান ঃ ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

০২, মে মঙ্গলবার

প্রথম সেমিনার	ঃ	সকাল ১০.০০ টা থেকে ১.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
বিষয়	ঃ	"শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচলন"
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০২, মে মঙ্গলবার

দ্বিতীয় সেমিনার	ঃ	বিকাল ২.০০ টা থেকে ৬.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	বিল্‌স, কর্মজীবী নারী ও ওশি ফাউন্ডেশন
বিষয়	ঃ	'কর্মস্থলে শোভন কর্ম পরিবেশ' নিশ্চিতকল্পে সেইফটি কমিটির ভূমিকা
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার,সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স।

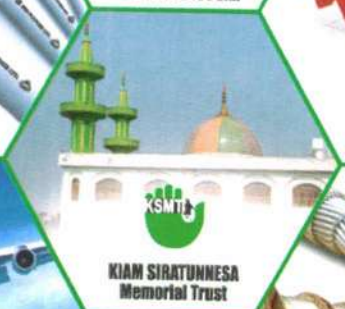

BRB Group
BRB Cable Ind. Ltd.
Kiam Metal Ind. Ltd.
MRS Industries Ltd.
BRB Polymer Ltd.
BRB Securities Ltd.
KIAM SIRATUNNESA Memorial Trust
BRB Travels
TPT Cables Limited
Lovely Housing Ltd
BRB Energy Ltd.
BRB Hospitals Ltd.
BRB Air Limited
BRB
ISO 9001:2008
certified company

ব্যবহারে বসুন্ধরা টয়লেট টিস্যু
জীবাণু হাঁটবে না পিছু পিছু...

BASHUNDHARA GROUP
For the People, for the Country

Think Hygiene
live SAFE

hygienelovers.btissue
www.bashundharatissue.com
Helpline: 16339

Size : W-16 cm x H-21.3 cm

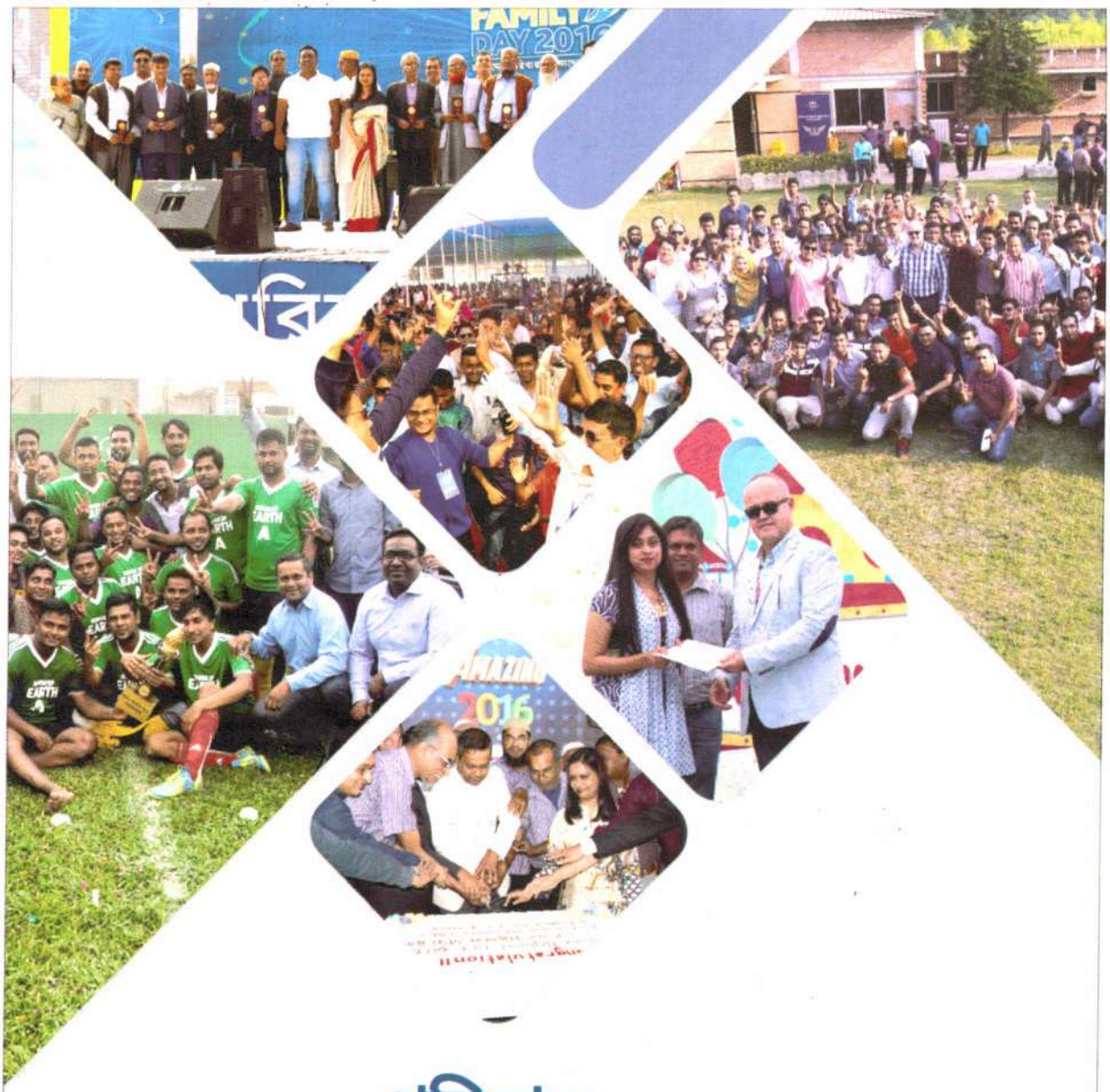

আমাদের পরিবার
আমাদের গৌরব

BRITISH AMERICAN TOBACCO
BANGLADESH

WALTON
আমাদের পণ্য
Spend Less... Get More
Aristocratic stylish design with fabulous colors
৬ মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি
১ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি
সময় এখন বাংলাদেশের
High Glossy, Scratch & Corrosion Resistant
9 Layer VCM Door
Protective Film
PET Layer
Print Layer
VCM Film
Adhesive Material
Pre-treatment Upper Surface
Electro Galvanized Steel
Pre-treatment Lower Surface
Service Coating
Intelligent Inverter Compressor
10 Years Guarantee
Intelligent INVERTER Technology
SPACE !! No Matter
Walton Refrigerator
Buy Refrigerator with Intelligent Inverter
Save Electricity, Be Intelligent
১০০% কপার কনডেন্সার
শতাধিক মডেল ও ডিজাইন
Save huge electricity
Increase compressor lifetime
Reduce noise
ecozen
Refrigerator & Freezer
NANO HEALTHCARE
All models are tested by:
NUSDAT-UTS
ISO/IEC 17025 (BAB Accredited)
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007 Certified Company
jobs.waltonbd.com
Helpline:
16267
09612316267
waltonbd.com
WALTON

BKMEA
Working Today to Shine Tomorrow
Since 1996....
BANGLADESH KNITWEAR MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BKMEA)
Mainstream Activities
Promotes more than 2000 member factories worldwide under one umbrella.
Craves to achieve complete green Industrialization.
Leaves impact in policy makings.
Propels CSR within the industry.
Introduces new techniques for efficient productivity.
Conducts market research to scout for new markets.
Regular Activities
Offers consultancies to the RMG SMEs.
Operates sector demanded trainings.
Creates awareness sessions among stakeholders.
Certificate and diploma courses for mid level management.
Provides UD and GSP services to member
Sector's Contribution
Share in GDP
Poverty Reduction
Growth of Knitwear
Female Empowerment
Share in Apparel export
Share in National Export
Employment Generation
Banking & Insurance
Knitwear Export
Shipping & Logistics Industry
Cooperative Partners
ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK
giz
JICA
ILO
UNIDO
Head Office :
Press Club Building (1st & 3rd Floor),
233/1 Bangabandhu Road,
Narayanganj-1400, Bangladesh.
Phone : 88-02-7641857, 7640535, 7641295;
Fax: 88-02-7630609
Dhaka Office :
13/A Sonargaon Road, Banglamotor,
Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone : 88-02-58615910, 96722257,
58615964, 9670498, 9632611; Fax: 88-02-9673337
Chittagong Office :
38, Agrabad C/A
Chittagong-4100, Bangladesh
Phone: 031-2514342
Fax: 031-2514345
www.bkmea.com

গর্বের পোশাক শিল্পের হাত ধরে নারীর অগ্রযাত্রা

প্রায় অর্ধ কোটি শ্রমিকের দক্ষ হাতের বুননে আর হাজারো উদ্যোক্তার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে আজ বাংলাদেশের পোশাক অর্জন করেছে সুনাম। তিন দশক জুড়ে শ্রমিক-উদ্যোক্তার বিন্দু বিন্দু প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে মহিমান্বিত করেছে মাতৃভূমি বাংলাদেশের নাম; কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকায় মিশে আছে অকৃত্রিম বন্ধুর মত। আনন্দের এই অগ্রযাত্রার পথে দরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। একসাথে গড়ি নিরাপদ পোশাক শিল্প, গড়ি সোনার বাংলাদেশ।

'কন্যা সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের নারীরা পোশাক শিল্পে কাজ করছেন'

দি নিউইর্ক টাইমস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪ মে ২০১৪

শ্রমিক ভাই-বোনদের কল্যানে বিজিএমইএ'র কিছু গৃহীত পদক্ষেপ

- বিজিএমইএ শ্রমিক ভাই-বোনদের সন্তানদের জন্য ৫টি বিদ্যালয় পরিচালনা, সেইসাথে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বইপত্র, শিক্ষা উপকরন এবং বৃত্তি প্রদান করছে।
- বিজিএমইএ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করে শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলছে।
- বিজিএমইএ সরকারের সাথে উদ্যোগ গ্রহন করে পোশাক শিল্পে কর্মরত ল্যাকটেটিং মাতাদের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। গত ৪ বছরে পোশাক শিল্পে কর্মরত ২৫,৪৯৫ জন ল্যাকটেটিং মাতাদের মধ্যে ৯,৬৯,৬৩,৬০০ টাকা বিতরন করা হয়েছে।
- বিজিএমইএ শ্রমিক মেলার আয়োজন করে। সম্প্রতি বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাই-বোনদের নিয়ে 'গর্ব' শিরোনামে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেছে।
- শিল্পে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ভাই-বোনদের উন্নততর জীবন দেয়ার অভিপ্রায় থেকে বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাই-বোনদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে DFID, Impact Ltd., UNIDO এবং পোশাক শিল্পের বিভিন্ন ব্যাড ও রিটেইলারদের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিজিএমইএ'র যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামে পোশাক শিল্পের ৩০০০ নারী শ্রমিকের জন্য ডরমিটরী নির্মানের কাজ এগিয়ে চলছে। ঢাকার আশুলিয়াতেও আরও একটি ডরমিটরী নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে।
- বিজিএমইএ একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি পোশাক শিল্পের শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করছে।

বিজিএমইএ'র নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত ১২টি স্বাস্থকেন্দ্র থেকে প্রতি বছর প্রায় ৬০,০০০ শ্রমিক ভাই-বোন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধপত্র পাচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলোর বাৎসরিক খরচ হচ্ছে আনুমানিক প্রায় আড়াই কোটি টাকা, যার পুরোটাই আসে বিজিএমইএ'র নিজস্ব তহবিল থেকে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো নিয়মিতভাবে এইচআইভি/এইডস, যক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রক সামগ্রীর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহন করছে। অধিকন্তু, পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মান করা হয়েছে, যা শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে। ঢাকার মিরপুরেও শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মানের কাজ দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলছে।

চোখ রাখুন :
www.facebook.com/bgmea.official

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

MADE IN BANGLADESH WITH PRIDE

Emergency Internet_A4 Size: 8.25 x 11.75 inch

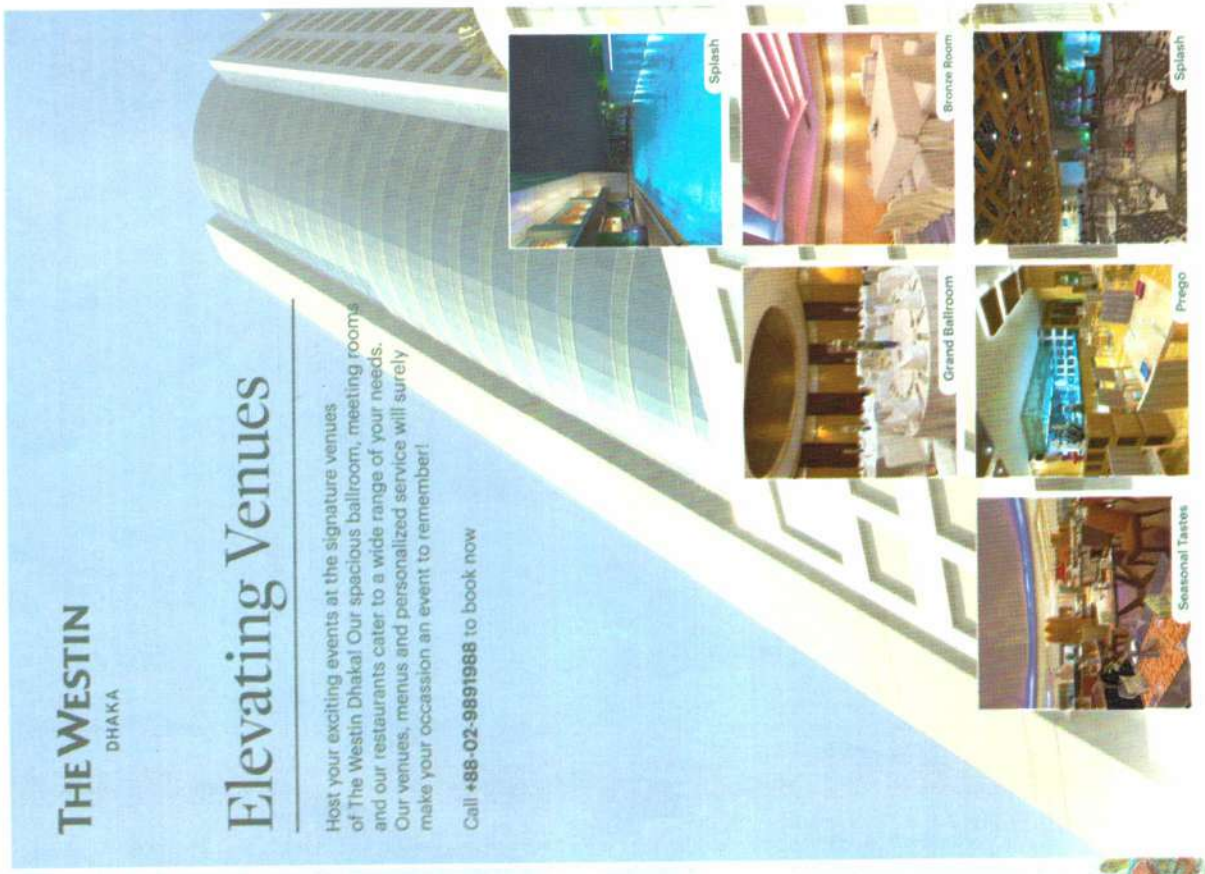

marico
চুল পড়া কমবে
মাত্র ২ সপ্তাহে* গ্যারান্টি
প্যারাসুট
অ্যাডভান্সড™
আয়ুর্বেদিক
গোল্ড
হেয়ার অয়েল
চুল ভেঙ্গে পড়া ও
গোড়া থেকে চুল পড়ার সমাধান*
ayurvedic
Gold
HAIR OIL
TEL PAK VIDHI
CONTROLS HAIR FALL*
GROWS HAIR LONGER
CLINICALLY PROVEN
/AyurvedicGoldBD

THE WESTIN
DHAKA
Elevating Venues
Host your exciting events at the signature venues of The Westin Dhaka! Our spacious ballroom, meeting rooms and our restaurants cater to a wide range of your needs. Our venues, menus and personalized service will surely make your occassion an event to remember!
Call +88-02-9891988 to book now
Splash
Bronze Room
Splash
Grand Ballroom
Prego
Seasonal Tastes

axiata roam

robi

Worry-Free Roaming

Unlimited data, local calls and SMS

@ only Tk.999 daily, dial *140*10*6#

FIRST TIME IN BANGLADESH

For more details visit:
www.robi.com.bd/current-offers/roaming-bundle

visit: /RobiFanz

For your personal safety, avoid disclosing personal information or your PIN

an axiata company

robi.com.bd

ignite the power within

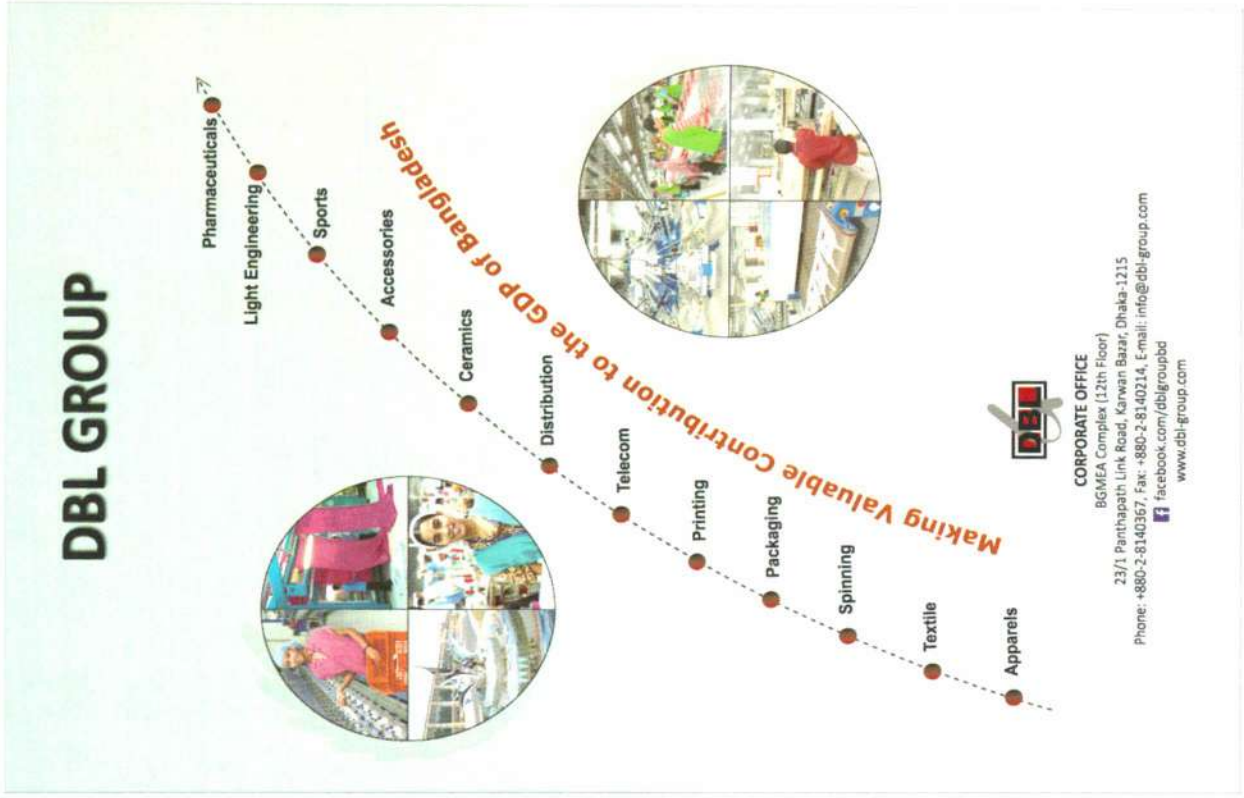

প্রকাশনায়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
(৩য় ও ৪র্থ তলা), ২৩-২৪ কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৫৫০১৩৬২৬
e-mail : chiefdife@gmail.com

শ্রম পরিদপ্তর

৪ রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫৫৫৩৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫৮১৭৯
e-mail : director_deptoflab@yahoo.com

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ

ইনোভেটিভ ওয়ে সলিউশন লিঃ

৩৩, কাওরান বাজার, শাহ্আলী টাওয়ার (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০১৩২৫২, ০১৯১৮২৮৬৬৮৩, ০১৮৬৪২১২৪১২
E-mail: iwsl2015@gmail.com

AKIJ CERAMICS
Promise of Perfection
let's make home
Beautiful
with AKIJ TILES
AkijCeramics
Akij Ceramics Live Demo
www.akijceramics.net

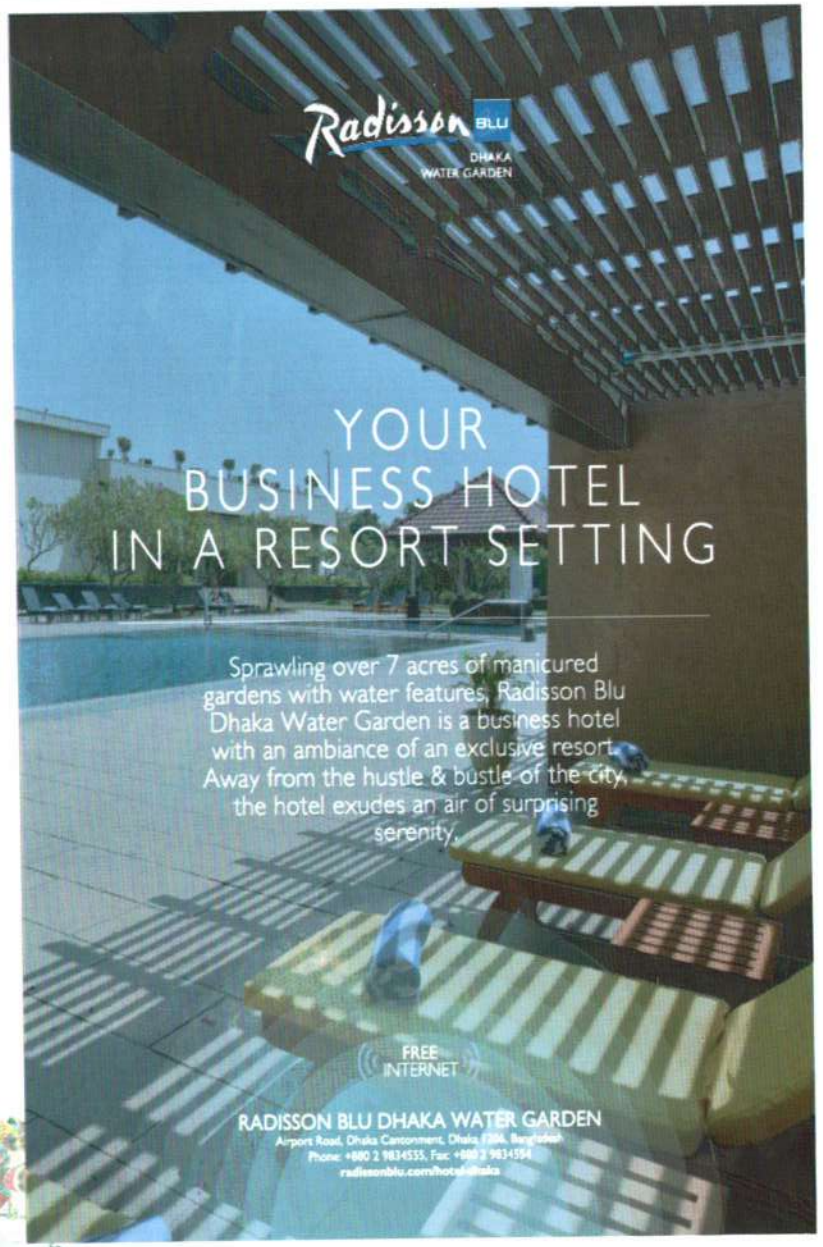

Radisson BLU
DHAKA WATER GARDEN
YOUR
BUSINESS HOTEL
IN A RESORT SETTING
Sprawling over 7 acres of manicured gardens with water features, Radisson Blu Dhaka Water Garden is a business hotel with an ambiance of an exclusive resort. Away from the hustle & bustle of the city, the hotel exudes an air of surprising serenity.
FREE INTERNET
RADISSON BLU DHAKA WATER GARDEN

The Shade of
LIFE
PRAN
www.pranfoods.net
Delighting consumer taste buds across the globe, PRAN have taken the noble oath to ensure the best in quality brands of food and beverages to millions of people in more than 121 countries of the world. We are proud of our journey, which started in Bangladesh in 1981, to reach you. Our pursuit for happiness will continue till we see that precious smile of fulfillment on YOUR face!

FOR SOME THE GOAL IS THE DRIVER. FOR US, THE DRIVE FOR PERFECTION IS THE GOAL. SUCCESS IS JUST A PIT STOP...

BEXIMCO PHARMA

4th August 2016. Beximco Pharma became the first Bangladeshi Pharma company to export prescription medicine to U.S.A. A Company's Achievement became a Nation's Pride. Here's to Beximco Pharma. Here's to Bangladesh. Here's to the next...

Exporting Health to U.S.A.
Made in Bangladesh

www.beximcopharma.com

→ Linde Bangladesh Limited

THE LINDE GROUP
Linde

Consolidating for growth

ORION

ORION GROUP is a leading conglomerate in the country with diversified portfolios in Pharma & Healthcare, Construction & Real Estate, Cosmetics & Toiletries, Power Generation & Energy, Infrastructure Development, High-tech Agro Products, Food & Restaurant Chain, Sports & Events, Textiles & Garments and Home Appliance sectors. Apart from significant contribution in pharmaceutical and healthcare sector in the country over the years, Orion has heavily focused in power generation, engineering & construction and infrastructure development sectors of the country. Being involved into these, ORION is consistently successful in all major investment undertakings and is contributing significantly to the country's economic growth and stability through adoption of appropriate business to business strategy. In this context, Orion has successfully developed partnership with the government, Foreign lenders & exims as well as brought foreign, expertise and technology wherever required.

Corporate Office : Orion House, 153-154 Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh. Tel : +88-02-8870133, Fax : +88-02-8870130. E-mail : orion@orion-group.net, Web : www.orion-group.net

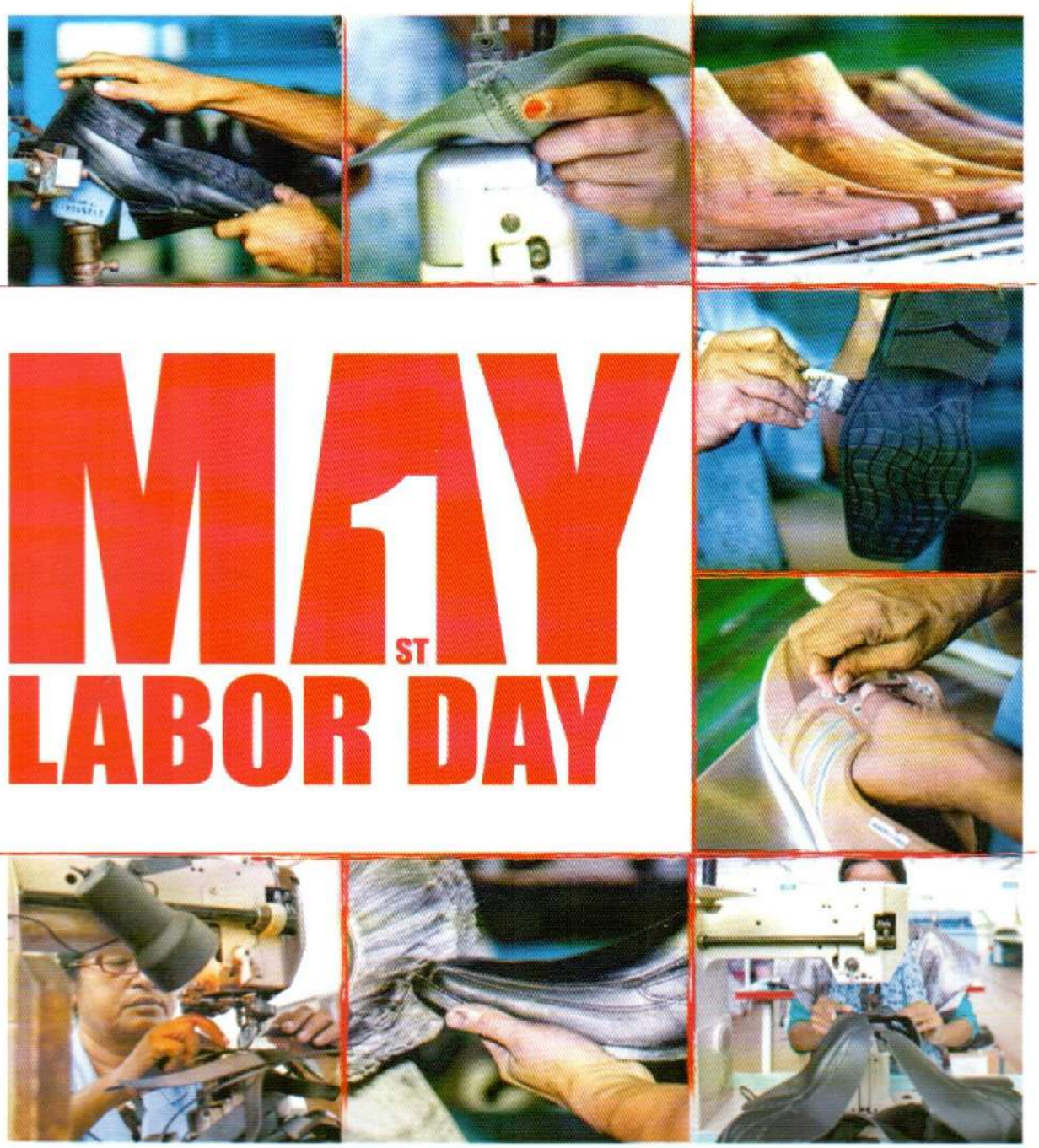

HAPPY MAY DAY

Bata

ইউনিলিভার কেয়ার লাইন
০৯-৬৬৬-৯৯৯-৬৬৬

Unilever

সাদা ও রঙিন কাপড়কে রাখে নতুনের মতো উজ্জ্বল^

থাকুন উজ্জ্বল, সবসময়

^Tested under lab conditions on selected dyes fabrics. Benefit may vary as per the Chlorine levels of water and dye of fabric.